উপন্যাস

শর্মিষ্ঠার কলকাতা, শর্মিষ্ঠার পৃথিবী

ত্রিদিব সেনগুপ্ত

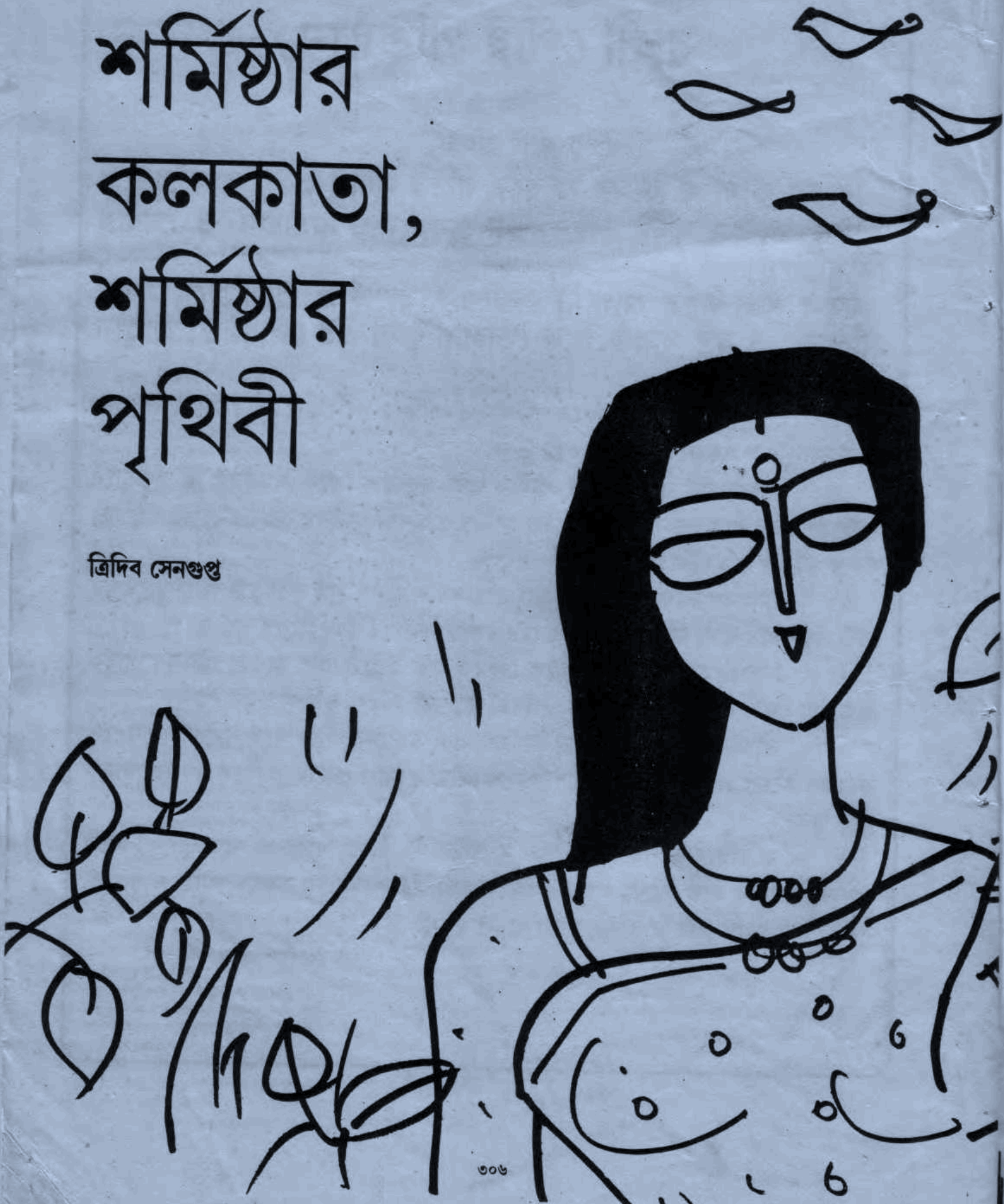

এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র এবং ঘটনাই আদ্যোপান্ত কল্পিত। কোনও একদেশতা, বাস্তবের সঙ্গে, যদি ঘটে, তা নিতান্তই কাকতলীয়।

১॥

এএমপিআর, তার এই অফিস, আজকেই যোগ দিল সে অফিসে, তার চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে পা দেয় শর্মিষ্ঠা। চারদিকে ছড়ানো ছিটানো উপচে পড়া কলকাতা, অনেক অনেক হাওয়া, লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়ে, শ্বাস নেয়। এতক্ষণ কি তার দম আটকে আসছিল : খেয়াল করেনি তো?
অফিসের পরিচিত যে ছবিটা মাথায় আছে, তার সঙ্গে এই জায়গাটাকেও ঠিক মেলানো যায় না। ছোট ছোট ঘর, ভাড়াটে বাড়ির ঘর যেমন হয়। সিঁড়িগুলোও তাই। ছোট ছোট। ঘুপচি। আড়ষ্ট। সামনা সামনি ছড়িয়ে থাকা তিন চারটে বাড়িতে ভাড়া নিয়ে রাখা দশবারোটা ঘর। শুধু একটা বাড়িই এএমপিআর-এর নিজস্ব। সে বাড়ির উপরের তলাটা আবার 'স্যারের', ডঃ অজিত রায়ের, ব্যক্তিগত ব্যবহারের। নিচের তলা দুটোয় অফিস। অফিস? অফিস কি ঠিক বলা যায় এটাকে? শর্মিষ্ঠার নিজের এই এমপ্লয়মেন্টটাকেও কি ঠিক অফিসোচিত বলে মনে হচ্ছে? নাকি অনেকটা একটা সংগঠনের মত, ফেলে আসা সময়ের রাজনীতি যেমন, কিছুটা সেই একই রকমের। আবার এটা, একই সঙ্গে, তার একটা নিয়োগও বটে : টাকা, মাস প্রতি হাজার, জরুরী এবং অমোঘ।
'এই রেমুনারেশনে আপনি শুরু তো করুন।' অজিত রায় বলেছিল, ডঃ অজিত রায়, পলসায়েন্সের ডঃ, ঘরের দরজার বাইরে পিতলের রিলিফ প্লেটেও 'ডঃ'টা উল্লেখিত। প্রথম প্রতিক্রিয়াগুলো, সে কোনও নতুন কিছুকেই প্রথমবার দেখে সেটা মনে হয়, সবসময়েই পরের পদ্ধতির থেকে কত পৃথক হয়। স্বপ্ন, কল্পনা, কতকিছু ভেবে নেওয়া আর রোমাঞ্চ। তারপর তার থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ানো একটা বদ্ধ ঘুপচি ঘিঞ্জি করিডোরে। শুধু মানুষ : গায়ে গায়ে ঠোকাঠুকি। মানুষ যার কেউ কারও দিকে তাকায়নি, শুধু প্রাণপণ ধাক্কাধাক্কি করছে। অভিজ্ঞতার, অভিজ্ঞ হয়ে ওঠার ছক এই একটাই কেবল। একটা উল্লাস আর সিডাকশন দিয়ে শুরু। তারপর ক্লান্তি, ক্লান্তি, টেনে চলো, ইউ আর কনডেমড টু ক্যারি ইট, অন অ্যান্ড অন অ্যান্ড অন।
শুরুর সেই রোমাঞ্চটা—এবার সেটাই বা কোথায়? নতুন কিছু শুরু করার সেই উল্লাস, উত্তেজনা? তাও, তবুও সে ঢুকছে কেন এখানে? কেন ঢুকল?
না ঢুকেই বা সে কী করত? কিছু একটা তো মানুষকে করতেই হয়।
আজ, এএমপিআর-এ কাজে যোগ দেওয়ার দিন, যথানির্দিষ্ট সময়ে এসে পৌঁছেছিল শর্মিষ্ঠা। রিসেপশনের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের বিপরীতে সুজাতা নামে একটি মেয়ে ওকে সামনের মোল্ডেড প্লাস্টিক চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করেছিল। 'স্যার তো এখনও নামেননি।'
'আমার দেখা করার কথা ছিল—বাঁশরী—', মুখের কথাটা বাতাসে আটকে থাকে, '—সান্যাল বোধহয়, ওনার সঙ্গে।'
'উনিও আসেননি এখনও'। মেয়েটার মুখে কি একটা বিরক্তি ছায়া ফেলে? কেন? নতুন জায়গা, এখানের কিছুই এখনও জানেনা শর্মিষ্ঠা, বলতে গিয়ে বেমানান কিছু বলে ফেলেনি তো? যাকগে। মেয়েটার প্রতিও তার একটা তাচ্ছিল্য তৈরি হচ্ছিল। কেন?
'আপনি বসুন।'

'হ্যাঁ।'
মেয়েটার কথায় একটা সুর। আরোপিত। চেষ্টাকৃত, অভ্যস্ত নয়, একটু রিফাইন্ডতর হওয়ার চেষ্টা, ন্যাকামি বলে মনে হচ্ছে। শর্মিষ্ঠা পরে জানতে পারবে সুজাতাকে আড়ালে সবাই 'স্যারের দু-নম্বর' বলে ডাকে। বাঁশরী সান্যাল 'স্যারের এক-নম্বর'।
শরীরে চওড়া-পাড় সিল্ক-টাঙাইল, হালকা হলুদ জমি, লাল পাড়। লাল ব্লাউজ। ঢলঢলে ঘরোয়া লাবণ্যের মুখ, অফিসানুগ নয় একটুও। যেন গিন্নী। তাকানোর ভঙ্গীতেও একটা মৃদু অশিক্ষা। অফিসের কাজে এই মেয়েটা তার সুপিরিয়র হবে না ইনফিরিয়র, শর্মিষ্ঠা ভাবছিল।
শর্মিষ্ঠার দিকে তাকাচ্ছে না এটা বোঝাতেই হয়ত, একটু বাড়তি মনোযোগসহ রাজীব নামে একটি ছেলের সঙ্গে গল্প করে চলে সুজাতা। ছেলেটা বসেনি। রিসেপশন টেবিলের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।
রাজীব গল্প করে, আর সুজাতা, রাজীব যাকে দিদি বলে ডাকছে, শোনে। শর্মিষ্ঠার দিকে সুজাতার চোখটা কিছুতেই আসছে না। শর্মিষ্ঠার বোর লাগে। সুজাতার বোকা মুখ, ফর্সা লাল চওড়া আর ওবেজ, জঘণ্য। অন্তত এনজিও-র মেয়েগুলো একটু অন্যরকম হবে বলেই কি শর্মিষ্ঠা ধরে রেখেছিল?
সুজাতার এই প্যাটার্নটা সে খুব চেনে। যে কোনও সরকারি অফিসের অনেক মেয়েই যেমন হয়। চাকরিটা সরকারি বলে, স্বভাবতই, প্রায়ই, কোনও কাজ থাকে না। আর সরকারি চাকরির গুনে ভালো ঘর-বর আর স্বাচ্ছল্য মিলে যাওয়া মেয়েগুলো একমাত্র সামাজিকতা, অর্থাৎ সেজে আসার একমাত্র পরিসর এই অফিস। কাজ ব্যতিরেকে সারাদিন অফিসে বসে থাকার পুরো সময়টা শুধু বকবক করে চলার মনোটনি কাটাতে তাদের বারবার মুখভঙ্গী চোখগোল আর মাথা ঝাঁকানোর ন্যাকামিতে পৌঁছে যেতে হয়।
সুজাতার কাঁধ থেকে, রাজীবের সঙ্গে গল্প করে চলাকালীন, সিল্ক-টাঙাইল যেমন হওয়াটা খুব স্বাভাবিক, ঝকঝকে লাল ব্লাউজ আবরিত ভারী শরীরের উপর থেকে অর্ধচ্ছ আবরণটা বারবার খসে যায়, পিন করা নেই, বারবার সুজাতাকে গুছিয়ে নিয়ে কাঁধে তুলতে হয়। এমন হতে পারে যে কথার ওই ভঙ্গী বা শাড়ির এই আচরণ এখন আর সুজাতাকে ইচ্ছে করে করতে হয় না, অভ্যস্ততায় এসে গেছে।
রাজীবকে বরং ইন্টারেস্টিং লাগে শর্মিষ্ঠার।
অফিসের এই বাড়িটার একদম পিছনে, গা থেকেই শুরু পঞ্চাননতলা বস্তি। এখানে বসে বাঁদিকের জানলার বাইরে সেই বাস্তবতাটা, আরও হয়ত রাজীবের উপস্থিতির কারণেই, খুব সন্নিকটবর্তী বলে মনে হচ্ছিল।
পঞ্চাননতলা বস্তিটাকে গত দুতিনবছর চারবছর ধরে জানছিল শর্মিষ্ঠা, তাকে জানতে হচ্ছিল। জানবাজার-এর কিছুটা, একটুখানি পামারবাজার, পার্কসার্কাস আর রাজাবাজারের কোনও কোনও অংশের সঙ্গে সঙ্গে। অর্জুন সেন, তার পিএইচডি সুপারভাইজর, বছরে একবার মার্কিনদেশে যাওয়ার আমেরিকানতায় উচ্চারণ করেন 'সোশাল' নয় 'সোসাল সায়েন্স', সেই সোসাল সায়েন্সের সোসিওলজিকালতায় যতটা চিনে উঠতে পারা যায়। যতটা চিনে উঠতে পারে একজন আউটসাইডার তার সাইট অফ সার্ভেকে।
তার বাইরেও চিনতে ইচ্ছে করত না শর্মিষ্ঠার? বস্তির লোকদের প্রাত্যহিক মুখোমুখি হওয়ার সমস্ত ক্লান্তি, অশ্লীলতা, অপমান ইত্যাদির পরও বস্তির ভিতর একটু অন্যরকম কাউকে দেখলেই, একটু ডিফারেন্ট, তার মাথায় কি একটা আগ্রহ লাফিয়ে উঠত না? শর্মিষ্ঠা যাকে ছেড়ে আসা বাম-রাজনীতির অনুষঙ্গ বলে ভাবে? করে, ঠিক করে, রাজনীতি সে ছেড়ে এল?
রাজীব কথা বলছিল। রাজীবের কথায়, চোখে, প্যান্ট ও জামা এবং তাদের পরবার ধরণে শর্মিষ্ঠা পঞ্চাননতলা বস্তিটাকে দেখতে পাচ্ছিল। রাজীবের কথায় রেফারেন্স আসার আগেই ওর কিছু ধাঁচ কি শর্মিষ্ঠার চেনা লাগছিল? এরকম কি আদৌ চেনা যায়? দেবব্রত বলত, যায়। বলত, একটা ছক থাকেই। ক্লাস করানোর সময়ই দেবব্রত নাকি বলে দিতে পারত কোন টিচার কোন ইস্কুলে, কোন কলেজে পড়েছে। কোন পাড়ায় মানুষ হয়েছে ঃ আহিরিটোলা না বালিগঞ্জে। কোন শহরে, কলকাতা না মফস্বল না দিল্লি বা বোম্বাই কোনও বৃহত্তর মেট্রোপলিসে। দেবব্রত কিন্তু শর্মিষ্ঠাকে কারমেল বলে চিনতে পারেনি। তদ্দিনে শর্মিষ্ঠা 'জগ্রাফি'কে 'জিওগ্রাফি' বলার অভ্যেস করে ফেলেছে। 'আভন'কে বলে 'ওভেন' আর 'থিয়োরি' বা কোনও 'টিএইচ' বলার সময় আর 'ভ'-এ লিম্প করে না। নিজেকে তখন শর্মিষ্ঠা বাম-রাজনীতির যোগ্য করে তুলছে। হাওয়ার্ড ফাস্ট যেমন লিখেছিল, বুর্জোয়া ব্যাগেজ থেকে নিজেকে মুক্ত করছে।
রাজীব ওর বাবার গল্প করছিল। পরে যে গল্প আরও বহুবার শর্মিষ্ঠাকে শুনতে হবে। এএমপিআর-এর অফিসে সবচেয়ে বেশি রেকারেন্ট থিম ছিল বাঁশরী-সুজাতা-লড়াই, আর তারপরই রাজীবের বাবা।
রাজীবের বাবা পুলিশে চাকরি করত। এখন, মাথা খারাপ, চাকরি চলে গেছে, চেয়ারে বসে থাকে। একটা চেয়ার। বসে থাকা মানেই ওই চেয়ারটা! বসে থাকা নয় শুধু, ওই চেয়ারটাই ওর বাবার বেঁচে থাকা। অফিস থেকে চাকরি গেছিল কেন—মাথা খারাপের জন্য চাকরি যাওয়া না চাকরি যাওয়ার জন্য মাথা খারাপ?— কী কারণে, কারণটা কী যাতে এমনকি পুলিশের চাকরিও যেতে পারে, সেটা কোনওদিন শোনা হয়ে উঠবে না শর্মিষ্ঠার।
চাকরি যাওয়ার পর থেকে রোজ, প্রতিটা দিন, সদাসর্বদা সেই চেয়ারে বসে থাকে রাজীবের বাবা।
'কী অবস্থা, ভাবুন দিদি।' রাজীব বলে।
সেটা থেকে তুলতে গেলেই চিৎকার, কান্না, হিংস্রতা। পাগল। কেন? কোনও ভয়? চেয়ার হারিয়ে ফেলার? বাড়ি বদলেছে, বস্তিতে এল রাজীবরা, দাদা মরে গেল, কোলের রাজীবকে বড় করতে করতে মা কোনওক্রমে মুড়িমোয়ার ব্যবসাটা চালিয়ে গেছে, চেয়ারটা রয়ে গেছে একইরকম। চেয়ার, চেয়ারাসীন বাবা।
রাজীব এখানে অফিস-অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম পিয়ন, এখন যা পায়, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি পাবে রেস্টুরেন্টে চাকরি পাওয়ার পর, নেচে নেচে গান—সেটা রাজীব ভালোই পারে, নাচতেও পারে, 'তোমার রক্তে আমার সোহাগ' সিনেমায় নাচের সমবেত গ্রুপে ছিল, তখন সেই অনেক রাশিরাশি তুমুল আয়, তখনও ওর বাবা, যতদিন এই নরদেহে প্রাণ আছে, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন, চেয়ার ছেড়ে নড়বো না।
রাজীবের বাবা পাগল হয়ে যায়, যাচ্ছে, গিয়েছে কেন? শর্মিষ্ঠা কি শুনতে শুনতে নিজের মাথায় গল্প খুঁজছিল?
এনজিও-তে জয়েন করার একদম শুরু থেকেই অভিজ্ঞতার ঃ ফ্রাস্ট্রেশনের জায়গাগুলো শর্মিষ্ঠা ডায়রিতে লিখে রাখতে শুরু করে। পৃথিবী জুড়েই, বিশেষত সাউথ ব্লকে, এশিয়ায়, বাংলাদেশে যেমন,
নন-গভর্নমেন্টাল-অরগানাইজেশনগুলোর কাজ ক্রমে ইম্পর্ট্যান্ট, আরো ইম্পর্ট্যান্ট। পরে কখনো এই নিয়ে একটা বড় লেখা লিখবে, প্রবন্ধ, ডকুফিচার, ভাবে শর্মিষ্ঠা। সেই লেখা শুরু করবে রাজীবের বাবার গল্পটা দিয়ে।
আজ কেবল শুরু, কাজ তাকে কিছুই করতে হয়নি। শুধু সবকিছু জেনে বুঝে নেওয়া অতসীর কাছ থেকে।
স্কুলগুলো অ্যাজ এ হোল ও-ই দেখে। তাদের খাবার, ওষুধ, অন্যান্য খুঁটিনাটি। খোকনবাবু, অজিত রায়ের ছেলে, সেও দেখভাল করে এই এএমওপি আর-ব্যবসার। ব্যবসা? বোধহয়, সবকিছু দেখে শর্মিষ্ঠার তো ব্যবসা বলেই বোধ হয়। শর্মিষ্ঠা জয়েন করল আইপেক প্রোজেক্টে, টাকা আইএলও-র দেওয়া, বাচ্চা-শ্রমিকদের চাইল্ড লেবার এলিমিনেট করে তাদের জীবনের মূলস্রোতে মেইনস্ট্রিম—এ ফেরত নিয়ে আসা। এএমপি আর মানে শুধু এই আইএলও-র প্রোজেক্ট নয়। আরো অজস্র প্রোজেক্ট। অজস্র ধরণের।
দক্ষ কিন্তু গরিব উৎপাদনক্ষমদের জন্য সেলফ এমপ্লয়মেন্ট প্রোজেক্ট। ওয়ার্কিং ক্লাস বেল্টে নতুন নতুন ইনকাম জেনারেশন। ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার। ড্রাগ অ্যাডিক্টদের রিহ্যাবিলিটেশন। প্রস্টিটিউট চিলড্রেন। সবই এক একটা প্রোজেক্ট। সমস্তটা মিলিয়ে এএমপিআর। কলকাতার এনজিওদের ভিতর সবচেয়ে বড় কিড, খিদিরপুর রোডে, পার্কসার্কাস তিলজলায় ফ্রন্টিয়ার আর এখানে এই এএমপিআর।
পরিচয় হল বাঁশরী সান্যাল, মিতা, সুর্বণা, নূপুরদের সঙ্গে। বাঁশরী সান্যাল আর অজিত রায়ের সঙ্গে কথা হল। 'স্যার' ততক্ষণে উপর থেকে নেমে এসেছিলেন।
আগে বাবা-ই স্টেটসম্যানে কালো বলপেনে দাগ দিয়ে দিত, শর্মিষ্ঠার উপযুক্ত অ্যাড দেখলে। বিবিকে, শর্মিষ্ঠার বাড়ির নাম বিবি, আর খুঁজতে হত না। বাবা তো এমনিতেই পড়ত খবরের কাগজ, কী আর করবে সারাদিন? স্টেটসম্যানের পার্সোনাল কলাম পড়া ঃ রিটায়ার্ডর লাইফ। এখন বাবা নেই। এই অ্যাডটা তার নিজেরই চোখে পড়েছিল। একটা সোশাল সার্ভিস অরগানাইজেশন কমিটেড ইয়ুথ খুঁজছে। সোশাল সার্ভিস নিদেন সোশাল সায়েন্সের ডিগ্রিসম্পন্ন, প্রেফারেবলি পোস্ট-গ্রাজুয়েটস ফর দি পোস্টস অফ প্রোগ্রাম-কোঅর্ডিনেটরস অ্যান্ড অরগানাইজারস।
'কমিটেড' শব্দটা দেখে আমোদ হয়েছিল শর্মিষ্ঠার একা বেচারা বিচ্ছিন্ন শব্দগুলো কী অর্থহীন, কত বদলে যায় নদী থেকে নদীতে। এটা কি কারো কবিতার লাইন? কার? উৎপল বসু? আবার পুরী সিরিজ?
ঠিক বিরক্তি না, একটা হাস্যকরতা, আর একটা ইরিটেশন, প্রথম থেকেই, এএমপিআর-কে ঘিরে।
আজ টেবিলে বসে, বাঁশরী সান্যাল আর অজিত রায়ের সঙ্গে, অজিত রায় ঠিক কতটা ভোঁতা সেই কথাই ভাবছিল শর্মিষ্ঠা। ছেলেদের ভোঁতামিগুলো অনেকসময়ই বোঝা শক্ত হয় ঃ চশমার ভারী কাঁচ, অভ্যস্ত বাক্যের অনর্গলতা, সিরিয়ালে সিনেমায় নাটকে স্টাইলাইজড হয়ে ওঠা কিছু ইন্টেলেকচুয়াল জেশ্চার, আরো নানা বিধ উপসর্গ।
টেবিলে অজিত রায়ের হাতের কাছেই একটা পাইপ ছিল, তার গোড়াটা রুপো বা হোয়াইট মেটালে মোড়া। পাইপটা ধরাত যদি একবার ডঃ অজিত রায়, শর্মিষ্ঠা তবে হেসে ফেলতেও পারত। কোথাও একটা পড়েছিল, ছেলেরা পাইপ সিগার সিগারেট খায় ল্যাক অফ কনফিডেন্স থেকে। উইনিং কমপ্লেক্স। মার স্তনবৃন্তের স্মৃতি ভুলতে পারছেনা ঃ অজিত রায়ের মায়ের কী দুর্ভাগ্য।
আপনার অ্যাকাডেমিক প্রিপারেশন—তার ফ্লেভারটা জাস্ট লেড করুন, এইসব হাই সাউন্ডস দিচ্ছিল অজিত রায় ডঃ, আর টেবিলের বিপরীতে বসে শর্মিষ্ঠা দিচ্ছিল শান্ত গাম্ভীর্য। লোকটা নিজেকে যতটা এলিটতায় উপস্থাপিত করতে চায় আদৌ সেটা সত্যি নয়। ক্রসব্রিড নয়, জেনুইন পেডিগ্রিসম্পন্ন এলিটদের, অর্জুন সেন যেমন, শব্দ এবং বাক্যে একটা চর্চিত তথা অভ্যস্ত অনিশ্চয়তা থাকে।

শিল্পের, তাত্ত্বিক গভীরতার, রিফাইন্ড সেনসিটিভিটির এলোমেলোপনা। এর মুখ চোখ ভঙ্গি খুব স্ট্রাগল করে দাঁড়ানো একটা মানুষের। ইংরিজি অ্যাকসেন্টগুলো চেষ্টিত।অনর্গল নয়। লোকটা কি তাকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করছে? কেন? মেয়ে দেখলেই ইমপ্রেস করার চেষ্টা মা করে পারে না? সেইজন্যেই কি এএমপিআর-এ এত মেয়ে? একজন অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট আর দুতিন জন ড্রাইভার ছেড়ে দিয়ে। আর নিজের ছেলে ওই খোকন। অবশ্য ছেলেটা, ছেলে মানে লোক, কতটা ছেলে কে জানে? বয় জর্জের মতো একটা দাড়িগোঁফকামানো এফেমিনেট মুখ। কথা শুনলেই, দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায় শরীরের কোথাও কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। পকেটেরও নয়, সেটাও বাবার।

আইপেক, আইএলও, এলডব্লুএস, ইউনিসেফ, জি ও আই—এই শব্দগুলো বারবার উচ্চারিত হচ্ছিল। ধীরে ধীরে, একসময়, শর্মিষ্ঠা জেনে যাবে, ব্যবহার করবে, যেমন সবাই করে।

'মোটামুটি আমাদের হান্ড্রেড স্কুল আছে, গিভ অর টেক ফাইভ।' বলে কী লোকটা, একশোটা স্কুল, ভিতরের চমকটাকে মুখে আসতে দেয়না শর্মিষ্ঠা। 'এগুলোর সংখ্যা কমে বাড়েও। আসলে স্কুল বলতে এমনিতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে এগুলোর কনসেপ্ট ঠিক মেলে না। দেখতেই পাবেন।' বাঁশরীকে চোখ দিয়ে দেখায় অজিত রায়। 'বাঁশরী সান্যাল, আপনাদের প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর। ওনার কাছ থেকেও জানতে পারবেন।'

একটা নরম, রিল্যাক্সড হাসি হাসে বাঁশরী সান্যাল।

'হ্যাঁ'-সূচক মাথা নাড়ায়। এরা কি তাকে, শর্মিষ্ঠাকে একটু বেশি পাত্তা দিচ্ছে? কেন? একটু নার্ভাস লাগে শর্মিষ্ঠার। তার অ্যাকাডেমিক প্রিপারেশন?

ডানদিকে একটা র‍্যাকে রবার্ট সিলভারবার্গ, আইজ্যাক অ্যাসিমভ, ফ্রিটজ লাইবার দেখতে পাচ্ছিল শর্মিষ্ঠা। হঠাৎ জিগ্যেস করে বসে, 'আপনি কি স্কাই-ফি এনথুসিয়াস্ট?'

'অ্যাঁ—?'

'অতো বই দেখছি সায়েন্স ফিকশনের?'

হ্যাঁ, হ্যাঁ।' খুব খুশি হয় অজিত রায়। হয়ত সায়েন্স ফিকশন ভালো লাগার পুরোনো স্মৃতি ওর ভিতর জেগে ওঠে। বা একটা টুকরো আইডেন্টিটি : অ্যাপ্রিসিয়েশন। অজিত রায়কে আর বিশ্বজুড়ে এনজিও-গ্রান্টের ফাঁদপাতা পল সায়েন্স ডক্টরেট, বছরে একবার স্ক্যানডিনেভিয়া যাওয়া সফল ব্যবসায়ী বলে মনে হয় না। কোনো দূরগ্রামের ইস্কুলের স্নেহপ্রবণ থার্ড মাস্টারের মত লাগে।

এএমপিআর থেকে বাইরে পা দেওয়া, এই সমস্ত ঘটনাগুলো মাথায় নড়ছিল, বদ্ধ আটকানো অফিসের বাইরে খোলা কলকাতা, শর্মিষ্ঠার এখন হাঁটতে ইচ্ছে করছিল। আবার হাঁটতে হাঁটতে তো গোলপার্ক থেকে বাগমারি অব্দি যেতে পারে না; মানবদার ওখানে একবার যেতে হবে, জয়েন করার এই খবরটা।

যাবে কী বাসে? এস নাইনটিন?

এমনি দিনে সারাদিন ঘোরাঘুরির পর, রিসার্চের কাজ বা কলেজের কাজ বা অন্য কোনো কাজ বা নিতান্ত আড্ডা মারা সেরে, এস নাইনটিনে চড়ে, তার সেলিমপুরের আবাসের দিকে, গড়িয়াহাট মোড় থেকে বাঁয়ে না ঘুরে সোজা আরো আরো চলতে থাকা সেই দেশপ্রিয় অব্দি, তারপর সাদার্ন অ্যাভিনিউ ঘুরে এসে গোলপার্কে বেরোনোটা কী ক্লান্তিকর মনে হয়। একটা তিক্ততা। এই সামান্য দূরত্ব ঘুরতে কেন এত বিরাট ডাইগ্রেশন, একটা রাগ, একটু অসহায়ও লাগে। আর ওই পথের উপরেই পড়ে সেন্টার, সেন্টার ফর সোশাল রিসার্চ, অর্জুন সেনের সঙ্গে রোজ দেখা হত তার, পাভলভি কুকুরের ঘণ্টা, ঘুরতে থাকে ঘুরতে থাকে ঘুরতে থাকা এস নাইনটিন, কান্না এসে যায় তার, জানলার বাইরে তাকায় শর্মিষ্ঠা।

আজ এস নাইটিনের এই বিপথগামীতাটাই তার ভালো লেগে যায়। দুটো ইচ্ছে, হাঁটার আর মানবদার ওখানে যাওয়ার, একই সঙ্গে তার মাথায় ঘুরছিল।

এএমপিআর থেকে বেরিয়ে, বেরিয়ে এসেই তার সাদার্ন অ্যাভিনিউ ধরে একটু হাঁটতে ইচ্ছে করল। আবার মানবদার ওখানে যেতে হবে, যাবে, আগেই ঠিক করে রেখেছে।

যখন কলকাতায় ছিল, যখন লেখা আর রিসার্চ দুটোই দেবব্রত একসঙ্গে করছে : কোনওটাই করছে না, কত যেত তারা দুজনে একসঙ্গে মানবদার ওখানে, প্রয়ই। আজকাল আর যাওয়াই হয় না। এক, দেবব্রত নেই আর অন্যদিকে ছুটিকে নিয়ে বা মা দিদিমাকে নিয়ে মাঝেসাঝের ব্যস্ততা, নিজের কাজ। আর মানবদার বাড়ি এখন যাওয়া মানেই দেবব্রত অনুপস্থিতিটা শর্মিষ্ঠার নিজের কাছেই আরও স্পষ্ট, চিহ্নিত করে তোলা। দেবব্রতর সঙ্গে তার সম্পর্কে যা টেনশনই থাক, ওর অনুপস্থিতিটা সবসময়েই একটা ঝুঁকে পড়া বুড়ো বটগাছের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়, চারিদিকে সন্ধ্যা অস্পষ্টতা, আলো যা ফুরিয়ে যাচ্ছে, আলোর স্মৃতি। মানবদার কাছে যাওয়া মানেই সেই টেনশনের শরীরে হাত দেওয়া, এত স্মৃতি কথা প্রহর, মানবদা তাদের এত কিছু জানে, সঙ্কোচ নয় ঠিক, পায়ের ঘষে যাঁওয়া চামড়া চটি থেকে বাঁচিয়ে হাঁটতে চাওয়া। তবু, দায়িত্ব একটা থাকেই। যে লোকটা তাদের অতটা সময় দিল। মানবদা ছিল সুপারভাইজার, দেবব্রতর সেই রিসার্চের, বা অরিসার্চের, মানবদা দেবব্রতকে ভালোবাসত, দেবব্রতর বিভিন্নমুখী এক্সট্রোভার্টপনা, দেবব্রত একসেনট্রিকতায় কোনওদিন তাচ্ছিল্য করেনি, হেসেছে অ্যাফেকশনেট। আজ, এই কাজটায় জয়েন করার সংবাদ, দেখা করে আসা, না গিয়ে পারে না শর্মিষ্ঠা।

চটিটা পুরোনো, তাও অনেকদিন বাদে পরেছে, দুতিন জায়গায় জ্বালা করছে, সবচেয়ে বেশি ডান বুড়ো আঙুলের নিচের গাঁটটায়। জ্বালা, একটা বিরক্তি। বালিগঞ্জ টেরাস দিয়ে গোলপার্কে এসে পড়ল, পড়ামাত্রই একটা হালকা আরাম। কিছুই না, একটু গোল, মধ্যে ঘন সবুজ কিছুটা আনপ্রেডিক্টেবিলিটি : ঝোপঝাড়, সোজা লম্বা ধূসর শেষহীন রাস্তাগুলো থেকে একটু অন্যরকম। এই জায়গাগুলোয় কত হেঁটেছে তারা একসঙ্গে, দেবব্রত আর শর্মিষ্ঠা।

সামান্য একটু ডানদিকে, গড়িয়াহাটের দিকে যেতে বাঁ-এ প্রথম গলির মুখে, অবাঙালি বৃদ্ধের বইয়ের দোকান, গেলেই টুল এগিয়ে দেবে, 'নমস্তে বহেনজি', দেবব্রতর কথা জিগ্যেস করবে। আজকাল আর তারা আসে না এ নিয়ে অনুযোগ।

রাস্তা পেরোল শর্মিষ্ঠা। রামকৃষ্ণ মিশনের কোণ ঘুরে এখন সাদার্ন অ্যাভিনিউ। বিরাট, আড়াইতলা, জাহাজ এল নাইন, স্থাবর স্থানু অনড়, এখনও ফাঁকা, হয়ত এইমাত্রই গেছে একটা। জানলার পাশে সদ্যযুবক প্রেমিকপ্রেমিকা। নীল দোপাট্টা, সাদা কুর্তায় নীল অলঙ্করণ, চুল ঝাঁকিয়ে, চোখ বড় বড়, কথা বলছে প্রেমিকাটি। কতদিন হয়ে গেল, কতদিন, ওভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে কথা বলেনি শর্মিষ্ঠা। নিজের পুরুষের সঙ্গে ছাড়া ওইভাবে কথা বলা যায় না। নিজের পুরুষের সঙ্গেও যায় কি সবসময়? কোনওদিন আর, তার, শর্মিষ্ঠার ওভাবে কথা বলা হবে?

আরও অনেকদিন, বেশ কয়েকটা বছর পরে, তখন ছুটিই ওইরকম, সদ্যযুবক নারী, ছুটি এসেছে এখানে, দুপুরের গোলপার্কে ফাঁকা এল নাইন নির্জনতা, প্রেমিক ভীষণ কাছে, ভয়ঙ্কর কাছে, আই উইল পুট ফ্লাওয়ার্স অ্যাট ইয়োর ফিট, অ্যান্ড আই উইল সিং টু ইউ সো সুইট, ভেবে নেওয়ার ভিতরেই একটা আরাম, শর্মিষ্ঠার মুখের রেখা উষ্ণ নরম হয়।

শ্লথ পায়ে, টেনশনরিক্ত, কোনও সময় রাখার নেই তার এখন, সাদার্ন অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটছিল শর্মিষ্ঠা। বিকেল তিনটে সোয়া তিনটে, ফেব্রুয়ারি, বাতাসে আধো উত্তাপ। লেক-এর পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটছে শর্মিষ্ঠা। ফুটপাথে বড় বড় পাথরকুঁচির স্তূপ, ছুটি এগুলোকে ডাকে 'পাহাড়' : পাথর আছে, উচ্চতাও আছে। রোববার বিকেলে লেকে বেড়াতে এসে উঠবার চেষ্টা করে ছুটি। ছুটির খুলে ফেলা চটি হাতে নিয়ে শর্মিষ্ঠা দাঁড়িয়ে থাকে। পাহাড় ডিঙোনো কঠিন, তুই মেয়ে, তোর আরও কঠিন, চেষ্টা কর, চেষ্টা কর, ছেড়ে দিস না ছুটি, পারবি। একটু ভাঙাচোরা ফুটপাথ ধরেই হাঁটছে শর্মিষ্ঠা, লেকে ঢুকতে তার ইচ্ছে করেনি।

পাহাড় কি আদৌ ডিঙোনো যায়?

ডিঙোলাম এরকম ভাবা।

লেক কালীবাড়ির বিপরীতে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে গেল শর্মিষ্ঠা। দেবব্রতর সঙ্গে যেমন দাঁড়াত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হাজরা মোড়ের মন্দিরের সিঁড়ি। দুজনে ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে চিড়িয়াখানার সামনে। জেলখানার পাশে তখন ফাঁকা জমি ছিল, এখন ইউনিভার্সিটির নতুন বিল্ডিং। রবীন্দ্রসদনের উল্টো ফুটপাথে, ময়দানের ধারের বাসস্টপে। নেহরু মিউজিয়ামের সামনে কার্বাইডের মোড়ে। কত দীর্ঘ সময় তারা দুজনে দাঁড়িয়ে থেকেছে। বাসস্টপ মানেই সকলেই ধরে নেবে ফ্লো ভ্যারিয়েবল বলে, স্টক ভ্যারিয়েবলদের কেউ চিনতেই পারে না, দেবব্রত বলেছিল, যতক্ষণ খুশি দাঁড়িয়ে থাকো।

চারদিকে, শরীরে, রাস্তায়, ফুটপাথে, কাঁধের কাঁথাস্টিচ কালো সাইডব্যাগে নড়ছে রাধাচূড়ার ঝিরঝিরে ছায়া। এরকমই কোথাও একটা দাঁড়িয়ে, রাত দশটারও পর, দেবব্রত আর শর্মিষ্ঠা ভিজেছিল। সুমনের গান শুনে, নজরুল মঞ্চ থেকে বেরিয়ে। সুমন সেদিন স্টেটসম্যানকে মাদারফাকার বলেছিল। একটা মেয়ে, তাদের সামনেই, বেরোতে বেরোতে, তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'ওইসব অত বলে কেন, ওই এমএফ, ভীষণ রুড।'

গালাগালটাকে উল্লেখ না করার প্রকৌশলে তারা হেসেছিল, মজা পেয়েছিল, মনে পড়ে এখন এই বিকেলে শর্মিষ্ঠার মুখে একটা আলতো হাসি আসে। লজ্জা হল তারপরই, মুখ এবার গম্ভীর, নয়ত লোকে কী ভাববে, বাসস্টপে একা একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে হেসে যাচ্ছে। তবু মেয়ে হলে হত, সে এখন মহিলা, মেয়ের মেয়েদের জন্ম দেয়, দিয়েছে।

হয়ত ওই 'এমএফ' মেয়েটির প্রতি মজায়, হয়ত ওই মেয়েটির বা ওই মেয়েটিদের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্যের সেলিব্রেশনে, কিম্বা ঘটনার নিজস্ব গতিতে, তারা ভিজেছিল, অনেকক্ষণ, বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে। অনেকক্ষণ। অনেক আগের, বিয়ের আগের, ছুটি জন্মানোর আগের দিনগুলোয় তারা যেমন ভিজত, সুযোগ থাকলেই, দুজনে একত্রে, বৃষ্টিতে।

তারা, সে আর দেবব্রত, তখন ভারি উজ্জ্বল একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এটা তখন কি তারা বুঝেছিল? তখন? আর এখন তারা কীরকম সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে? তারপক্ষে কি এই মুহূর্তে বোঝা সম্ভব আদৌ? কবে বুঝতে পারবে? —পরে, অনেক পরে?—কন্ট্রিবিউশনে মার্ক্স যেমন বলেছিলেন? মার্ক্স তারা পড়েনি কোনওদিন, পাঠ করত, পারলে ধূপধুনো জ্বালিয়ে, তিনটে পাশাপাশি দাড়িওলা মুখের শালগ্রাম, যেন ইপিএম বা গ্রুন্ডরিস নয়, ব্রহ্মবৈবর্ত কি বৃহদ্ভাগবত। সেইজন্যেই কি তার আজকাল পুরোটাকে শাস্ত্রের মতই দূরবর্তী লাগে, মাঝেমাঝেই?

সদ্য এএমপিআর থেকে বেরিয়ে, এই বিজন বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকে শর্মিষ্ঠা : একা। দুটো একটা গাড়ি থামে সামনাসামনি, ঘোরে, ডান লেন থেকে বাঁ লেনে যায়, গাড়ি থেকে নেমে আসে ভক্তিনম্রও মানুষ, পিতলের ঝকঝকে থালা, হলুদ গাঁদাফুল, মিষ্টির চৌকো প্যাকেট, পুজো দিতে যাচ্ছে লেক-কালীবাড়িতে। বোঝা যায় কলকাতায় এখনও বাঙালি বড়লোক আছে, এমনকী এই অঞ্চলেও, প্রপার কলকাতায় বাঙালি এখন তো শতকরা কুড়িরও কম বলে শুনেছে। অথবা হয়ত অবাঙালিরাও এখন কালীপুজো দেয়। কলকাতার বাজারের সঙ্গে কলকাতার প্রতিমাও পেয়ে গেছে। কালীকে ক্রমে অম্বেমাতা বা শ্রীরাম করে নেবে। ইংরেজরা যেমন রামমোহনকে দিয়ে গড়িয়েছিল ব্রহ্ম : ভারতীয় খ্রীষ্ট, মানবদা একটা প্রবন্ধে লিখেছিল, মনে পড়ে শর্মিষ্ঠার। শর্মিষ্ঠা দাঁড়িয়ে আছে বাসস্টপে আর চারপাশটা ওর মুখে চোখে মাথায় ভেসে ভেসে ঢুকে আসছে।

এস নাইনটিন্ এসে গেল। এক দেড় পা এগিয়ে যেতে যেতে হাত তুলে অভ্যস্ত ভঙ্গী করে শর্মিষ্ঠা।

বাসে তেমন ভিড় নেই, সেরকম বাস দেখলেই মাথার ভিতর উৎসব জন্মায়। সামনেই একটা লেডিজ সিট ফাঁকা। লেডিজ সিটের এই কেতাটা এস বাসে ছিল না, কিছুদিন হল চালু হয়েছে। লেডিজ সিটে বসতে একটা দ্বিধা, যেমন সবসময়ই, শর্মিষ্ঠার ভিতর কাজ করেছিল। কিন্তু লেডিজ সিটে না বসলে অনেকটা পেছিয়ে যেতে হয়। জানলাও নেই, সেই একদম পিছনের সিটটা ছাড়া, বসব কি বসব-না করতে করতে বসে পড়ল শর্মিষ্ঠা।

কন্ডাক্টর সামনেই। পাঁচটাকার নোটসহ হাতটা শর্মিষ্ঠা সামনে বাড়াল। 'একটা ভিআইপি উল্টোডাঙ্গা।' ওখানে নেমে বাগমারি কবরস্থান অব্দি হেঁটে আসতে হবে। চটিটা আবার ঝামেলা করছে। যাকগে।

হুহু হাওয়া, রোদ্দুরটাও পড়ছে উল্টোদিকের জানলায়, আরাম, শর্মিষ্ঠা একবার চোখ বোঁজে।

২।।

শর্মিষ্ঠার ডায়রি থেকে :

'এই কদিনেই যা দেখছি, এএমপিআর-এ অজস্র গোলমাল আছে। এনজিও ব্যাপারটাও আর এক রকমের ব্যবসা। আরও খারাপ ব্যবসা কারণ ব্যবসা নয় বলে দেখাতে চায়। তাই লেবার ইউনিয়ন নেই। দু তিনটে লোক যা খুশি তাই করে, যেমন খুশি করে। কর্মচারীরা প্রায় ঠিকে কাজের লোক। মাইনেও দেয় সেইরকমই।

আমায় হাজার দেয়, তাও আমি পার্টটাইম, সপ্তায় তিনদিন তিনচার ঘন্টা করে থাকব। আসলে ওরা ওদের রিপোর্টটা আমাকে দিয়ে লেখাতে চায়। অন্যরা, মিতা বা নূপুর ছদিন করে এসেও নশো করে পায়। সুবর্ণা ডাক্তার বলে ও ও আমার মত পার্টটাইম আসে আর হাজার পায়। সুজাতা নিশ্চই আরও কম।

এখন সরকারি ওয়েজ কত? যদি চল্লিশ হয় তাহলেও দিতে হবে। আমি এখানে ভলান্টারি সার্ভিস দিচ্ছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ রেমুনারেশন বাধ্যতামূলক নয়, অন্যান্য বেনিফিটের তো প্রশ্নই নেই। বদমাইসগুলো লেবার কমিশনের আইন বাঁচাচ্ছে। আমি সেই অজিত রায়কে গিয়ে বললাম, আমি সই করব না, অমনি বলে, না না ঠিক আছে। আসলে অডিট হয় তো, আর তাও নয় একবার লোকাল দু একজন মিলে একটা আনরেস্ট তৈরি করেছিল, আফটার অল এটা তো বিজনেস এস্ট্যাবলিসমেন্ট নয়। বিজনেস নয়, অথচ এএমপিআর বাঁশরী সান্যাল অজিত রায়দের জন্য সোনার ডিম পেড়েই চলেছে। বেশির ভাগটাই আবার বিদেশি সোনা।

একই ইস্কুল এরা বারবার দেখায়। কুমীর মাকে শেয়ালের কুমীর ছানা দেখানোর মত। পনেরোটা এমনি ইস্কুলে কোনও কোনও শনিবার রোববার ক্লাস করায়। সেগুলো হলিডে ইস্কুল হয়ে গেল। ইস্কুলও ডবল হয়ে গেল। পনেরো থেকে তিরিশ। একই ইস্কুল ইউনিসেফ-এর লোক এলে তাদের দেখাচ্ছে স্ট্রিট চিলড্রেনের স্কুল বলে, আবার এগুলোই আই এল ও র লোক এলে দেখাবে আইপেক স্কুল বলে। সেটাই চালাবে নাইটশেল্টার অ্যান্ড স্কুল ফর স্ট্রিট চিলড্রেন বলে। কখনও ওপন-লার্নিং স্কুল, কখনও ভোকেশনাল স্কুল। আলাদা আলাদা নাম মানে আলাদা আলাদা প্রোজেক্ট, আলাদা আলাদা টাকা। শুধু মেন্টালি রিটার্ডেডদের স্কুল আর ড্রাগ অ্যাডিক্ট চিলড্রেনদের স্কুলগুলো বাদে, তবে সে আর কটা? সাধারণ বাচ্চাদের মত ড্রাগ অ্যাডিক্ট আর বিকলাঙ্গ বাচ্চাদের সেই ক্ষমতাটাই নেই নিজেদের বদলে বদলে নতুন নতুন প্রোজেক্ট আনার, নতুন নতুন সোনার ডিম।

সুবর্না আমায় এইগুলো বোঝাচ্ছিল, আমি ওকে বললাম, 'এক ভগবান দশ অবতারে দশ ভগবান'। ও বলল, 'তোমার তো দারুন সেন্স অফ হিউমার।

নূপুর সামনাসামনি অতসী বা খোকনবাবুকে খুব তেল দেয়, কিন্তু আড়ালে অনেক কথা বলে। এই চাকরির জন্যেও ওকে এরকম করতে হয় ভাবলে বেশ খারাপ লাগে। চাকরির যা বাজার।

এই সে বাঁশরী সান্যাল সব প্রোজেক্টেরই প্রোজেক্ট-ডিরেক্টর এর মানেও টাকা। প্রোজেক্ট নেওয়ার সময়ই এ এম পি আর জানিয়ে দেয় ডিরেক্টরের পোস্টের জন্য আর ইন্টারভিউ বা রিক্রুটমেন্ট দরকার নেই, পার্সোনেল অন দিজ পোস্টস উড বি সাপ্লায়েড বাই এ এম পি আর। অর্থাৎ সবগুলোর টাকাই এ এম পি আর খাবে। অজিত রায় আর বাঁশরী সান্যাল।

আই এল ও র স্টাফ নাটালি শ্রীধরন এসে কোনও কোনও ইস্কুলে সরাসরি চলে গেছিল, কোথাও কোথাও স্টাফদের জিগ্যেস করেছিল সরাসরি, কত মাইনে পাও, কারন আই এল ও প্রোজেক্টের স্টাফদের অনেক বেশি মাইনে দেয়, সেটা মেরে দেয় এ এম পি আর, এই নিয়ে বাঁশরী সান্যাল অজিত রায়দের প্রচণ্ড ক্ষোভ। ইন্টারভেনশন ইন্টু আওয়ার পার্সোনাল অ্যান্ড ইন্সটিটিউশনাল ডিগনিটি। অবশ্য ইন্সপেকশনের আগে বলে দেওয়া হয় কাকে কী বলতে হবে। তবু সেই বলে দিতে হওয়ার গ্লানিটুকু তো এদের নিতে হয়। ইউনিসেফ আই এল ও র স্টাফরা তারাও ভাবে অত কী দরকার। কাগজে কলমে তো কাজ হচ্ছে।

সরকারি ফান্ডের জন্য অবশ্য ঘুষ দেওয়া হয়। গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া, খাওয়ানো, হাত কচলানো নয় শুধু, সোশাল ওয়েলফেয়ারের অফিসারদের সরাসরি ঘুষ দেওয়া হয় জিওআই প্রজেক্ট পাওয়ার জন্য। ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়। নানারকম যোগাযোগ। সুজাতা বা বাঁশরী সান্যালের এইরকম বিভিন্ন উপযোগিতা আছে বলেই মনে হয়।

এএমপিআর-এর ড্রাইভারদের নাম ঠাকুরদের নামে। শিব, গণেশ, নারায়ণ। শুধু ব্রহ্মা নেই কেউ।

গণেশ, মূলত অজিত রায়ের গাড়ির ড্রাইভার, বাঁশরী সান্যাল-অজিত রায়ের কথা উল্লেখ করে সবসময়ই হেমা-ধর্মেন্দ্র বা বৈজয়ন্তীমালা-দিলীপকুমার বলে। গল্প শোনায় কিভাবে ময়দানের দিকে গাড়ি নিয়ে গিয়ে ব্যাকভিউ মিরর ঘুরিয়ে সিনেমা দেখে। গুল মারে বলেই মনে হয়। এএমপিআর-এর বেশির ভাগ কর্মীই নারী, তাদের সামনে সেক্সের রেফারেন্স দিয়ে কথা বলতে প্লেজার পায় বলেই মনে হয়।

ময়দানটা কোনও বিষয়ই নয়, অজিত রায়ের বৌ মরে গেছে, দুজনে বছরে অন্তত দুবার কন্টিনেন্ট যায় গ্রান্ট-শিকারে, তাদের নিশ্চয়ই ময়দানে গিয়ে পেটিং করতে হয় না। বাঁশরী সান্যাল সিটি কলেজে পল-সায়েন্স পড়ায়। কোনও একসময় অজিত রায়ের ছাত্রী ছিল। সেই সূত্রেই 'স্যার'। এখন সবাই বলে। এমন হতে পারে যে আমি কলেজে পার্টটাইম পড়াই বলে এরা আমায় একটু বেশি পছন্দ করে—নিজেদের কমিউনিটি।

এএমপিআর-এ স্ট্যান্ডার্ড গল্পো মানে বাঁশরী সান্যাল আর সুজাতার যৌনরেষারেষি। কি সে যৌনতা কে জানে, অজিত রায় শুধু বুড়ো না, বেশ একটু অশক্তও। দেখে বিশ্বাস হয় না যে হি ক্যান ডু এনিথিং। বেশ বিশ্বাস রাখা যায় লোকটার উপর, লোকটার অক্ষমতায়। কোনও একজন টিচার নাকি অজিত রায়কে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখে অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছিল 'ও আপনি দাঁড়াতেও পারেন?' অজিত রায় প্রচণ্ড চটে গেছিল। আসলে সবসময়ই অজিত রায়কে শুয়ে থাকতে দেখে। অজিত রায় তার এএমপিআর হারেমে শুয়ে থাকে একটা বিছানায় আর এএমপিআর-কর্মীরা মানে নারীরা তার সঙ্গে দেখা করতে যায়।

রেষারেষিটা আসলে এএমপিআর-এর সম্পদ নিয়ে, সম্পদের ভাগ নিয়ে, অজিত রায়ের সমাজসেবা সে সম্পদের উৎস।

ভালো লাগছে না। একদম ভালো লাগছে না। কষ্ট হচ্ছে। নিঃসঙ্গ লাগছে। নিরাশ্রয় লাগছে। এইসবে না জড়ালেই পারতাম। আবার না জড়িয়েই বা কী করব? পার্টটাইমারের আড়াইশো এখন একমাত্র সম্বল। সেন্টারের ফেলোশিপ শেষ হয়ে গেছে সেই কবে। দেবব্রত চেষ্টা করে না খুব একটা, আর চেষ্টা করলেও যে খুব একটা পাঠাতে পারবে তা মনে হয় না। বাবার রিটায়ারমেন্টের টাকা—সেও তো অনন্ত নয়। টিউশনি দুটো রয়েছে। আরও বাড়াতেই পারি, কিন্তু এতেই থিসিস যে কবে লেখা শেষ করতে পারব জানি না। দুটো চ্যাপ্টার মাত্র কমপ্লিট হয়েছে। তাও মূলত লিটারেচার সার্ভে।

এর চেয়ে কি পুরুলিয়ায়, দেবব্রতের কাছে চলে গেলেই ভাল করতাম? পুরুলিয়া শহরের পার্ক স্ট্রিট পাড়া লীলা পেট্রলপাম্পের পাশের সেই আধোভুতুড়ে বাড়িতে। একটা পেট্রলপাম্পের এমন মিষ্টি নাম ভেবে প্রথমে খুব ভালো লেগেছিল। পরে জানলাম মনোহর সিং লাইলা না ওরকম কী নামের এক মাড়োয়ারির নামে। ওই হন্টেড আনক্যানি বাড়িতে গিয়ে থাকলেই কি ভাল করতাম? সারাদিন ছুটির সঙ্গে থাকতে পারতাম। একজন কলেজ-মাস্টারের মাইনেতে পুরুলিয়া শহরে বেশ ভালোই চলে যায় সংসার। সবই অনেক শস্তা। কাছেই একটা হাট বসে, ছুটির জন্য ওখান থেকে ঢেঁকিছাঁটা চাল কিনেছিলাম, হরলিক্স, কমপ্ল্যানের চেয়ে অনেক বেশি নিউট্রিশাস।

সামনেই জেল সুপারের বাংলোর কম্পাউন্ড। উপরের আকাশটা উঁচু উঁচু গাছের পলাশে পলাশে লাল, দেখে একদিন একঝলকের জন্য সত্যিই আগুন বলে মনে হয়েছিল। একটা স্পিলট সেকেণ্ডের জন্য। কুয়োপাড়ে রোজ একটা ফিঙেপাখি এসে বসত, ছুটিকে দেখিয়েছিলাম। একদিন দুপুরে, দেবব্রত তখন নেই আর ছুটি ঘুমোচ্ছে, ভাবলাম ছবি তুলি। শাটার দুশ পঞ্চাশ, অ্যাপাচার ষোলয় তুললাম। তাতেও পরে দেখি জ্বলে গেছে, ভীষণ ওভার, যা প্রচণ্ড রোদ্দুর! কিয়েভটার মিটারটাও ছাই খারাপ হয়ে গেছে। আমার সব কিছুই শুধু খারাপ আর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ডিকে করে যাচ্ছে।

পুরুলিয়ায় চলে গেলেই পারতাম। সারা দুপুরটা নির্জন, গরমের দুপুরে আরামে ঘুমোতাম। ওখানে থেকে

পিএইচডি ডিসার্টেশন ও অনেক তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত। তারপর একসময় নয় ঝাড়খন্ড জানতাম, অলচিকি শিখতাম। লক্ষ্মীন্দ্রকুমার সরকারের একটা বই কিনব বলে নাম লিখেও রেখেছিলাম।

নিঃসঙ্গতা। আমার বড্ড ভয় করে।

সেদিন রাতে লেটনাইট টিভিতে সিনেমা দেখছিলাম। হলিউড সিনেমা, শনিবারের সেকেণ্ড চ্যানেলে। সেক্সের পর নায়ক উঠে পোশাক পরছে। নায়িকাটি বুকের উপর অব্দি চাদর চেপে আধশোয়া হয়ে আছে। বড় জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। স্যানফ্র্যান্সিস্কোর স্কাইলাইন। নায়িকাটি বলেছিল, তুমি যেও না, আই ফিল লোনলি। তারপর একটুক্ষণ চুপ করে জানলার দিকে চেয়ে থেকে বলেছিল, ডু ইউ থিংক আই অ্যাম লায়িং?

নায়কটি চোখ বুজল, তারপর একটুক্ষণ নিজের হাতের দিকে, মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, নোবডি লায়েজ অ্যাবাউট লোনলিনেস।

এই নিঃসঙ্গতা ডেভেলপড ক্যাপিটালের। আমেরিকার, ইউরোপের। আমি একটা সিটিজেন অফ দি থার্ড ওয়ার্ল্ড, চারপাশে শুধু প্রি-ক্যাপিটাল কমিউনিটি বন্ডজ, আমার এত নিঃসঙ্গতা কেন? শুধু সেক্সের কারণে, দেবব্রত নেই বলে?'

৩॥

রোজই দেখে এই গাড়িগুলোকে না জিপ, না ভ্যান, না ট্রেকার, না বাস। কিছু একটা নাম নিশ্চয়ই আছে, শর্মিষ্ঠা জানে না। ওইরকম গাড়ি দুটো। একটা বড়, একটা একটু ছোট। বড়টা ছাই-ধূসর। অন্যটা গাঢ় সবুজ। তার উপর সাদা বর্ডার দেওয়া অক্ষরে লেখা : অ্যাকাডেমি ফর মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিকাল রিহ্যাবিলিটেশন। 'এ', 'এম', 'পি', 'আর' এই চারটে অক্ষর অন্যগুলোর থেকে একটু বড়। স্কুলগুলোয় রোজ খাবার যায় এই গাড়িতে। বিকেল সাড়ে তিনটে চারটে নাগাদ।

সুবর্না অনেকক্ষণ ধরে বসে ছিল শর্মিষ্ঠার টেবিলের সামনের চেয়ারে। চেয়ারটা একটু বেঁকিয়ে বসেছে সুবর্না। সবারই অসুবিধা হচ্ছে যাতায়াতে। প্রত্যেকবারই, কেউ পেরিয়ে যাওয়ার সময়, সুবর্না ঘুরে বেঁকে নড়ে বসছে, তবু চেয়ার সরিয়ে বসার কথা ওর খেয়াল হয়নি। অন্যরাও কেউ কিছু বলতে অস্বস্তি পায়, শত হলেও ডাক্তার, সুবর্নার চেহারাটাও ডাক্তার-ভারিক্কি, কিছুটা মেদ, সেইজন্যই সালওয়ার খুব কম পরে, একদিন বলেছিল। 'শাড়ি তো খুব ভালো সাপ্রেস করে, দোজ ইউ ওয়ন্ট টু শো, অ্যান্ড দোজ ইউ ডোন্ট।'

সুবর্না একটু ছেলেদের মত। একটু এলোমেলো, জোরে কথা বলে, একটানা বলে যায়। হয়ত ডাক্তারি পড়াটাই ওকে একটু অন্যরকম করে দিয়েছে।

সুবর্না গল্প করছিল, এএমপিআর, ডাক্তারি, সরকারি হাসপাতালের চাকরির পোস্টিং-এ ব্যাকিং, এখানের বিশৃঙ্খলা, এলোমেলো এরকম নানা কিছু।

'আমার ডিউটি আওয়ার্স দুটো থেকে ছটা, ক্লাস দেরিতে বলে আমায় বসে থাকতে হবে? কেউ কোনও ডিসিশন নিতে পারে না। রায় কোম্পানি, ডক্টর রায় আর তার খোকনসোনা দুজনেই কোর্টে গেছে —কেন? একজনের যেতে কী হয়েছিল?'

অজিত রায়কে স্যার বলে না, অন্তত রেফারেন্সে, এখানে শর্মিষ্ঠা ছাড়া আর এই একজনই, সুবর্ণা। তারা দুজনেই ডক্টর রায় বলে উল্লেখ করে। ডক্টর রায়ের ছেলে খোকনকে একটু অদ্ভুত লাগে শর্মিষ্ঠার, রিগ্রেশনে ভোগে বলে মনে হয়। বাঁশরী সান্যাল সামনে থেকে চলে যাওয়া মাত্রই মুখ কোঁচকায়, দেখে শর্মিষ্ঠা মজা পেয়েছিল। ডক্টর রায় এবং তার ছেলের সম্পর্কে এই তাচ্ছিল্যপূর্ণ উল্লেখ একটা সচেতনতা সৃষ্টি করে। অন্য দুই টেবিল থেকে মিতা আর নূপুর শর্মিষ্ঠার দিকে তাকায় একঝলক। শর্মিষ্ঠার ভালোই লাগে। স্মিত হাসির আভাসকে ঠোঁট থেকে গোপন করে।

'আমায় কতক্ষণ এখন বসে থাকতে হবে তুমিই বলো শর্মিষ্ঠা। আমি বরং টিফিন খাই।'

সুবর্ণা তার বিরাট শরীরের সমানুপাতিক একটা ঢাউশ ব্যাগ থেকে কৌটো বার করে। রুটি আর ঢেঁড়শের তরকারি। আর দুটো শোনপাপড়ি। শোনপাপড়িটা দেখে শর্মিষ্ঠার মনে হয়, সুবর্ণাও তার মত বাপের বাড়িতে আছে এখন।

'তুমি নেবে একটু—নাওনা?'

'নাঃ, আজ আমি খুব দেরিতে বেরিয়েছি, বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে।' সুবর্ণার টিফিন নিতে শর্মিষ্ঠার ভালোই লাগত।

'এই যে স্যারেরা, আর কেউ নেবে? বলে ফেলো তাড়াতাড়ি, শেষ হয়ে যাবে।' সুবর্ণা বলে, আন্তরিকতাতেই, আর খেতে থাকে। নূপুর হেসে ফেলে। মুখ তুলে নূপুরের হাসি দেখে সুবর্ণা। বড় হাঁ মুখে হাসে। বলে, 'আমি খুব অদ্ভুত, না?' ঢেঁড়শের তরকারির তেল লাগা আঙুলে একটা শোনপাপড়ি তুলে নূপুরকে দেয়। 'খেয়ে ফেলো, অন্যটা আমি খাই।' সুবর্ণার এই অমেয়ে সুলভতা শর্মিষ্ঠাকে একটা আলগা তৃপ্তি দেয়। সেও কলেজে ইউনিভার্সিটিতে অন্যদের এঁটো চা কফি খেত, ছেলেদের মত, অনেক মেয়েই যা কল্পনাও করতে পারে না। সুবর্ণা এরকম কেন? ওর বাড়িতে রাজনীতি ছিল বলে? ওর বাবা পুরসভার কমিশনার ছিল। বর সাংবাদিক। ওরা খেতে খেতেই অতসী আসে। 'গাড়ি এসে গেছে'। শুধু গাড়ি এসে যাওয়ার ঘোষণা, যেতে বলা নয়। অতসী বোধহয় নিশ্চিত নয় মিতা নূপুরকে বলতে পারলেও, সুবর্ণা বা শর্মিষ্ঠাকে সে বলতে পারে কিনা। সুবর্ণা আর শর্মিষ্ঠা দুজনেই এখানের কর্মীদের মধ্যে এলিট। সপ্তাহে মাত্র তিনদিন অন্যদের চেয়ে বেশি মাইনে পায়।

এর আগে কখনও অফিসের গাড়িতে সবার সঙ্গে চড়েনি শর্মিষ্ঠা। ভাবছিল, কে কোথায় বসবে। বন্ধুদের মধ্যে যারা সরকারি অফিসার, বা ব্যাঙ্কের, তাদের কাছ থেকে শুনেছি : গাড়ির সামনে কে, পেছনে কে, কার পাশে কে, কোন স্কেলের অফিসারের পাশে কোন স্কেলের অফিসার বসতে পারলেও কিছুতেই গায়ে গা লাগাতে পারবে না তার ঘনসংবদ্ধ নিয়মকানুন আছে।

এখানে সবাই উঠল পিছনে। শুধু ড্রাইভার শিব সামনে। শিবের নামের মাহাত্ম্য তার জীবনেও। সকাল থেকেই, শোনা যায়, গাঁজা খায় শিব। কাজে ডাকা হয় খুব কম। চাকরি যায়না কারণ খুব বিশ্বাসী। কাজের দক্ষতার চেয়েও বিশ্বাসটা এখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুনেই শর্মিষ্ঠার মনে হয়েছিল এমন গোপনীয়তা এখানে কী থাকবে? পরে দেখল থাকতেই পারে। আরও বাঁশরী সান্যাল বা সুজাতা বা তাদের কীভাবে ব্যবহার করা হয় তাকে ঘিরে। এএমপিআর-এর গণ্ডগোল, যারা জানার তারা অনেকেই জানে। তাও কোনও ফান্ড, বিশেষত কোনও সরকারি ফান্ড কখনও বন্ধ হয় না। উল্টে বাঁশরী সান্যাল সরকারের ফিল্ম সংক্রান্ত কমিটিতে আসে, কেন্দ্রীয় শিশুশ্রম অপসারণ বোর্ডের মেম্বার হয়। অবশ্য এটাই তো হওয়ার কথা : এত অবাক হচ্ছে কেন সে : ইনোসেন্স?

একডালিয়ায় থামল গাড়িটা। কাঁধের সর্বক্ষণের চটের ব্যাগটা গাড়িতে রেখে নামল অতসী। রোগা শুকনো লম্বা চেহারার অতসীর নড়াচড়ায় একটা ক্ষিপ্রতা থাকে, দেখে শর্মিষ্ঠা।

চারদিকে ভিড়, ব্যস্ত এলোমেলো ট্রাফিক, তারই মধ্যে বেশ প্রশস্ত স্পেসময় একটা গাড়িতে ফাঁকা ফাঁকা বসে যেতে পারার বিলাস উপস্থিত সবাইকে একটা লঘু সামগ্রিকতা দেয়। শিব আর অতসী দুটো বড় ঝাঁকা তোলে গাড়িতে। অতসীর গায়ে বেশ জোর আছে, মনে হয় শর্মিষ্ঠার।

'কী, ধরব?' শর্মিষ্ঠা জিগ্যেস করে। অতসী নামটা এত কম পেয়েছে শর্মিষ্ঠা যে নামটা মাথায় আসা মাত্রই মাণিকের 'অতসীমামী' ছায়া ফেলে। ক্লিষ্ট কৃশতা, লড়াই। সে গুলোকে মেলানো অতসীর সঙ্গে।

অতসী, বোধহয়, খুশি হল। একটু, কাঠকাঠ ভাবেই বলেছিল, 'এমন কিছু ভার নয়।' কিন্তু ওর দৃষ্টিতে একটা ডিফারেন্স দেখতে পায় শর্মিষ্ঠা।

কাঠকাঠ ছাড়া অন্য কোনও ভাবে বোধ হয় কথা বলতে পারেই না অতসী। একটু খারাপ লাগে শর্মিষ্ঠার, কষ্ট। দাদাদের সংসার, আশ্রয়, জীবন টেনে চলা। বিয়ে হয়নি, হবে কি আর? ওর যা চেহারা তাতে অজিত রায় কোনওদিন নজর দিয়েছে বলে মনে হয় না। সেই নজর না-দেওয়াটা কী চোখে দেখে অতসী? সুজাতা বা বাঁশরী সান্যালের ব্যবহারে যে অধিকারবোধ থাকে, অথরিটি, অতসীর সেটা নেই। অতসী তার শরীরেও প্রিভিলেজহীন।

'হরির লুট এসে গেল'। সুবর্ণা বলল, চোখ খাবারের ঝাঁকাদুটোর দিকে, গাড়ি চলতে শুরু করে।

'মাঃ, ওরকম বোলোনা', বলতে বলতে নূপুর হাত কপালে তুলে নমস্কার করেছিল।

শর্মিষ্ঠার ঠোঁটস্থ প্রশ্নটাই করে ওঠে সুবর্ণা, 'তুমি কি আমার কথা শোনার পাপ থেকে বাঁচতে নমস্কার ঠুকলে?'

'যাঃ—ওই যে দেখো, ওইখানে—', নূপুরের কথা শেষ হয় না। রাস্তার বাঁকে গাছের নিচে মেকশিফ্‌ট ছোট্ট মন্দির, পয়সার থালা, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মিতা আঙুল এনে কপালে ছোঁয়ায়।

'সাধে দেশে বিজেপি বাড়ে', গলাটা একটু নামায় সুবর্ণা, '—ওদিকে শিব, এদিকে প্রণাম।'

সবাই হাসে, অতসীও।

মিতার মুখে প্রথম হাসিটার পর একটা অন্যমনস্ক হাসি ফুটে উঠতে দেখল শর্মিষ্ঠা। 'সুবর্ণাদি, তোমার সঙ্গে রেখার একটা মিল আছে।' একটু অনিশ্চিত ভাবে বলে মিতা, বলতে লজ্জা পাচ্ছিল।

সুবর্ণা হাহা করে হেসে ওঠে। 'রেখা, আমার সঙ্গে? পারি না, তৃণাঞ্জনকে এটা শোনাতেইহবে। ওরে, আমার শুধু পেটের মধ্যেই একটা রেখা থাকতে পারে।' নিজেকে নিয়েই রসিকতা করে সুবর্ণা, কিন্তু মিতা লজ্জা পাচ্ছিল।

শর্মিষ্ঠা বলে, 'আমি বুঝেছি—তুমি খুবসুরতের রেখার কথা বলছ তো?'

নূপুর, রসিকতার প্রতিবেশটাকে ধরে রাখতে, ওরা এখন অফিসের কাজে নয়, পিকনিকে চলেছে, বলে, 'নানা, উমরাও জানের রেখার কথা চলছে।'

সবাই হাসছে, শর্মিষ্ঠার দিকে মিতা একবার কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল।

কালীঘাট রোডের স্কুলের সামনে গাড়ি দাঁড়ায়। এখান থেকে চেতলা যাবে।কাছাকাছি ওখানে তিনটে স্কুল। স্কুলের সামনে কয়েকফুট জমি। উজ্জ্বল আলকাতরা লাগানো বাঁশের বেড়ার ঘর। জমিটুকুতে কয়েকটা গাঁদাগাছ। একটা যত্ন । কে করে যত্নটা? এএমপিআর, স্কুলের টিচাররা, না কমিউনিটি? বস্তিকে সচরাচর ওরা, এনজিও জগতে, কমিউনিটি বলে উল্লেখ করে, সেখানের ছেলেমেয়েদের জন্য চলছে স্কুলগুলো।

টিচাররা আন্টি। তারা, এএমপিআর-এর সরাসরি কর্মীরা বড়-আন্টি। সুবর্ণা ডাক্তার-আন্টি।

ঘরে ঢুকেই বাঁদিকে টেবিলে বড় ক্যারমবোর্ড। অত উঁচু টেবিলে বাচ্চারা খেলবে কী করে? ক্যারমবোর্ডের আবরণ

মোটা গাঢ়-নীল কাপড়ের। বড়-আন্টিরা আসায় চায়ের কাপ এনে তার উপরেই রাখা হয়। ক্যারমবোর্ডটা নষ্ট হয়ে যাবে : বারণ করতে গিয়েও করে না শর্মিষ্ঠা, তার ভূমিকা সে যতটা পারে নিষ্ক্রিয় দর্শকেরই রাখতে চায়।

তাদের জন্য টিচার উঠে এসেছে, বাচ্চারা গণ্ডগোল করছিল, দাঁড়ানোমাত্রই অনেকটা চুপ করে যায়। দেওয়ালে ঝোলানো ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে মেঝেতে শতরঞ্চিতে গোটা পঁচিশের বাচ্চা। তার পিছনে দুটো লো-বেঞ্চে আট-ন-জন। এরা মেয়ে, একটু বড়। এই বয়সের, দশ বা তার বেশি, ছেলেরা হয় পড়াশুনো করেই-না, আর করলে সেটা ফর্মাল স্কুলে, বাবা-মা পয়সা খরচ করে পড়ায়।

ব্ল্যাকবোর্ডটা যে উচ্চতায় তাতে একদম ছোটদের খুবই অসুবিধা, কোনওরকমে হাত পায়। নামালে আবার বড়দের, টিচারের পক্ষে খুবই অসুবিধা, কোমর ভেঙে ছাড়া পৌঁছতেই পারবে না। এটা অ্যাভারেজ পজিশন, এবং সতত যে কোনও নিরপেক্ষ অ্যাভারেজ যেমন হয় কোনও একটা দিকে একটু স্কিউড, এক্ষেত্রে বড়দের তথা টিচারদের দিকে। নিজের করা রসিকতা নিজেকেই মনে মনে শোনায় শর্মিষ্ঠা : সবাই মনোযোগী মুখভঙ্গীতে টিচারের কথা শুনছে।

এইসময়ের গাড়ি মানেই খাবারের গাড়ি। বসে থাকার অনুজ্ঞা না-শুনেই কিছু বাচ্চা উঠে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। জামা প্যান্ট প্রায়ই ছেঁড়া, অথবা সেফটিপিন, বড় বড় ফাঁক দিয়ে দেখা যায় অনুজ্জ্বল কালো চামড়া : দারিদ্র।

স্কুলে তাও এরা সবাই সেজে আসে, নিজেদের সেরা জামাকাপড়। মেয়েরা আসে চুল বেঁধে, কালো মুখের পাশে পেতে থাকা তেলমাখা টেনে আঁচড়ানো কালো চুল, আরও অসহায় দেখায়?

এখানের টিচার কল্পনাদি। বয়স্ক। একটু গম্ভীর। এএমপিআর-এর অফিসে যে দু একজন টিচারের সঙ্গে অতসী বা অন্যান্যরা বাধ্যতামূলক তাচ্ছিল্য ছাড়া অন্য কোনও গলায় কথা বলে তাদের একজন। হয়ত তার একটা কারণ এই যে কল্পনাদি অন্য অনেক টিচারের মত অসহায়ও নন। স্বামী সরকারি অফিসার, রিটায়ার করেছেন, কল্পনাদি কিছুটা শখে, সমাজসেবা, করেন এই স্কুলে, আরও একটা।

কালো হলুদ চওড়া পাড় সাদা ছাপা শাড়ি, কাঁচাপাকা চুল, চশমাটা একটু ত্রিভুজাকৃতি, চশমা খুলে হাতে নেন কল্পনাদি।

'বড়-আন্টিদের দেখিয়ে দে আফসানা, কমল, কেমন শিখেছিস। কী রে?'

আফসানা কোন জন, পেছনের বেঞ্চের মেয়ে কজনের একজন কেউ, শর্মিষ্ঠা বুঝতে পারে না। কমল, তাই হবে, একটি ছেলে, মাটিতে বসে আছে, উঠে দাঁড়াল।

'ছবি আঁকব আন্টি, সেই দরজা দেওয়া ঘরের ছবি? চালাঘর, সিঁড়ি, একটা নারকোল গাছ?'

হয়ত আগে যেদিন কেউ এসেছিল বড় অফিস থেকে, বা ফান্ডের উৎস বিদেশী কোনও পরিদর্শক, সাহেব বা মেম, রিচ হোয়াইট মেল বা ফিমেল, সেদিনও কুঁড়েঘর একেছিল কমল।,

'না, ছবি না।' কল্পনাদির গলার স্নেহটা শর্মিষ্ঠার ভালো লাগে। বাঁ দিকে স্কুলের আর একজন টিচার, নামটা এখনও জানেনি শর্মিষ্ঠা, তার সঙ্গে দুজন বাচ্চা। একটি বাচ্চার ঘাড় বাঁ হাতে আঁকড়ে ধরে ডান হাতের আঙুলে চোখের পাতা টেনে দেখছে সুবর্ণা। বাচ্চাটাকে কী ছোট আর ভঙ্গুর লাগে। ঝুঁকে দাঁড়ানো সুবর্ণার বিরাট শরীরের সামনে। ডেভিডের হাতে বিড়ালছানা। ছুটির কথা মনে আসে শর্মিষ্ঠার। ভাবতে গেলে অবাক লাগে, একসময় তার পেটের ভিতর ছিল। এর মধ্যেই দশ কেজি ওজন হয়ে গেছে, ঠিক পার্সেন্টাইলেই আছে, বয়স দিয়ে কী একটা ফর্মুলা আছে ওজন মেলানোর, সুবর্ণা বলেছে শিখিয়ে দেবে।

'তোমরা প্রশ্নের উত্তর দাও তো, আগেই শিখিয়েছি, বলো, বলো তো কেউ, সবচেয়ে বড় পাখি কী?'

দু একটা হাত ওঠে ইতস্তত।

'না, নীলিমা না, কালুও না, বেনুগোপাল বলো, সবচেয়ে বড় পাখি কী?'

'চিল, আন্টি।'

'হল না, উটপাখি।'

উটপাখি উটপাখি উটপাখি
বালি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
লোকায়ত আর লোকোত্তর, নিবিদ আর অকারী,
কোনোদিন ডিকশনারি দেখা হয়ে ওঠেনি
ফিকশনাল
কী ভীষণ ফিকশনাল, সে শর্মিষ্ঠা কি সত্যিই দেখছে এসব? সত্যিকারের পায়ের উপর সত্যি সত্যি দাঁড়িয়ে? শোন বাচ্চা, শ্রমিকের বাচ্চা, তুইও বাচ্চা শ্রমিক, শিশুশ্রমিক, তুই প্রেত, আত্মা : এসেন্স, হেগেলের এসেন্স, তোর থেকে ফ্লো করে, শাইনিং ফোর্থ, ঝকঝক করে ওঠে চকচকে পয়সা, গড়ায় গড়ায়, হেড না টেল, হেড না টেল, হেড না টেল, হেড আই উইন, টেল ইউ লুজ, তুই উটপাখির গল্প শোন, পয়সা গড়াক

গলির ভিতর থেকে গাড়ি এসে বেরোয় কালীঘাট ঠিক আগে, বাঁয়ে ঘুরে ব্রিজে ওঠে।

নূপুর বাঁয়ে মুখ রেখে বলে, একটু সঙ্কুচিত গলায়, 'ওই ওদের বাচ্চাও অনেক আছে এই স্কুলে।'

নূপুরের বাক্যে কারা উদ্দিষ্ট ছিল বুঝতে শর্মিষ্ঠাকে মুখ ঘোরাতে হয় না। কালীঘাট ব্রিজ মানেই সারি সারি বেশ্যা—রিসার্চের কাজে ন্যাশনাল লাইব্রেরি যেতে, দিনের নানা সময়ে, সকালে বিকেলে রাতে, নানা ঋতুতে, কালীঘাট ব্রিজের বেশ্যাদের দেখেছে শর্মিষ্ঠা। রোববারে আর ছুটির দিনে ন্যাশনাল লাইব্রেরি একটু ফাঁকা থাকে। এক রোববার সকালে হাজরা থেকে ওঠা ফাঁকা ট্রামে যেতে যেতে রোগা কিন্তু সকালের রোদে উজ্জ্বল দুটি কিশোরী বেশ্যাকে ব্রিজের রেলিঙে বসে পা দোলাতে দোলাতে, হয়ত ছোলাভাজা, হয়ত ঝালমুড়ি, খেতে দেখেছিল। সকালের আলো ম্যাজিক, হয়ত একটু রুগ্ন আর ক্ষয়াটে, মেয়ে দুটোর থেকে কোনো ক্লান্তি বা গ্লানি বা নিপীড়ন তখন বিকীর্ণ হচ্ছিল না। নিজের কৈশোরের জন্য কষ্ট হয়েছিল শর্মিষ্ঠার, যখন ইস্কুলের টিফিনের সময় প্রায়ই ইস্কুলের উপরের আকাশে ঘুরে বেড়ানো সুদর্শন স্মার্ট শিকারী চিলেরা। তার হাত থেকে খাবার কেড়ে নিয়ে যেত।

'ওদের মানে, বেশ্যাদের?'

শুধু নূপুর না, অন্যরাও শর্মিষ্ঠার দিকে একঝলক তাকায়, তার বাক্যে কি রূঢ়তা ছিল? না, ওই শব্দটা?

নিস্তব্ধতা ভেঙে সুবর্ণা বলে, 'ওদের বাচ্চারা প্রায়ই বাঁচে না। কনজেনিটাল ডিফর্মিটিজ থাকে। ওদের আর কে আলট্রাসনিক করাবে? এসটিডি ইনফেকশন। এখানে তো এইডস কেসও বেরিয়েছে শুনেছি।'

'এখানে, না খিদিরপুরে?' একটু সাবধানী গলায় জিগ্যেস করে অতসী।

মিতা, যেমন প্রায়ই, কাকে বলছে বোঝা যায় না, একটু অন্যমনস্ক গলায় বলে, 'বইমেলায় আগে আসত ওরা, লিফলেট দিত, একটা ঠিকানা ছিল, ভেবেছিলাম টাকা পাঠাব। তা, আমার আর টাকা কোথায়?'

'এখন তো হয়েছে, নিজের টাকা।' বলে শর্মিষ্ঠা। 'ওই বাচ্চা রাখার রাইট নিয়ে তো?'

শর্মিষ্ঠার দিকে তাকায়, মাথা নাড়ায় মিতা। মেয়েটা একটু অন্যরকম। একটু ছেলেমানুষ। নতুন তারা যে কজন ঢুকেছে তাদেরই একজন। এএমপিআর-এর পুরোনো স্টাফ অতসী, সুজাতা, চন্দ্রারা পছন্দ করে না। পুরোনোরা শুরুতে অনেক কম পেত। এরা প্রথমেই ওদের সমান পায়। মিতা ইংরিজির ছাত্রী। অফিসের কাছেই বাড়ি, ফার্ন রোডে। অন্য প্রাইভেট কোম্পানিতে হলে ওর ইংরিজিটা ওকে সাহায্যই করত। খাটাখাটনি একই, কিন্তু মাইনেটা বেশি হত। কিন্তু তাতে মিতার বাড়ির আপত্তি। এখানে কাজ করে টিউশনি করতে পারছে, পড়াশুনোর ভিতর থাকা, যাতায়াতেও সময় নষ্ট হয় না। আর আফটার অল কাজটা তো ভালো : এনজিও, গরীবলোক, সোশাল সার্ভিস। মিতাকে প্রথমে বলেছিল এএমপিআর-এর লিটারেচারগুলোর, রিপোর্ট বা বুকলেট বা প্রোপাগাণ্ডা, প্রুফ কারেক্ট করতে হবে। এখন বাচ্চাদের হেলথ-ফাইল, কাগজের কাটিং ফাইলিং সবই করতে হয়। আজ ওর আসা বাচ্চাদের হেলথ ফাইল নিয়ে টিচারদের সঙ্গে কথা বলতে। না এলে চলত না তা নয়, আরো সবাই আসছে। মিতা একটু অন্যমনস্ক, ছেলেমানুষ। অফিসে গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলার টেকনোলজি কি ওর পক্ষে বোঝা সম্ভব? কী করে রয়ে গেল এতটা ছেলেমানুষ? মাস্টারমশাই বাবা এবং দিদিমণি মার দুই ছেলের পর এক মেয়ে বলে—প্রোটেক্টেড, আদুরে? তেমন দারিদ্র কখনো দেখতে হয়নি বলে?

শর্মিষ্ঠার কথায় একটু হাসে মিথা। তারপর, এবার-কাজে-ফেরা-দরকার এই ভঙ্গিতে, গম্ভীর হওয়ার রকম, বলে ওঠে, 'দুজন বাচ্চার কথা কিন্তু লিস্টে ছিলই না, সুবর্ণাদি।'

'তাই? কল্পনাদি তো এমনিতে বেশ রেস্পন্সিবল, বাচ্চাদের লিস্ট, অসুস্থ কে কে, ঠিক সময়ই তো পাঠায়। যদিও পাঠিয়ে যে কী হয়?'

'কে কত রেস্পন্সিবল সব আমার জানা আছে।' অতসী বলে।

'হ্যাঁ—সেই। কোনো টিচার একটাও টেস্ট করায় ঠিকমতো? সুবর্ণাদি লিখে দেওয়ার পর টেস্ট তো ওদেরই করার কথা।' নূপুর বলে, অতসীর বলার পর যে কথাটা সঙ্গত ও লাগসই বলে মনে হয়। এএমপিআর-এর এই চাকরি চলে যাওয়ার ভয়ও ওকে পেতে হয়, ভাবে শর্মিষ্ঠা, অথবা কোনো কোনো মানুষ হয়ত গঠনগত ভাবেই এরকম—সত্যিই কি তা হয়?

'আরে ছাড়ো তো—দাও মাসে দুশো টাকা। তাতে হয়টা কী? আর টেস্ট—ওতো কী রেজাল্ট হবে, আগেই টাইপ হয়ে আছে। কমিশন। কমিশন বোঝো? কমিশন? কাটমানি। রাজীব গান্ধীও খেত, নরসিমাও খায়, সবাই খায়।'

সুবর্ণা, হয়ত অতসী সামনে থাকাতে, অথবা হয়ত অভদ্রতা এড়াতে, অজিত রায়ের নামটা উচ্চারণ করে উঠতে পারে না। সেই ফাঁকটা পূরণ করতে সুবর্ণাকে আরো একটু উচ্চকিত, সহাস্য হয়ে উঠতে হয়।

সুবর্ণা, হয়ত অতসী সামনে থাকাতে, অথবা হয়ত অভদ্রতা এড়াতে, অজিত রায়ের নামটা উচ্চারণ করে উঠতে পারে না। সেই ফাঁকটা পূরণ করতে সুবর্ণাকে আরো একটু উচ্চকিত, সহাস্য হয়ে উঠতে হয়।

'কেন, কল্পনাদি তো আড়াইশো পায়।' একটু আহত গলা, অতসী বলে। অজিত রায় খোকন বাঁশরী সান্যালদের, এএমপিআর-এর পক্ষাচরণ করাটা ওর দায়িত্ব হয়ে ওঠে।

কেন? ও পায় হাজার টাকা। এছাড়া খাবারের ব্যাপারটা দেখে অতসী আর খোকনবাবু। সেখান থেকে হয়ত কিছুটা কাটমানি। সে বা এমন কী? অতসী বাঁশরী সান্যাল নয়। অতসী সুজাতাও নয়। সুজাতা এখন অজিত রায়ের টাকার ড্রয়ার হ্যান্ডল করে। সেদিন সোশিওলজিকাল সার্ভের কোয়েশ্চেনেয়ার নিয়ে কথা বলতে উপরে গিয়েছিল শর্মিষ্ঠা। ভিতরের—'স্যারের'—ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুজাতা। 'উনি রেস্ট নিচ্ছেন যে'। 'স্যার'-ও নয়, 'উনি'। সুজাতার হাতে টাকা। বেশ কয়েকগোছ একশো টাকার নোট। পেট্রলের, বা অন্যকিছুর। সুজাতার মাসমাইনের বহুগুণ বেশি। যেভাবে পরে অফিসে এসেছিল, এখন শাড়িটা তার থেকে অন্যরকম করে পরা। আগেকার দিনের, আজকালও, মা মাসিদের মত : যত্নশীলা। আঁচলে চাবির গোছা, হয়ত টাকার ড্রয়ারেরও। প্লাম্প অ্যান্ড ফ্রেশি 'উনি'-গরবী বিড়ালের সুখী নরম হাসি হাসল সুজাতা। সেই হাসি অতসী হাসতে পারে না। তবুও অতসীকে নিজের মত করে নিজের পজিশনকে সাজিয়ে নিতে হয়েছে। টিচাররা খারাপ, এএমপিআর-কে ঠকাবে, ঠকাবেই, তাদের খারাপত্ব শায়েস্তা করার জন্যই সে—অতসী। এইরকমভাবে অতসী, ভাবতে হয়, পরিবারে সামাজিকতায় অফিসে তার গুরুত্বকে ঘিরে সামগ্রিক জীবনের পরতে পরতে সে অসহায়তা, তাকে সামলে ওঠার মতো একটা প্রকরণ তার দরকার। একটা ভূমিকা পালন, রোলপ্লেয়িং। সবাইকে সবসময়ই তো একটা না একটা রোলপ্লেয়িং করে চলতে হয়। একটা রোলপ্লেয়িং, সার্ভিং টু অ্যান ইমেজ, স্বপ্রযুক্ত বা আরোপিত, এন্ডো বা এক্সোজেনাস।

'হ্যাঁ, সেই, দুশো নয়, আড়াইশো। আ ড়া ই শো তো অনেক টাকা, প্রচুর, তাই না? কী বল, শর্মিষ্ঠা?' সুবর্ণা, হয়ত ঝগড়ার অস্বস্তি কাটাতেই, শর্মিষ্ঠাকে কথার ভিতর টেনে আনে। শর্মিষ্ঠার এই বাদানুবাদ বোকা ও অকারণ বলে মনে হয়। আর বিনা কাজে, বিনা প্রয়োজনে, ফরনাথিং, কারুর অপ্রিয়তা তৈরি করার কী মানে? এমন নয় যে বাস্তবতাটা অতসীর দ্বারাই ডিটারমিন্ড শর্মিষ্ঠার রাজনীতির অভ্যেস : ডিপ্লোম্যাসি?

'এই মেডিকাল, আর রোজকার হাজিরা, না এলে খোঁজ নেওয়া, এ ছাড়া একটা টিচারকে আর কী করতে হয়?'

'অ্যাডমিশন, জেনেরাল সার্ভে কন্ডিশন রিপোর্ট। বাচ্চাদের পার্ফম্যান্সের ইভ্যালুয়েশন। সপ্তায় একবার করে সেন্টার চালানোর রিকুইজিশন।' থেমে থেমে, নরম অ্যাকাডেমিক গলায়, যেন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, বলে মিতা। ক্লাস ওয়ান থেকে এমএ অবদি স্টুডিয়াস, মোটামুটি ভালো ছাত্রী থেকে পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়ার একটা ছাপ থাকে ওর কথায়। মিতারও হয়ত খারাপও লাগছিল এই ঝগড়ার আবহাওয়ায়, শর্মিষ্ঠার মতই, খড়কুটো যাই পাক, বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল।

শরীরের বিরাটত্বের মত সুবর্ণার এক্সিটেন্সটাই একটু উচ্চকিত। এই লড়াকু ব্যাপারটা ওর ভিতর কোথা থেকে আসে? এল সি এস থেকে কমিশনার বাবা, মহিলা সমিতি করা না? বাড়ির হাওয়াতেই পলেমিক? সুবর্ণা কি এক মেয়ে, বোধহয়, কখনও একটা জিগ্যেস করতে হবে, শর্মিষ্ঠা ভাবল।

'না, তোমরাই বলো, কয়েকজনের আড়াইশো, বেশির ভাগেরই দুশো, ওই টাকায় কী হয় বলো তো? কালীঘাটের ওই ওরা, ওদের পরিসেবাও হয় কিনা কে জানে?' হাসে সুবর্ণা, অন্যরাও। 'ও, শোনো শর্মিষ্ঠা, তোমাদেরই তো টার্ম, পরিসেবা, —'দন্ত স' না 'মূর্ধণ্য ষ'? মানে তো সার্ভিস, তাই না?'

'কে জানে?' বলে শর্মিষ্ঠা, তখনও হাসছিল, নিজের অনিশ্চয়তাকে আরও একটু বাড়িয়ে তুলে। 'আমরা তো গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেসেই লিখে এলাম সারা জীবন। আমি তো ইংরিজি মিডিয়মে পড়েছি, মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত। মেয়েকে পড়াব বাংলা মিডিয়মে।'

'ছুটি, আপনার মেয়ে, একদিনও আনলেন না তো অফিসে?' অতসী বলে। তার ক্লিষ্ট ও শুকনো মুখে একটা নরম আভা আসে, বা বাইরের উজ্জ্বল আলো গাড়ির ভিতরে ইনডোরে একটা কাটলাইটের নরম এফেক্ট এনেছিল। 'দু বছর—তাই না?' একটা বিষণ্ণতাও থাকে, আলগা। বা শর্মিষ্ঠা সেরকমই ভাবে।

'ও—সুবর্ণাদি বলল তো মজা করে, কিন্তু জি ও আই স্কুলের ওই শিখা, শিখা ব্রহ্ম, ওর স্বভাব তো ওইরকম, ও একদিন কালীঘাটের একটা মেয়েকে সত্যিই জিগ্যেস করেছিল, ভাই তোমার রেট কত?'

'যাঃ', আপাদমস্তক বিস্মিত হয় শর্মিষ্ঠা, সঙ্গে শিখা ব্রহ্মের প্রতি একটা অ্যাডমায়ারেশন : ডিফারেন্টের প্রতি।

'হ্যাঁ গো, ও ওইরকম,' কেচ্ছা করার পরিচিত ইলাবোরেশন, নূপুর বলে। 'ওর একটা স্কুল পেয়ারাবাগান কমিউনিটির বাচ্চাদের, পদ্মপুকুর ইন্সটিটিউশনে। অন্যটা কালীঘাটে। হেঁটে যায়, সঙ্গে কোনও টিচার থাকলে তাকেও হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। তখনই তো ওইসব কথা বলে, ওদের সঙ্গে।'

শিখা ব্রহ্ম, একটা মানুষ, শুধু বেশ্যাদের কাছে রেট জিগ্যেস করবে বলে পদ্মপুকুর থেকে কালীঘাট হেঁটে যায় ল্যান্সডাউন বেলতলা হাজরা পেরিয়ে, এরকম ভাবা যেতে পারে নূপুরের কথা শুনে। একটা কষ্ট ঘুলিয়ে ওঠে শর্মিষ্ঠার গলায়। দারিদ্র কোনওদিনই সে ফেস করেনি, তাও কারও দারিদ্রের অসহায়তার কথা শুনলেই তার এরকম গা গুলিয় ওঠে কেন? সে কি দারিদ্রকে ভয় পায়—এই চাকরি না পেতে থাকা, আনসার্টেনটি, এইসব?

এরা শিখা ব্রহ্মকে এরকম খারাপ বলে কেন, আগেও শুনেছে শর্মিষ্ঠা, বুঝতে পারে না। স্লিভ লেস ব্লাউজ পরে বলে, আরও ওই অর্থনৈতিক স্ট্যাটার নারী হয়েও? ছেনালি, মনোহারিনীপনা, ঢঙ, সুজাতার যেমন, একটু এলিট রকমে হয়ত বাঁশরী সান্যালেরও, তাদের এম এস সি ইকনমিক্সের ক্লাসে টুটু যেমন ছিল, জনান্তিকে সিল্ক স্মিথা বলে ডাকা হত, সেসব তো কিছু দেখেনি শিখা ব্রহ্মের। বরং চুলগুলো এলোমেলো, ঝোড়ো কাকের মত, একদিন শর্মিষ্ঠার শখ হয়েছিল, ধরে বেঁধে দিই। চোখগুলো একটু ধারালো, তীব্র। মুখটা লম্বাটে, হনুর হাড় উঁচু, চোখ দুটো একটু কোটরে ঢোকা কিন্তু বড়, তাই হয়ত আরও তীব্র লাগে। গরিবদের, বিশেষত বয়স্ক গরিবদের যেটা খুব কম হয়। পঞ্চাননতলা থেকে তাদের সেলিমপুরের বাড়িতে কাজ করতে যায় সাবিত্রী, সাবিত্রীর চোখ বরফ দেওয়া মরা মাছের মত, যেমন মাছ ওকে রাঁধতে হয় আর ওর পেটফোলা, গলায় কোমরে তাবিজ, গোলমুখ কালো বাচ্চাটার চোখ তেল মাখানো কাঁচের গুলির মত, রক্তবর্ণ চেরির উজ্জ্বলতা, সে উজ্জ্বলতা চলে যাবে, যায় দুই তিন চার বছরেই, তারও আগে। ছোটবেলায় বাবা কয়েকবার নিয়ে গেছে বিড়লা টেকনোলজিকাল মিউজিয়াম, সেখানে রোবট আছে, সেই রোবটের ঢিপি ঢিপি গোল কনভেক্স চোখের কথা মনে আসে শিখা ব্রহ্মের চোখ দেখে। খুব, খুবই রোগা শিখা ব্রহ্ম, দেখতেও ভালো নয় একটু, কোনওদিন সে ছিল, এমনটাও মনে হয় না।

'পদ্মপুকুর স্কুলের অন্য টিচার সে, তার সঙ্গে তো কথা বন্ধ। আরও অনেকেই ওর সঙ্গে কথা বলে না। কোনওদিন দুটো ছেলে কম এল তো একসেস টিফিনটা হামলে পড়ে নিয়ে নেয়।'

নূপুর বলে, গল্প শোনে সবাই। ঘটনাচক্রে ওর ঠিক সামনাসামনি অতসী। তাই সততই ওর চোখ অতসীর দিকে বেশি থাকে, অন্য কোনও কারণ ছিল না।

'বাচ্চাগুলোও হাসাহাসি করে। কটা বিস্কুট গেল তাও গুনে গুনে নেয়। এক্সট্রা হলেই বাড়ি নিয়ে যাবে।'

নূপুর যে অভিযোগগুলো করছে সেগুলো ঠিক কী অর্থে অভিযোগ শর্মিষ্ঠার কাছে স্পষ্ট হয় না। এইগুলো সব টিচারের ক্ষেত্রেই সত্যি। স্বাভাবিকও। এগুলো অভিযোগ হয়ে উঠছে শিখা ব্রহ্মের প্রতি এদের অপছন্দের কারণে। অপছন্দটা কেন? কোন জায়গাটা শিখা ব্রহ্মের অন্যদের থেকে পৃথক? সেক্স নয়, সেটা চেহারার জন্যেই সম্ভব নয়, তাহলে কী? একটা উচ্চারিত স্পষ্টতা : কুঁদুলে এবং মায়াহীন? সে স্পষ্টতাটা এরা অনারীসুলভ বলে মনে করে? বোধহয় তাই, বারবার দেখেছে শর্মিষ্ঠা, মেয়েদের ভিতর একটি মেয়ের প্রতি সমালোচনার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই, মূল এবং প্রায় একমাত্র কারণই থাকে স্পষ্টতা। বাড়িতে দেখেছে, রাজনীতিতে, প্রবল এবং আনইনহিবিটেড জীবনযাপনের হোস্টেল ড্যান্ডাসে, এম জি রোডের পিজি হোস্টেলে, কোথায় নয়? কেন হয় এরকম? অন্য মেয়েরা ডিফারেন্ট নারীটিকে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করে? শ্রমিকরা যেমন, ট্রেড-ইউনিয়ন নেতাকে গাড়ি চড়তে দেখলেই।

'ওর, স্কুলের ছেলেরা বলেছে, রাস্তায় একা পেলে দেখে নেবে।'

সবাই কমবেশি জড়িত থাকে আলোচনায়। মিতা জানায় অন্য দু একজন টিচারের কাছে শুনেছে সে তাদের চাকরির যোগাযোগ সেধেই করে দিয়েছে শিখা ব্রহ্ম। এ এম পি আর-এর সে কোনও কাজ, যে এলাকাতেই হোক, যত রাতই হোক, শিখা ব্রহ্ম রাজি। তবে আগে জেনে নেবে টাকাটা কত। 'টাকার জন্যে ও পারে না এমন কাজ নেই।'

বাঁ পাশ থেকে কেটে যেতে থাকা একটা সাইকেলকে বাঁচাতে শিবকে ব্রেক মারতে হয়, পিছনেই উপস্থিত এ এম পি আর নারীদের উপস্থিতির প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষায় মুখখিস্তি করে শিব। এইসময় মেয়েদের অন্যমনস্ক হয়ে ওঠার কথা : ইগনোর করা, সিসটার মোবিলিয়া যেমন শেখাত, একজন নারীর কখন কী করার কথা, গ্লাসে চুমুক, প্লেটে চামচ, রাস্তার দুর্গন্ধ, সোয়ারিং বা স্ট্রং ওয়ার্ডস, সব পরিস্থিতিতেই ক্রিয়ার একটা নির্দিষ্ট ছক আছে। সিস্টার মোবিলিয়ার ভাইটালিটি তাই বলে কম ছিল না। তাদের রোমান্সের গান শিখিয়েছিল, সিটি সাইটস নিয়ন লাইটস, গ্রে স্কাইজ অর ব্লু/অল থিংজ অফ এভ্রি কাইন্ড রিমাইন্ড মি অফ ইউ। সিস্টার মোবিলিয়াই মরাল সায়েন্সের ক্লাসে সেক্স আনল, প্রথম : কারমেলে বিপ্লব। কিন্তু সেক্স বা রোমান্স বা রাস্তার গার্বেজে প্রতিক্রিয়া, হোয়াট এভার ইট মে বি, তাকে লেডিলাইক হতে হবে। দেবব্রত একটা বই কিনেছিল, সেক্সের, প্যাট্রিশিয়া র‍্যালির, হাউ টু বি ইয়োর সেক্স থেরাপিস্ট বা ওই জাতের কিছু, তাতে ছিল ভিক্টোরিয়ান যুগে টেবিলের পায়েও পাজামা পরানো হত। সিস্টার মোবিলিয়াকে দেখেছে, সেই কালচারটাকে শর্মিষ্ঠা চিনতে পারে। মানবদা যেমন লিখেছিল, ব্রাহ্ম মেয়ে স্নানঘরেও পোশাক খুলতে পারে না : পরমেশ্বর দেখে ফেলবেন।

সুবর্ণা সুবর্ণাই, শিবের মুখখিস্তিতে শিবের দিকে ইঙ্গিত করে চোখ টিপে হাসে। ইনকরিজিবল। সুবর্ণা সিস্টার মোবিলিয়ার কাছে পঁচিশে তিন পেত।

৪।। খেলাটা শুরু করেছিল দেবব্রত। খেলা? খেলা বা ডেটাবেস। ডেটাবেস তৈরি করা। 'হাউ চিলড্রেন লার্ন' আর 'হোয়াই চিলড্রেন ফেইল'—সেই বইদুটো পড়েছিল তারা। তারপরই মাথায় আসে। ছুটি তখন দু-তিন মাস। এখন সেভাবে উল্লেখ করে ছুটির সঙ্গে কথোপথনে, 'সেই

যখন তুই ইংগা আর ইল্লা বলতি। রেগে গেলে ইংগা। আর খুশি হলে ইল্লা।' ছুটিকে কথাটা শোনায় শর্মিষ্ঠা ধস নামার মত মাথায় ভেঙ্গে পড়ে বাৎসল্য। তার ধাক্কায় চোখ কুঁচকে যায় শর্মিষ্ঠার। ঠোঁট বেঁকে যায়। গলার স্বর সরু থেকে আরও সরু। সেই সময়ের ছুটির অবয়বটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে: কোঁচকানো চামড়া যেন বার্ধক্য, দাঁতহীন গোলাপি মাড়ি, কোঁকড়ানো চামড়ায় ময়লা ময়লা ভাঁজ, হাত আর পা উদ্দেশ্যহীন ছোঁড়াছুঁড়ি: এখন এই মুহূর্তে ছুটি কাঁদছে ইংগা, কিম্বা খুশিতে চেঁচাচ্ছে ইল্লা।

খেলাটা আর কিছুই নয়, একটা বড় ফুলস্কেপ কাগজ ভাঁজ করে নেওয়া, উপরে তারিখ লেখা, তারপর ছুটিকে দিয়ে কথা বলানো, পরপর শব্দ, আর লিখে চলা।

আজও তাই করে শর্মিষ্ঠা। দেবব্রত নেই, তার পতাকা দিয়ে গেছে শর্মিষ্ঠাকে। দেবব্রত নেই, একটা বিষণ্ণতা। খেলায় ঢুকে পড়ে শর্মিষ্ঠা, তাড়াতাড়ি।

দাদা

তাতাতাতা

তাতাতা

দাচ্চা

'এরকম কোরোনা ছুটি', গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে শর্মিষ্ঠা। 'এমন কিছু বলো যার মানে আছে। এগুলোর কোনও মানে নেই।'

ছুটি মজা পেয়ে যায়। হেসে তাকিয়ে থাকে আর নানা তালে বলে চলে 'তাতাতাতা—তাতা'।

দেবব্রত শৈশব থেকে ভাষানিয়ন্ত্রণের একটা ডেটাবেস তৈরি করতে চেয়েছিল। কতকিছুই চেয়েছিল দেবব্রত। একটা আদর্শ দাম্পত্য। শর্মিষ্ঠা চায়নি? দেবব্রত কি সত্যিই চেয়েছিল? না কি চেয়েছিল বলে ভাবত? আর শর্মিষ্ঠা? কী কী কাজ তারা করে ফেলেছিল, যা তাদের না করার কথা ছিল?

'ওরকম করে না মা, বলো।;

নাইটির চওড়া ঘেরের নরম ফাঁপানো অংশের ভিতর ঢুকে আসে ছুটি, উরুতে সুড়সুড়ি, শর্মিষ্ঠা বারণ করে।

'একটু ঢুকি মা, মা, ঢুকি?'

'অল্প। বেশি না তো? অল্প একটু।' ছুটি মাথা নেড়ে সায় জানায়। মাথা নাড়ার সময় দু-এক মুহূর্ত অনিশ্চয়তায় ছিল। দেরি করছিল। ওর কি মনে পড়ছিল না। কোনটা হ্যাঁ;-সূচক আর কোনটা 'না'-সূচক মাথানাড়া? নাকি অন্য কোনও বিষয় ছুটিকে অন্যমনস্ক করছিল? কী? বাবা? বাবাকে কতটা মনে পড়ে ছুটির?

দেবব্রত পুরুলিয়া যায় পুরুলিয়া এক্সপ্রেসে। সেলিমপুর থেকে একঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়, আরও ট্যাক্সিতে, ট্যাক্সিতে, ট্যাক্সি নিতেই হয় সঙ্গে এত ভারী ব্যাগ আর এত বই থাকে। তবু, দেবব্রতর যেমন টেনশনের অভ্যাস, দুটোর মধ্যেই বেরোয়। টিকিট কাটার পর সাড়ে তিনটে পৌনে চারটে নাগাদ হাওড়া থেকে একটা ফোন করে। চারটে চল্লিশে ট্রেন। ফোনে প্রতিবারই জিগ্যেস করে দেবব্রত, 'বলো। যাব না যাবনা? তুমি বলো, বিবি, চাকরিটা ছেড়ে দেব? এই শুয়োরের বাচ্চা চাকরি?'

কী বলবে শর্মিষ্ঠা? কী বলার থাকতে পারে তার? বলা বা না-বলার তো সত্যিই কোনও মানে নেই। শুধু শুনতে চাওয়া। দেবব্রত কোন উত্তরটা শুনতে চাইছে সেটা আন্দাজ করার চেষ্টা করে শর্মিষ্ঠা, কোনওবার বলে, 'না গো, চলে যাও, ভেবোই না ওসব, ছেড়ে তো তুমি দেবেই, শিগ্গির, আমি থিসিসটা সাবমিট করে নিই'। কোনওবার, দেবব্রতর মুডটা একটু বেটার মনে হলে ইয়ার্কি মারার রিসক নেয়, 'হ্যাঁ, যেয়োনা, চলে এসো।' ফোন রেখে দেয় দেবব্রত।

যেদিন যায় দেবব্রত সেদিন সন্ধ্যাটা সবকিছুতেই শুধু

জেদ করে ছুটি। ঘ্যানঘ্যান করে। সেই রাতটায়। প্রায় খায়ই না। ঘুমোতে চায় না। ঘুমিয়ে পড়ার পর বারবার কেঁদে কেঁদে জেগে ওঠে।

'এই—এই, পেটাব কিন্তু, কী করছিস ছুটি, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—', ভীষণ কাতুকুতু, প্রায় লাফিয়ে ওঠে শর্মিষ্ঠা। ছুটি মজা পেয়ে গেল। নাইটির ল্যাবিরিন্থ থেকে বেরিয়ে এবার হাতমুখ খিঁচিয়ে ভয় দেখায়।

'ওরে বাবারে, আর ভয় দেখাস না, ভীষণ ভয় পাচ্ছি', বলে ওঠে শর্মিষ্ঠা, ভয়ের বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গী সহ। ছুটি ভয় পাওয়াটা দেখল উল্লাসে। হাসতে থাকে ছুটি। তবে এইবার খেলার শেষ। এবং নতুনবার খেলার শুরু। এই খেলাটা দেবব্রত তার চেয়ে ভালো খলে, দেবব্রতরই তৈরি। আরও অনেক রোমহর্ষক নাটকীয়তায় ভয় পেতে পারে দেবব্রত। পায়ের মোজা ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমায় আটকে ভয় দেখাচ্ছিল ছুটি এবং প্রায় দেড়ঘন্টা যাবৎ প্রতি তিন মিনিটে একবার তুমুল ভয় পেয়ে বিছানা থেকে ছিটকে উঠে চিৎপাত হয়ে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছিল দেবব্রত। শেষে বাধ্য হয়ে শর্মিষ্ঠা ছুটিকে বকে, বলে, 'বারবার ভয় পেতে পেতে ভয় নষ্ট হয়ে গেছে।' ছুটি শেষ অব্দি মেনে নেয়। দেবব্রত বলেছিল, 'ভয় নষ্ট হোক বা না হোক স্পাইনাল কর্ডের সাড়ে সাতখানা কশেরুকা নষ্ট হয়ে গেছে।' শর্মিষ্ঠা বলেছিল, 'কেন ওরকম করছিলে, সব কিছুর একটা সীমা থাকা উচিত।' তার একটু দুশ্চিন্তাও হয়েছিল।

সেই দুশ্চিন্তাটা এই মুহূর্তে নিজের ভিতরে দেখতে পায় শর্মিষ্ঠা। একা লাগে তার। থাক। তবু এই ভালো। দেবব্রত, তোমার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন থাকার চেয়ে তোমার জন্যে দুশ্চিন্তা আর নিঃসঙ্গতা ভালো। তোমার সঙ্গে প্রেম করা যায়, কিন্তু সংসার? এই কথাটা সে একবারও বলতে পারেনি দেবব্রতকে। বলতে চেয়েছিল?

'ভয় দেখানো শেষ হয়েছে তোমার? এবার বলো।'

ছুটি এদিক ওদিক তাকায়। হাসিহাসি মুখ। ক্যালেন্ডার টেলিভিশন আলমারি বই পর্দা জানলা ওষুধ পেনস্ট্যান্ড সব কিছুর উপর দিয়ে ছুটির চোখ ঘোরে, আর প্রত্যেকটাতেই একবার করে শর্মিষ্ঠার টানটান পেন প্রস্তুত হয়, এবার বোধহয় এটাই বলল, এই বলল বুঝি। ছুটি হাসিহাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ব্যাগ

কাঁধের, শরীরের ধাক্কা সহ বলে ওঠে ছুটি, একটু অনিশ্চয়তা ব্যগ্র মুখে তাকিয়ে থাকে শর্মিষ্ঠার দিকে, ঠিক হল কিনা বোঝার চেষ্টা করে মার মুখ দেখে।

ব্যাগ

লালব্যাগ

অনেক চেষ্টায় তবে আলমারির মাথায় পরিদৃশ্যমান লাল ব্যাগের একটা কোণ দেখতে পায় শর্মিষ্ঠা, রাগ হয় তার, এত কিছু থাকতে ওই, ওর থেকে আর কী শব্দেই বা পৌঁছবে? বাবার সঙ্গে এই খেলাটাই অনেক ভালো খেলে বদমাইস মেয়েটা, কত ইন্টারেস্টিং শব্দ বলে, দেবব্রতর লিস্টগুলো পড়তেই মজা লাগে।

মার ব্যাগ

দিদার ব্যাগ

একটু উৎসাহিত হয় শর্মিষ্ঠা। এবার হয়ত মা, দিদার পর ব্যক্তি-সম্পর্কের অ্যাবস্ট্রাকশনে 'মায়ের দিদা'তে পৌঁছবে : 'মায়ের দিদার ব্যাগ'। শর্মিষ্ঠার দিদিমা, ছুটির প্রমাতামহী, মায়ের দিদা বলে ডাকে ছুটি, শর্মিষ্ঠাই শিখিয়েছিল। নিজেকে বেশ ক্রিয়েটিভ লেগেছিল শর্মিষ্ঠার। ডাকটা এমনিতে চারপাশে অনুপস্থিত, কোনোদিন কোথাও শুনেছে বলেও মনে পড়ে না। এই কন্টেক্সটটাই কম তৈরি হয় : প্রমাতামহীর সঙ্গে বসবাস। তারা চার নারী এখন একত্রে রয়েছে। ছুটি, ছুটির মা, ছুটির দিদা, ছুটির মায়ের দিদা। দুই, চৌত্রিশ, ষাট, উনআশি। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মার বড় মেয়ে। ছুটি তো একই সঙ্গে তিন মেয়ে, শর্মিষ্ঠা যেমন বলেছে ছুটিকে, বড় মেয়ে, মেজ মেয়ে আর ছোট মেয়ে : তিনজনে একই মেয়ে। ছুটি 'মেজ' বোঝে না, আর 'ছোট' অপছন্দ করে, যেন তার বড়ত্বকে নাকচ করা হচ্ছে।

ওঘর থেকে আওয়াজ আসছে। একটা উচু স্কেল নিষ্প্রভ কোলাহল। বেড়ে ওঠে, কমে যায়। খেলার কোনো, টেনিস বা ফুটবলের, দর্শকদের সম্মিলিত আওয়াজের ঢেউ এর মত। কে দেখছে ও ঘরে? লাং ক্যান্সার আক্রান্ত এক বৃদ্ধা, স্টেরয়েড লালিত হাঁফানি রুগী এক প্রৌঢ়া? কেউই দেখে না। দেখছে না। টিভিটা চলে : একটা উপস্থিতি, মানুষ নড়ে, ঘরের ভিতর, চৌকো পর্দার পরিসরে, কথা বলে, গান গায়, এ চ্যানেল নয় ও চ্যানেল, ভোর থেকে রাত।

রিসার্চের কোয়েশ্চেনেয়ারের টেবলগুলো, কম দামি ফুলস্কেপ কাগজে, রুব্রিক বলে ডাকতেন অর্জুন সেন, ওখানেই প্রথম শুনল শব্দটা, পরেও আরও দু একবার দেখেছে, কলিন্স কোবিল্ড স্টুডেন্টস ডিকশনারিতে নেই, একদমই ফর্মাল শব্দ, চশমা ঝুলে যাওয়া শিথিল ইন্দ্রিয় বৃদ্ধ পাণ্ডিত্যের রাশভারী সেনিলিটির গন্ধ পায় যেন শব্দটায়, রুব্রিক আর কোয়েশ্চেনেয়ার আর ম্যাথামেটিকাল অ্যাবস্ট্রাক্ট, তার তিন বছরের চার বছরের সোশিওলজিকাল সার্ভের ফসল, সামনে ছড়ানো কাগজের স্তূপ : তার ভালো লাগছে না, তাকাতেও ভালো লাগছে না। তাই ভিতর থেকে সাদা কাগজ টেনে বার করে ছুটির সঙ্গে খেলা। কিন্তু শেষ তো করতেই হবে। যে করেই হোক। শেষ তো করতেই হয়। কত বছর, আর কত বছর ধরে এই ইনফর্মাল সেক্টরের আদ্যশ্রাদ্ধ? ইনকাম ডিটেইলস, অকুপেশন, মাইগ্রেশন প্যাটার্ন, মোবিলিটি : ভার্টিকাল আর হরাইজন্টাল, কনজাম্পশন ডেটা। তারপরও আনস্ট্রাকচার্ড পার্ট অফ দি সার্ভে : কালচার, ক্লাস কনশাসনেস, ম্যান উওম্যান রিলেশন। এইসব সত্য তত্ত্ব ও বাস্তবতা শর্মিষ্ঠা খুঁজতে খুঁজতে অর্জুন সেনও রিটায়ার করে গেলেন সেন্টার থেকে। তাকে গাইড করে চলেছেন, এখনও, না করাতেই পারতেন, বুড়ো হিসেবে বিরক্তিকর হতে পারেন, বদমাইস নন অর্জুন সেন। কোথাও কোথাও হয়ত একটু হাস্যকর।

তখন উনি বেশ কয়েক বছর ধরে ইনফর্মাল সেক্টর রিসার্চে রত, কত ফেলো ওনার টেবিলের তলা দিয়ে, চেয়ারের পাশ দিয়ে চলে গেছে, সেন্টার থেকে শুধু ওনার সুপারভিশনে ইনফর্মাল সেক্টরের প্রোজেক্ট চলছে দুটো, ছ-সাতজন কাজ করছে, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট বেশ কয়েকজন, সেইরকম সময়ে একদিন অর্জুন সেন ওকে বলেছিলেন, রাজাবাজার বস্তির চামড়া কর্মীদের বিষয়ে, 'ওদের একটা রেফারেন্স বেস তুমি পেতে পারো, একটা আলগা ইনিউমারেশন, ওদের র‍্যাশন-কার্ড থেকে।' হাসি পেয়েছিল শর্মিষ্ঠার, হাসি চেপে বলে, 'নেইই তো ওদের রেশন কার্ড, কারোরই, পাবে কোত্থেকে?' রেশন কার্ড না থাকার কথা শুনে কেমন আঁতকে উঠেছিলেন অর্জুন সেন। ওঁর প্রতিক্রিয়া দেখে শর্মিষ্ঠার মনে হয়েছিল, রেশন কার্ড কাকে বলে উনি জানেন তো? দেখেছেন কখনও? জীবনে যে কোনোদিন ওকে রেশন তুলতে হয়নি সে ব্যাপারে শর্মিষ্ঠা নিশ্চিত। হিন্দুস্থান পার্কের বাসিন্দা অর্জুন সেন : জন্ম থেকে বার্ধক্য : শুধু বিষ্ণু দে, যামিনী রায় আর রবীন্দ্রনাথ। এই মাটির পৃথিবীর কোনও কিছু সম্পর্কেই সঠিক ভাবে নিশ্চিত হতে পারেন কি অর্জুন সেন? অথচ তার সুপারভিসনেই রিসার্চ করতে হচ্ছে শর্মিষ্ঠাকে, বস্তি নিয়ে, ইনফর্মাল সেক্টর নিয়ে, প্রাকৃত পৃথিবীর মানুষদের নিয়ে—যারা মাটিটুকুও পায় না। মানবদা না দেবব্রত, কে বলত কথাটা, ইকনমিক্সে পি এইচ ডি রিসার্চ হল সারোগেট মাস্টারবেশন?

অর্জুন সেনকে দেখলে তার মনে পড়ত মানবদার লেখার সেই নিও-ব্রাহ্ম বুদ্ধিজীবী, আনকুথ ইন্টেলেকচুয়ালের কথা, যার চেতনায় শুধু রবীন্দ্রনাথ হাত রাখেন, সন্ধেবেলায় যাদের ঘিরে রাখে স্তব্ধ গম্ভীর অনালোক নিঃসঙ্গতা।

রেশন কার্ড প্রসঙ্গে তার গোপনিত হাসিকে বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন অর্জুন সেন, তাই তার সজ্জিত এলিট এলোমেলো রকমে, কিছুক্ষণ পর, শর্মিষ্ঠা চলে আসার আগে, মন্তব্য করেছিলেন, 'তুমি তুমি তুমি—একটু প্রিপেয়ার্ড হওয়া—আই মিন আই মিন—আমারও তো ভালো লাগত, তোমার সঙ্গে একটু আড্ডা—মানে গাইড করা আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর কী—একটু প্রিপেয়ার্ড হওয়া—ইউ সি—তুমি তুমি—পৃথিবীর নানা জায়গা—কত থিওরেটিকাল ডিভালাপমেন্টস—বুঝতেই পারছ।'

বুঝতে পেরেছিল, পুরো অপমানটাই রেজিস্টার করেছিল শর্মিষ্ঠা। কিছুই তার করার ছিল না। এখনও নেই। এখনও সেই পি এইচ ডি তার সম্পন্ন হল না। কতদিন, আর কতদিন তাকে এটা টেনে চলতে হবে? অর্জুন সেন একটা একটা করে অপমান করত, আর আরও একটু গুটিয়ে যেত শর্মিষ্ঠা। কেন করত অপমান? কিছুতেই কাজটা শর্মিষ্ঠা ছেড়ে দিচ্ছিল না, আবার কিছুতেই ঠিক অর্জুন সেনের দেখানো রকমেও করছিল না, সেইজন্য? সে ততদিনে সি পি আই এম ছেড়ে দিয়েছে, সি পি আই এম আর কী, কলেজে আর ইউনিভার্সিটিতে একটু বেশি সক্রিয় ভাবে এস এফ আই টাই করা, তাও তাকে দেখামাত্রই অর্জুন সেনের মনে পড়ে যেত, সেদিনই সেন্টার আসার পথে এমনকী কোন ট্যাক্সি ড্রাইভারও জ্যোতি বসুকে কী গালাগাল দিয়েছে। বয়স হয়েছে, স্মৃতিভ্রংশ, ঠিক এই একই গল্প, এক বছরেরও বেশি ব্যবধানে অর্জুন সেন তাকে দুবার করেছিলেন। শুধু তাকে না, নমিতাদি, সোশাল চয়েস নিয়ে কাজ করবার দরকারে দু চারবার অর্জুন সেনের কাছে গিয়েছে, তাকেও অনেক খোঁচা দিয়েছেন অর্জুন সেন। নমিতাদির দোষ তার বৃদ্ধ পঙ্গু বাবা কিছুদিন আগে অব্দি হুগলীর সি পি আই এম জেলা কমিটিতে ছিলেন। অথচ সে জানে, খুব ভালো করেই জানে, কীভাবে নিজের মেয়ের পোস্টিং ঠিক বাড়ির সামনের কলেজেই করিয়েছেন অর্জুন সেন। অনাদি চক্রবর্তী, সিনেমার চিত্রনাট্য লেখেন, খুব সরল আর ভালোমানুষ, তার কাছে শুনেছিল, অর্জুন সেন শর্মিষ্ঠার গাইড শুনে শর্মিষ্ঠা দেবব্রতকে গল্প করেছিলেন অনাদি দা, একবার তার এক আত্মীয়র গাড়ি হারানোর ঝামেলা, থানা ডায়েরি নেবে না, কীরকম অর্জুন সেনের একটা মাত্র ফোনেই মিটে গিয়েছিল এবং তাই নিয়ে অর্জুন সেনের আত্মতুষ্টি। এলিটরা সব যোগাযোগই মেইনটেইন করে। তাকে অপমান করত অর্জুন সেন। আর সে একটু একটু করে ভেঙ্গে যেত। দেবব্রতকে কতবার বোঝানোর চেষ্টা করেছে সে, দেবব্রত কিছু বোঝেনি, দেবব্রত কিছু বোঝে না, দেবব্রতরা। আলোচনা উঠলেই দেবব্রত উত্তেজিত হয়ে যেত। বলত, অর্জুন সেনকে ছেড়ে দাও। হয় নিজে করো। নয় না হল পি এইচ ডি। পি এইচ ডি না হলে মানুষ মরে যায় না, এরকম আরও কত কিছু।

এই কথাগুলো তো শর্মিষ্ঠা শুনতে চায়নি? শর্মিষ্ঠা কেন বলত দেবব্রতকে? বলার তো সত্যিই কোনো মানে ছিল না। শুধু একটু আরাম পেতে চাওয়া। শুধু একটু সুদিং কিছু, বলার সময় একটু ঘাড়ে বা পিঠে হাত রাখা, শুধু

এটুকুই চাইত শর্মিষ্ঠা। যে কনফিডেন্সটা সে ল্যাক করছিল, সেই কনফিডেন্সটা, সেই নির্ভরতা, আশ্রয় : দেবব্রত তাকে দিতে পারেনি। শেষ অব্দি দেবব্রতকে আর সে বলত না। বলা ছেড়ে দিয়েছিল। দাম্পত্য থেকে কতটুকু পাওয়া যায়, আর কতটুকু পাওয়া যায় না সেই হিসেব তার মাথায় গজিয়ে উঠছিল।

সে জানত তার কিছু কথা বলার, লেখার, জানানোর আছে, কিছু নিজের কথা, করার আছে কিছু কিছু কাজ, কিন্তু কিছুতেই নিজে নিজে করে উঠতে পারার কনফিডেন্সটা সে পাচ্ছিল না। দেবব্রত এই সময় তার সঙ্গী হয়ে উঠতে পারত, হয়নি। ছেলেরা কি শেষ অব্দি মেয়েদের সঙ্গী হতে পারে?

খাটের কিনার থেকে পা কোমর পিছলে, মুখে 'হুশ' শব্দ, মেঝেতে নামে ছুটি, একটু জোরে। চমকে ওঠে শর্মিষ্ঠা। বুকটা ধড়ফড় করে।

'মারব এক চড়, কতবার বলেছি এরকম ভয় পাওয়াবি না, মা ভীষণ ভয় পায়।'

ছুটি মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকে, মজার মুখ করে। তার নেমে আসার ক্রিয়ার এই বাই প্রোডাক্টটা সে খুবই উপভোগ করে। আবার করবে কিনা, ভাবে হয়ত। তারপর বুক থেকে মাথা ঘাড় সামনে শক্ত ঝুঁকিয়ে, তার নিজস্ব ভঙ্গীতে, থপথপ করে পা ফেলে, ও ঘরের দিকে যায়। ও ঘরে এখন দিদা ও মায়ের দিদার সঙ্গে থাকবে। শর্মিষ্ঠা যখন অফিসে, যখন কাজে বেরোয়, রিসার্চ বা অন্য কিছু, তখন যেমন থাকে।

শর্মিষ্ঠা কাগজগুলোকে, ফাইল, পেন, স্কেল আর ক্যালকুলেটর, গুছিয়ে একটা থাক করে। বালিশের দিকে, একদম পাশ ঘেঁষে সরিয়ে রাখে। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার আচরণমূলক এই ক্রিয়াটা তাকে একটা আরাম দেয়। এই আরামটা যদি সত্যিই ও পেতে পারত? কবে শেষ হবে এই কাজগুলো? বুধবার, শনিবার এই দুদিন শর্মিষ্ঠার ক্লাস নিতে হয় কলেজে, শনিবার নমিতাদির অফ ডে, বুধবার দেখা হলেই এই কথা হয়। নমিতাদি নিজেও খারাপ আছে, খুবই খারাপ, সেই বিষণ্ণতা নিয়েই নমিতাদি তাকে কাজ শেষ করার তাড়া দেয়। বলে, এরপর আর কোনও দিনই শেষ হবে না।

শেষ হবে? কবে শেষ হবে? জানে না শর্মিষ্ঠা।

দেবব্রত বেশ কয়েকবার বলেছিল, হয়ত শর্মিষ্ঠার অসহায়তায় এলোমেলো হয়েই, ছেড়ে দাও রিসার্চ। ছেড়ে দিয়ে শর্মিষ্ঠা কী করত? পুরুলিয়ার ওই বাড়িতে সংসার যাপন? যেখানে আত্মহত প্রেতিনীরা দুপুরে ও রাতে তার সঙ্গে এসে কথা বলে? প্রেতিনীরা, যারা একসময় মানুষ ছিল, মানুষ নয় মানুষী, তারই মত নিঃসঙ্গ, তারই মত সংসাররতা, তারপর একসময় সুইসাইড করে মরে গেছিল। ঘরটা ভাড়া নেওয়ার সময়ই ফারনিসড্ ছিল, একটা বিরাট পিতল বসানো প্রাচীন অলঙ্করণের সিন্দুক যেটা উল্টে টেবিল হিসেবে ব্যবহার করা হত। আর একটা খাট। খাট নয়, পালঙ্ক। পালঙ্ক নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। বিরাট, বিশাল, লোহার তৈরি একটা সাত বাই সাত কাঠামো, তার দুপাশে বেঁকা বেঁকা লোহার রডের কারুকার্যময় ঘেরাটোপ, চারদিকে মশারি টাঙানোর ফ্রেম যার রডগুলোর জন্ম হয়েছে চারটি লৌহকুমীরের মুখে। ওটা কি খাট? সত্যিই খাট? দেবব্রত শুনে এসেছিল, পুরুলিয়া শহরেরই কারো কাছ থেকে, খাটটা নাকি নীলকুঠির, ভদ্রলোক অকশানে কিনেছেন। ভদ্রলোকের প্রথম স্ত্রী সুইসাইড করার আগে ওই খাটেই ঘুমোতেন। কে জানে সত্যি কিনা? পুরুলিয়ার আবহে সবকিছুই সত্যি বলে মনে হত।

পুরুলিয়া শহর থেকে দূরপাল্লার বাসে কলেজ যেতে আসতে দেবব্রতর সময় লাগত তিন তিন ছ ঘণ্টা। ঘণ্টাখানেক কলেজে সই করা, জল খাওয়া এইসব, ক্লাস প্রায় নিতেই হত না, ক্লাস নেওয়ার মত ছেলেই ছিল না, গড়ে এক ইয়ারে দু তিনজন করে।

ছুটির বয়স কেবল একবছর, সারা দিন, সারাটা দিন অপেক্ষা করে চলা সেই প্রাচীন বাড়িতে, যার কোনও জানলা ছিল না সাত ফুট পুরু সুরকির দেওয়ালে, হয়ত গরম আটকাতেই। গরম সত্যিই আটকাত। ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ একটা আরাম ছড়িয়ে থাকত অন্ধকার ঘরে, ঘরের ভিতরে ঘরে, এমনকী পুরুলিয়ার এপ্রিল-মের গরমেও। সারাদিন ঘুমত শর্মিষ্ঠা। সারাদিন ঘুমত ছুটি। শর্মিষ্ঠা প্রায় তেরো পাউন্ড গেইন করেছিল সাড়ে চার মাসে। ওখানে কোনও এক্সারসাইজও করছিল না আর, কেন করবে, পুরুলিয়ার ওই জীবনটাই অন্যরকম। বরঞ্চ সন্ধেয় 'নিস্তারিনী' নামক বাসে, পুরুলিয়ায় বাসেরও নাম হয়, বোধহয় মানুষেরই একটু কম হয়, দেবব্রত ফেরার পর দুজন মিলে, ছুটি থাকত দেবব্রতর কোলে, রাজগড়িয়ার মিষ্টির দোকানে গিয়ে মিল্ককেক আর শোনপাপড়ি, অথবা খোলা উঠোনে—ওপন এয়ার রেস্তোরাঁ—লাউঞ্জ চেয়ারে বসে পাওভাজি আর মশলা মেশানো থামস আপ। অথবা একজন বয়স্ক অমরিশ পুরি মারোয়াড়ির বানানো বাদাম মেশানো লস্যি।

খাচ্ছিল, আর খাচ্ছিল, পুরুলিয়া শহরের পরিপ্রেক্ষিতে আটশো টাকা ভাড়ার পরও দেবব্রতর চার হাজার-চারশো চোদ্দ টাকা কত টাকা বলে মনে হত, আর ঘুমোচ্ছিল। সকালে ছুটির ভোররাতের পেচ্ছাপের পর পুনর্বার ঘুমিয়ে যাওয়াকালীন, আর রাতে ছুটি ঘুমোনোর পর, রাতেরটা প্রাত্যহিক নয়, এই দুবার সেক্স। আর ঘুম। আর খাওয়া। পুরুলিয়ায় থাকাকালীন কত বদলে যেতে হচ্ছিল শর্মিষ্ঠাকে। সালওয়ার কুর্তা নয়, ড্রেস তো নয়ই, পুরুলিয়ার বৌয়েরা, আরও পুরুলিয়ার মাস্টারের বৌয়েরা, আরও পুরুলিয়ার মাস্টারের বৌয়েরা শাড়ি পরে। ঘরে পরা লংস্কার্ট টপ পরে একদিন হঠাৎ ডিম আনতে গেলো, সামনেই দোকানে, লোকটা তার দিকে তাকাতেই পারছিল না।

দেবব্রতর একান্নবর্তী বিরাট বাড়িতে যেটা সবচেয়ে বড় ইস্যু ছিল, অথচ কোনও দিন তারা মেনে নেয়নি, সেই শাঁখা সিঁদুর পুরুলিয়ায় গিয়ে পরত শর্মিষ্ঠা। গড়িয়াহাট মোড়ের সস্তা প্রসাধনের দোকান থেকে কিনে নিয়ে গেছিল। যেন মজা, শাঁখার সেই লুক-অ্যালাইক, পলা, সোনালি দাগ বসানো সাদা আর লাল পলিমার। হয়ত গ্লানিটা কমানোর জন্যেই, দেবব্রত একাধিকবার জানিয়েছে, শাঁখা সিঁদুরটা চমৎকার টার্ন-অন, পরলেই বেশ সেক্সি লাগে। বা হয়ত ওগুলো সত্যিই টার্ন-অন। কিন্তু কার টার্ন-অন? এ নিয়ে দেবব্রতর উপর যে তার রাগ হয় তা নয়, মানুষকে মেনে তো নিতেই হয়, আবার মেনে নিতে হওয়ার গ্লানিটাও থেকেই যায়। বহুবার দেখেছে, দেবব্রতও বলেছে, চিকণের কাজ করা ক্রিমরঙের সিল্কের লোকাট চুড়িদারটাও একটা টার্ন-অন, ওটা পরার রাতে দেবব্রতকে একবারও মনে করিয়ে দিতে হয় না সেক্সের কথা, মনে করিয়ে দিতে হয় না বিফোর জাম্পিং ইনটু সেক্স একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ পার হয়ে এগোও : ফোরপ্লে, সেটা শুরু হয়ে যায় রাস্তায়, গাড়িতে, সিঁড়িতে, যত্রতত্র, খুব বেশি উপস্থিত কারুর তোয়াক্কা না রেখেই। কারুর বাড়ি গেছে তো সেখানেই। শর্মিষ্ঠাও এনজয় করে, নিজেদের এম এসসির সময়কার কথা মনে পড়ে। চুড়িদারটা শর্মিষ্ঠা বড় সাফারিটায় রাখলো, উপর দিকেই, ডেলিবারেটলি? দেবব্রত দেখেছে, নিশ্চয়ই দেখেছে, অজস্রবার। সেটার কথা তো দেবব্রত একবারও তোলেনি।

দেবব্রতই বা কী করবে? ওকেও অসহায় লাগত খুব। দেবব্রত নিজেও বুঝত অহসায়তাটা। ওই কলেজ, পড়ানোর কোনও ছাত্র নেই, নিকটতম বাসস্টপে নেমে সাত কিলোমিটার হাঁটো বা পাহাড়ি ওঠানামা ভেঙে ঠেলতে থাকো তিন টাকায় ভাড়া নেওয়া সাইকেল, ব্রেক নেই প্যাডেল ঘোরে না তাতে কী হয়েছে, ফুসফুস তো রয়েছে দুটো তিনটে চারটে, দুই ইয়ার মিলিয়ে মোট ছাত্র সংখ্যা নয়, আসে ম্যাক্সিমাম সাতজন : এইসব, সমস্ত কিছু দেবব্রতকে মেনে নিতে হয়েছিল। কলেজের প্যানেলে পরের ছেলেমেয়েরা কলকাতার কলেজে পেয়ে গেল, চারটে ইউনিভার্সিটির প্যানেলে নাম থাকা সত্ত্বেও যেতে হল এই পানিশমেন্ট পোস্টিংয়ে, না মেনে নিয়ে কোনও উপায় ছিল না। আরও অনেক কিছুর তখন মুখোমুখি দাঁড়াতে শুরু করেছে দেবব্রত। ওর প্রিয় সেই ফ্রেজ : ভ্যারিয়েশনস অন দি থিম অফ প্যারানইয়া। নিজেকে অত্যন্ত সাধারণ বলে মেনে নিতে কোনও কষ্ট হয়নি শর্মিষ্ঠার, একসময় তো সেও ভাবত বিরাট, বিরাট ফোটোগ্রাফার হওয়ার কথা, সেই প্রথম যৌবনে, কিছুদিন আগে কুন্দেরার আনবিয়ারেবল লাইটনেস অফ বিয়িং-এ মেয়েটির ফোটো তোলার জীবনের কথা পড়তে পড়তে মন খারাপও লেগেছিল। এই কদিন আগে টিভিতে একটা ফিল্ম দেখাল, ভায়োলেটস আর ব্লু। মন খারাপ হয়, তবু সে মানিয়ে নিতে পেরেছিল। অনেক কিছু বলেই নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, আসলে একটা ভালো নিকট আর তার ম্যাচিং লেন্স সেট কিনতে পারল না, ইত্যাদি, বলেই সে ফোটোগ্রাফার হয়ে উঠতে পারল না, যেমন সবাই নিজেকে বোঝায়। আসলে শর্মিষ্ঠার তেমন কোনও অ্যামবিশন ছিল না। দেবব্রতর ছিল। লিখবে, লিখে ফাটিয়ে দেবে। প্রায় মধ্যতিরিশে এসে দেবব্রতকে তখন বুঝতে হচ্ছে চাইলেই সবকিছু পারা যায় না। এই শূন্যতার মুখোমুখি এক একজন এক এক ভাবে দাঁড়ায়, দেবব্রত খুব সহজ অনায়াস পথটাই নিল। মফস্বল শহরে বেশ এক একটা গ্রুপ তৈরি হয় : ভ্যারিয়্যান্টস অন দি থিম অফ প্যারানইয়া। কেউ ব্যাঙ্ক সূত্রে কলকাতা থেকে দূরে, আহাররা ব্রাঞ্চ ইউবিআইয়ের ম্যানেজার অলোক, ওদিকে কলকাতার লিটলম্যাগের সঙ্গে জড়িত।

আরশা-শিরকাবাদের ল্যান্ড রেভিনিউ অফিসার, তাদেরই ইউনিভার্সিটির সহপাঠী প্রদীপ। একসময় হেগেল আলথুসের নিয়ে লিখত। বালিবার তোগলিয়াক্তি মুখে আর গ্রামশি ছাড়া কথা বলত না। এরকমই আরও দুচারজন। কলেজের চাকরির আগে পাক্ষিকের সাংবাদিকতার সময়ই দেবব্রত যেমন উদ্ঘাটনে পৌঁছল, সেরকমই এরা সবাই। এখন শুধু মদ খায়, কাজু দিয়ে মাছভাজা দিয়ে আলুভাজা এমনকী আচার দিয়েও, প্রায়ই ম্যাকডোয়েল বা ডিএসপি, আর মাঝেমাঝে রয়াল চ্যালেঞ্জ বা অ্যানটিকুইটি খাওয়ার মত পয়সা এদের আছে, প্রত্যেকেরই। মদ খাওয়া আর গালাগাল দেওয়া। কলকাতা, কলকাতার অন্তঃসারশূন্য ইন্টেলেকচুয়ালস। কখনও সুনীল গাঙ্গুলি, কখনও অন্য কেউ। মাঝে মধ্যে শর্মিষ্ঠাও বসত ওদের সঙ্গে, বিশেষত জিন থাকলে, ফোরবেসের ড্রাই জিন, হুইস্কি আর ভালো লাগে না। ওদের গালাগাল শুনত মনোযোগের মুখভঙ্গী করে, তার মন খারাপ লাগত এদের অসহায়তার কথা ভেবে, গালাগালের সেই ইমপোটেন্ট হিংস্রতা দেখে। এদের কি এতটা অসহায় হয়ে যাওয়ার কথা ছিল? কবছর আগেও এদের দেখে, প্রদীপ দেবব্রতকে সে নিজেই দেখেছে, তখন দুজনেই রাজনীতি করে, কখনও মনে হয়েছে যে এদের বাঁচতে হবে শুধু ক্ষোভপ্রকাশ করেই? মানুষ বাঁচার একটা রকম খুঁজে নেয়ই।এরাও নিয়েছে। পুরুলিয়ার আঞ্চলিকদের চিন্তার একটা মডেল : পুরুলিয়া

লেলহা ছেল্যা। একটা টেন্যাও জুটেনা, আর পুরুলিয়াকে বঞ্চনা করে কলকাতা বাড়ে। বাঙালদের, নেতাদের, ক্ষমতাবানদের কলকাতা। পুরুলিয়ায় আসার, ঘরভাড়া পাওয়ার সূত্রেই আবার মাথায় এসেছিল ছোটবেলায় শোনা সেই কন্টেক্সটগুলো, বাঙাল-ঘটি, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ। একটা কথা শুনে তার বেশ মজা লেগেছিল, দেবব্রতর কলেজের ক্লার্ক বলেছে, নাকি, এখানের সিপিএমে এখন কায়স্থদের প্রাধান্য, যদিও অনেক নেতাই ব্রাহ্মণ। এই বিষয়গুলো মনে পড়ার ভিতর যে আরকিছু থাকতে পারে, মজা ছাড়া, এখানে এসে সেটা শর্মিষ্ঠাকে বুঝতে হয়েছিল।

পুরুলিয়ার সেই মডেল, কলকাতার প্রতি, কলকাতার দিকে রাগ কী ভীষণ মিশে গেছিল অলোক দেবব্রত প্রদীপের, আরও অনেক পরবাসীর চিন্তায়। অথচ ওরা নিজেদের ভিতর পুরুলিয়ার আঞ্চলিকদের, বিশেষত আঞ্চলিক মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের ডাকে 'নিয়ান্ডারথাল' বলে। এলিট ও শ্রমজীবীদের বাদ দেয়, কেন কে জানে। নামটা, বোধহয়, দেবব্রতরই দেওয়া। পরে পপুলার হয়ে গেছে পরবাসী-মহলে। কোনওদিন হয়ত কলেজ থেকে ফিরে এসে বলল, 'বাসে আজ একটা নিয়ান্ডারথাল আমার গায়ের উপর দিয়ে জানলা দিয়ে পিক ফেলল, কিছু বলতে যাওয়ায় বলল, ইঃ, রাগ তো হবই—কইলক্যাতার বাবু। অথচ আমি কিছুই বলিনি।'

চতুর্পার্শ্বটাকে দেবব্রতর মেনে নিতে হচ্ছিল। মেনে নিতে হচ্ছিল যে বড় লেখক হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। ঢোঁড়াই, অন্তর্জলী, পুতুলনাচ, মাল্যবান বা বিজনের রক্তমাংস সে লিখতে পারবে না। তাই, ভ্যারিয়েশনস অন দি···, দেবব্রতর ভান ক্রমে আরও বাড়ছিল। রোজ। প্রতিদিন। এমন সব বিষয় নিয়ে দেবব্রত কথা বলতে শুরু করেছিল, দেরিদা তেলকেল লাকাঁ লিওতার, যেগুলো দুই মলাটের চেয়ে বেশি খুব কমই ও জানে। লিখতে না-পারাকে বলছিল, 'ফর্ম খুঁজছি, একটা নতুন গদ্য, ডিফারেন্ট গদ্য, পৃথক। আর গালাগাল দিচ্ছিল, আর মদ খাচ্ছিল। বিয়ের আগের, বিয়ের সময়ের মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং নষ্ট হয়ে যেতে থাকে, সেক্সেও দেবব্রত আরও আত্মকেন্দ্রিক, অত্যধিক মদ খেয়ে বিছানায় এসে দু একদিন ইরেকশনের প্রোব্লেমও হয়েছিল।

অসহায়তার এই বলয়, দেবব্রত ঘুরপাক খাচ্ছিল, শর্মিষ্ঠার যে এতে খারাপ লাগে, কষ্ট হয়, দেবব্রত কোনওদিন তা বুঝতে পারেনি। কেন কেন কেন দেবব্রতর মনে হত দেবব্রতর সমস্ত সমস্যা শুধু দেবব্রতরই? কেন এতটা ইগো ওকে বহন করে চলতে হয়, ছেলে বলে? শর্মিষ্ঠা কতবার কিছু বোঝাতে গেছে দেবব্রতকে, ও শুধু উল্টো বুঝেছে। কেন হয় এরকম?

কেন সব গোলমাল হয়ে যায়?

দেবব্রত কেন মনে করে যে মানুষ দেবব্রত নয়, একটা সফল দেবব্রতকে, অর্থসফল বা লেখাসফল বা মাচোসফল দেবব্রতকে তার দরকার? ছেলেরা কেন এত যান্ত্রিক হয়? ভাবতে গেলেই শর্মিষ্ঠার ভয় হয় রাগ হয় চোখ জ্বালা করে নিচের ঠোঁট চলে আসে দুই সারি দাঁতের ভিতরে। নিজের ভাবনার ভিতর 'ছেলে বলে' এই বাক্যাংশটাও আবার অস্বস্তি দেয় শর্মিষ্ঠাকে। সে কি মেয়েদের মত করে ভাবছে? ভাবলে সেটা কি ভুল? 'মেয়েদের মত' ভাবা বলে আলাদা কোনও ভাবা কি হয়? তার ভালো লাগছে না, ভালো লাগছে না, খারাপ লাগছে, একা লাগছে, পুরুলিয়ার লম্বা ধুলো ওড়া পলাশগাছ সাজানোয় উঠে যাওয়া নেমে যাওয়া রাস্তাগুলোর কথা মনে হচ্ছে। সে চলেছে। একটা গাড়িতে। দীর্ঘ দুপুরের পর খোলা বিরাট মহাকাশে লাল ছায়া নামছে। পালিয়ে, পালিয়ে যাবে, কোথাও একটা পালিয়ে যাবে সে। কোথায়? দেবব্রত কাছে? যেতে পারলে ভালো হত, কিন্তু দেবব্রত কিছু বোঝে না। তবু দেবব্রত তাকে ভালোবাসে। নিজের মত করে। জানে শর্মিষ্ঠা। তার ভালো লাগছে না। কিছু ভালো লাগছে না।

কী করবে? একটু গান শুনবে? কার? জোন বেজ? প্রিজন ট্রিলজি? না ইজাজত? সব ভিজওয়া দো/ মেরা ও সামান লটা দো/ বস মেরা এক/ খত মে লিপটি রাত পড়ি হ্যায়/ সব ভিজওয়া দো?

৫।।

শর্মিষ্ঠার ডায়রি থেকে ঃ

'দুই ভাই সঞ্জীব আর সঞ্জয় চ্যাটার্জি। দুজনে দুটো চায়ের দোকানে কাজ করে। বড়জন দোকান থেকে ষাট টাকা পায়। ছোটজনের বয়স ছ বছর। ভাল করে কথা বলতে পারছিল না। যতদূর মনে হয়, বলল, চল্লিশ টাকা পায়। মা লোকের বাড়ি কাজ করে। বাবা নেই। জিগ্যেস করা হয়নি, 'নেই' মানে কী, মরে গেছে, না চলে গেছে। আরও ছোট দুটো ভাইবোন আছে, বাড়িতে থাকে। কতটা ছোট, ছুটির মত?

ছোটটি, সঞ্জয়, ক্লাসে দাদার পাশে বসে ছিল। দাদার বাঁ হাতটা কোলের উপর। ওরও তাই। নকল করছিল কিনা কে জানে? একটু দূরে দূরে দুটো ঘাড়, বেঁকে আছে হুবহু একই ভঙ্গীতে, একটা একটু বড়। এই বয়সের বাচ্চাদের দুটো বছর অনেকটা তফাৎ। তবে বয়সের তুলনায় বুদ্ধি কম। ছোটটাকে দেখে, চেহারায় ও কথায়, শুধু মুখের ক্লান্ত রিংক্লড দারিদ্রটা বা দিয়ে, ছুটির থেকেও ছোট বলে মনে হচ্ছিল।

ছোটটা বসেছে যেমন দাদার পাশে, কথাতেও শুধু দাদাকে রিপিট করছে। দাদা যা বলছে, সেই কথাই আর একবার বলছে, আরও অস্পষ্ট। পেন্সিল আছে কিনা জিগ্যেস করল টিচার। বড়টি, সঞ্জীব, বলল, 'নেই আন্টি'। ছোটটিও বলল, 'নেই আন্টি'। ওর দাদাকে করা প্রশ্ন কি ওকে একটুও করা নয়।

আমার কষ্ট হচ্ছিল।

আমি তো কখনও এরকম মেলো ছিলাম না, কেন এরকম হয়ে পড়ছি আজকাল? ছুটি? আমার গা শিরশির করছিল। গুজফ্লেশ।

ছোটটা আরও গোলগাল। হাবলা-হাবলা দেখতে।

'চায়ের দোকান থেকে কাজ ফেলে ইস্কুলে আসতে দেয়?' আমি জিগ্যেস করলাম। একে আন্টিকে পেরিয়ে বড় আন্টি, অপরিচিত, তার উপর আমার চশমার মোটা কাঁচ, দুজনে প্রায় একই সঙ্গে আমার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

গিয়ে আবার দোকানে সাড়ে সাতটা অব্দি কাজ করতে হয়, এই ইস্কুল থেকে ফিরে, ওরা বলল।

'তোর ভাই কাজ করতে পারে?'

'পারে।'

'কাজ না পারলে বকে?'

'বকে।'

'মারধোর করে?'

'না। কাপ ভাঙ্গলে বকেছে। টাকা কেটে নিল।'

'খেলিস কখন?'

'দুপুরে—'।

'দুপুরে মানে—ইস্কুলে আসার আগে, দোকান থেকে ফিরে? তখন চান করিস না, খাস না?'

সঞ্জীব চুপ করে থাকে। প্রশ্নটা করেই আমার মাথায় এসেছিল, এদের খাওয়ার প্রসঙ্গটা আমার চেনা কন্টেক্সট থেকে আলাদা। এরা খায় তো এখানেই। কিন্তু শুধু ওই একটা পাউরুটি, একটা লাড্ডু, ওটাই তো একমাত্র খাবার হতে পারে না। নিজেকে একটু বোকা লাগে, আমি এখনও খুব ভালো করে এদের জানি না। তাড়াতাড়ি ভাইটিকে প্রশ্ন করি, 'তুই খেলিস কখন? ওই দুপুরেই? কী খেলিস?'

কোনওটা স্পষ্ট, কোনওটা আবছা, ওঠানামাহীন একটা সুরে, ড্রোনিং, কথা বলে বাচ্চাটি। আরও দাদার মডেল সামনে না থাকাতেই হয়তো। যে কথাটা ও বলেছিল সেটা এরকম কিছু, আমি খেলি না, দুপুরে ঘুমোই, বোনের সঙ্গে। এই এখন, লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে, ওর বোন—সে ঠিক কীরকম? যেখানটায় ও ঘুমোয় সেটা ঠিক কীরকম? কতটুকু জায়গার মধ্যে ঘুমোয় ওরা, পাশ ফেরার জায়গা পায়? জানবাজার বস্তিতে সেই চামড়ার শ্রমিকরা, যারা কেউ আমাকে বিবিজি, কেউ বহেনজি বলে ডাকত, বাঙ্ক করা ঝুপড়ি ঘরে থাকত। আট ফুট বাই আট ফুট ঘরে দুপাশে সারিবদ্ধ চারটে চারটে আটটা বাঙ্ক। একটা বাঙ্কে সোজা কেন কাত হয়েও বসা যায় না, শুধু শুয়ে থাকতে হয়। এরা সিজনাল মাইগ্রান্ট। ধান কাটার সময়ে দেশে চলে যায়, ফসল কাটতে। তখন শুতে পারে আকাশ-ঢাকা খাটিয়ায়, কলকাতার এই মাসগুলো এমনকি সুঠাম উপুড় না হতে পারার বিপরীতে, বাঙ্কগুলো দেখে আমি ভাবতাম।

'এখন আমার কোনও অসুখ নেই'-তেই বোধহয়, একটা ভুতুড়ে সিকোয়েন্স লিখেছিল সন্দীপন, মাটির বাড়ির পর মাটির বাড়ি পেরিয়ে একটা খোলা উঠোনে গাছের চাঁদছায়ায় দুটি শরীর, সম্পূর্ণ উলঙ্গ নারী ও নর, পরস্পরকে জড়িয়ে, শ্রমে ক্লান্ত ও গভীর, ঘুমচ্ছে। তাদের বুক অর্থাৎ হৃদপিণ্ড উঠছে নামছে একই তালে।

মিথ। কেন এত মিথ লেখে এরা? হয়তো দেখেছে কোনও এক নীল চাঁদের মুহূর্তে, দেখলেই কি সেটা সত্যি হয়? কোনও সত্যি এত লিরিকাল হয় না।

সত্যি, সত্যি কাকে বলে, সত্যি কী করে জন্মায়, কী করে মারা যায়? কী করেই বা বিক্রি হয় বাজারে, কোন মোড়কে, কত পার্সেন্ট লেভি অকট্রয় সেলস ট্যাক্স সমেত?

জানবাজারের ওই বাংক, রাজাবাজারেও দেখেছি, ভেবেছিলাম ছবি তুলে রাখব। আলোর প্রব্লেম। ফ্ল্যাশে তুললেই ছবি ভীষণ ফ্ল্যাট হয়ে যায়, ছবি বলে আর মনেই হয় না, ডেপথ এত কমে যায়। আরও, একটা বাঙ্কের ছায়া অন্যটাকে মেরে দেবে। চারশো এ এস এ-তে এমনি আলোতেই তুলতে পারতাম, কিন্তু নর্মাল লেন্সে ওই বীভৎসতা আসত কি আদৌ? কারোর একটা আঠাশ ওয়াইড পেলে ওই স্পেসকে আনা যেত। মুসলিম এর কাছে একটা পঞ্চাশ মাউন্ট ভিভিটারের আঠাশ পঁয়ত্রিশ ওয়াইড জুম দেখেছিলাম। দশ এর উপর চেয়েছিল। লেকচারারশিপটা হয়ে গেলে ওটা কিনতে পারতাম। সে তো আর কোনওদিন হবে না। কলেজে পড়ানোর চাকরি পেতে গেলে পড়াশুনো বা রেজাল্ট না, অন্য কিছু, সম্পূর্ণ অন্য কিছু দরকার। তার বদলে এখন এই এনজিও করছি, সমাজ সেবা, জীবে প্রেম। আর কিছু তো পাচ্ছি না, করার।

আজকে তিনটে ইস্কুলে গেছিলাম। তিনটেই ওয়ার্কিং চিলড্রেন স্কুল। শুধু কাজ করে পয়সা পায় এমন ছেলেমেয়েদেরই এই স্কুলে আসার কথা, টিফিন পাওয়ার কথা। কিন্তু সবাই জানে, কমিউনিটি আর এনজিও উভয় দিকেরই কনসেন্টে, এমনি ছেলেমেয়েদের, যারা কোনও ওয়েজ লেবার দেয় না, তাদের ধরে ওয়ার্কিং চিলড্রেন বলে চালানো হয়। নাম্বার অফ চিলড্রেন, কত চাইল্ড লেবার এলিমিনেট করছি, সেই পরিমাণটা বাড়ে। গ্রান্ট বাড়ে। সবকিছুই বাড়ে। সঞ্জীবের সঙ্গে সঞ্জয় যেমন, তার

চেয়ে আরও অনেকটা ছোট বাচ্চারা, সঞ্জয়ের মতো ওয়ার্কিং চাইল্ড না হয়েও, আসে দাদা-দিদিদের সঙ্গে এই দাদা-দিদিরাই দেখে। মা তো কাজে, দেখবে কে? তাই সঙ্গে করে আনে। টিফিন পায়। স্কুলের নাম্বার অফ ওয়ার্কিং চিলড্রেনটাও ইনফ্লেট করে। আর জেনুইন ওয়ার্কিন চিলড্রেনদের স্কুলে ইনভলভড় করা সত্যিই শক্ত। আসতে চায় না, তাদের এমপ্লয়াররাও আসতে দিতে চায় না। ভীষণ টায়ার্ড থাকে। তার চেয়ে এইই ভালো। সত্যিই তো ওয়ার্কিং চিলড্রেন-এর চাইল্ড লেবার এলিমিনেট করে তাদের সোশাল লাইফের মেইনস্ট্রিম-এ ফেরানো হল কিনা তাতে কারুর এসে যায় না। এসে যায় এনজিওর, তার ব্যবসা বাড়লে বা কমলে।

অথচ যে পরিমাণ টাকা পায় এই এনজিওগুলো তাতে অনেক কিছু করা যায়। সেই কাজগুলো হয়ে তাতে কী হয়, সেটা অন্য কথা, কিন্তু কাজ অনেকটাই করা যায়। কত ছেলেমেয়েই আসছে এখন এনজিওতে। তাদের এমপ্লয়মেন্টও হয়, আবার কিছু করাও যায়। কিন্তু হবে না। এই অজিত রায়রা যা পাবে তার পুরোটাই মেরে দেবে। গতকাল ছন্দাদি এসেছিলেন। ওর মেয়ের সামনে হিস্ট্রি অনার্সের পাস ইকনমিক্স পরীক্ষা, একটু দু-একদিন দেখিয়ে দিতে। উনিই বললেন সায়নী ও একটা এনজিওতে চাকরি নিয়েছে। অনাদিদা, অনাদি চক্রবর্তীদের এনজিওতে। এনজিওটার নামটা একটু অন্যরকম, বাংলা নাম, 'প্রাকৃতজন', যতদূর শুনেছি বড় এনজিওগুলোর ভিতর একটু অন্যরকমও, কিছু কাজ অনেস্টলি হয়। সায়নীর সঙ্গে দেখা হলে জানতে পারব। সায়নীর বৌদি ছন্দাদির ব্যাচই কাজ করে, ওর দাদাও লেখক, বেশ বড় লেখক, দেবব্রতর সঙ্গে সম্পর্কও খুব ভালো। ছন্দাদির মুখে সায়নীর নাম শোনা থেকেই আমার টেনশন হচ্ছিল, আমাদের সম্পর্কের কোনও টেনশনের কথা সায়নীর দাদা জানে কিনা, জানলে তার কতটা ছন্দাদি অব্দি এসে পৌঁছেছে। ছন্দাদি মনে করে দেবব্রতর আর আমার দাম্পত্যটা খুব সুন্দর। বাইরে থেকে যা মনে হয়। সেটা ভেঙে যাওয়া নিয়ে আমার এত ভয় হচ্ছিল কেন? আমি কি হিপোক্রিট হয়ে যাচ্ছি?

এবার লেখা থামাই। ছুটি একটু উশখুশ করছে। মাঝরাত্তিরে পেচ্ছাপ করার এই অভ্যাসটা বদলাতে হবে। শোয়ার আগে আর জল খাওয়াব না। সন্ধের থেকে খাওয়াতে হবে। আসলে নিজের বাইরের কাজ থাকলে একটা অসুবিধে তো হয়ই। আমার তবু অসুবিধে একটা, ছুটি। বেশির ভাগ মেয়েরই অসুবিধে তিনটে ফ্রন্টে—বর, বাচ্চা, শ্বশুরবাড়ি।

শেষ লাইনটা লেখার সময় আমার কি একটু মন খারাপ হল?

মেয়েটার মুখ হাসি হাসি—কিছু একটা স্বপ্ন দেখছে।'

৬॥

যে কাজ ভালো লাগে না, ভাবলেই খারাপ লাগে, সেরকম কাজও তো মানুষকে করতেই হয়। করতে যখন হবেই তখন প্রস্তুত হয়ে থাকাই ভালো। এমন নয় যে মাধুরী বিশ্বাসকে ফেস করার জন্য তার একটা গোছানো পরিপাটি জামিতিবিন্যস্ত টেবিল দরকার, তাও মাধুরী বিশ্বাসের প্রসঙ্গে নিজেকে একটু শক্ত করে শর্মিষ্ঠা, আর এই ভাবতে ভাবতেই অ্যাবসেন্টমনতায় টেবিলের উপর জি-ফাইল, অ্যাডমিশন ফর্ম, মেডিক্যাল রিপোর্ট, ওয়ার্ক রিপোর্ট, পুরোনো রিপোর্টের বাঁধানো লগবুকগুলোকে একটা সজ্জায় আনে। পেনটাকে নিয়ে আসে দুই থাক রেজিস্টারের মধ্যবর্তী ফাঁকে। হুড়ছাড়া লম্বা পেনটা, এএমপি আর থেকে দেওয়া, টমেটো সস লাল, গায়ে ময়লা নীল স্টিক, কখনও লেগেছে রিফিল থেকে, পেনটা রাখতে কি আরাম পায় শর্মিষ্ঠা? ওই ফাঁকটাকে কি ও ভেবে নিতে পারে পেনটার জন্যেই সহজাত?

মাধুরী বিশ্বাসের সঙ্গে তাকে খারাপ ভাবে কথা বলতে হবে, এটা ভাবতে ভালো লাগে না তার। কেন? মাধুরী বিশ্বাস তাকে অপছন্দ করবে বলে? নাকি ভালো হিউম্যান বিয়িং হয়ে ওঠার যে বাসনা তার মধ্যে থাকে, সর্বদাই, সেটা লাট খাবে বলে?

তার দায়িত্বের দশটা ইস্কুল তাকে যদি দেখতেই হয়, তাদের রিপোর্ট ইত্যাদি, এই প্রব্লেমের মুখোমুখি তাকে হতেই হবে। এখানে সবাই বলেছিল তাকে, আগে থাকতেই, ফাঁকিবাজ টিচার মানেই মাধুরীদি।

'শর্মিষ্ঠাদি, ওগুলো লিখেছি, কপি করে দিয়েছি।'

'কপি মানে—কার্বন তো?'

'নাঃ, কার্বন পেলাম না—', একটু তাকিয়ে থাকে মিতা, লাজুক হাসে। হাসার সময় কি মুখের কোথাও একটা মাইক্রোক্ষোভ রয়ে যায় মিতার? নাকি পরিচিত পার্সপেক্টিভ থেকে শর্মিষ্ঠা বুঝতে পারে যে না-পাওয়াটা নিছক না-পাওয়া নয়, আরও কিছু। স্টেশনারিগুলো থাকে সুজাতার দায়িত্বে। সুজাতার কাছে, নিশ্চয়ই, চাইতে গেছিল মিতা, তারপর?

'কী হয়েছে? দেয়নি?'

'না, দেবে বলেছিল।'

ভেবে নিতে পারে শর্মিষ্ঠা, মিতা এম-এ পাশ, অপেক্ষা করিয়ে আনন্দ পাচ্ছে সুজাতা। আসলে সুজাতাও তো নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। মিতার অপমানের কষ্টতে খারাপ লাগে শর্মিষ্ঠার।এখানের পুরো পরিবেশটাই এত নোংরা। ছোট ছোট অথরিটি, তাদের প্রতি ছোট ছোট স্তাবকতা, ছোট ছোট উদ্দেশ্য আর ছোট ছোট প্রতিহিংসা। বড় কনসার্নে চুরি থেকে মান্যতা সব কিছুতেই যে নৈর্ব্যক্তিকতা থাকে, সেটা কোনও জায়গাতেই নেই এএমপিআর-এ। লিস্টটা শর্মিষ্ঠাই চেয়েছিল। লিস্টটায় কলকাতার কোন কোন এনজিও কী কী দায়িত্বে ইনভলভড রয়েছে এই ওয়ার্কিং চিলড্রেনের চাইল্ড লেবার এলিমিনেশন প্রোগ্রামে, তার ডিটেইলড বিবরণ। এখুনি যে খুব দরকার শর্মিষ্ঠার তা নয়। আসলে সে এটা কিছুটা নিজের কৌতূহলেই চেয়েছিল, লিস্টের কপিটা। মিতা এতটা খেটেছে, প্রায় অকারণেই, ভাবতে তার খারাপ লাগে।

'পুরোটা লিখে ফেলেছ তো—বাঃ, আমার খুব উপকার হল, তোমার বেশ খাটনি গেল, না?

'আসলে, কার্বনটা দিলে একবারেই হয়ে যেত।'

'তুমিও তেমনি, জোর করে চাইবে তো—জানো তো এখানের সবকিছুই ঢিলে।' সবকিছু ঢিলে বলে ইচ্ছাকৃত হাসির সঙ্গে শর্মিষ্ঠা বুঝতে পারে মিতার খারাপ লাগাটা একটু কমে যায়। তার নিজেরও এতে আরাম হয়।

তারপরই নিজেকে সাবধান করে শর্মিষ্ঠা, সবাই ছুটি নয়, সবার মা হতে চাওয়াটাও কোনও হেল্‌দি প্রবণতা নয়। এবার তার গলাটা অনেক শান্ত, কোল্ড হয়ে যায়, 'তোমার যেটা কাজ—সেটা তো করতেই হবে—তাই না? সুজাতা তো করে দেবে না।' মিতা সায় দিয়ে মাথা নাড়ে, কাজে মুখ নামায়।

মাধুরী বিশ্বাস এলে আজ ঠিক এই কথাটাই বলবে শর্মিষ্ঠা। আপনার যেটা কাজ—সেটা তো আপনাকে করতেই হবে। তাই না? আপনি তো সেটা করেন না ঠিক। দেরি করে আসেন। তাড়াতাড়ি চলে যান। যে কাজটুকু না করলে মাইনে কাটবেই, শুধু সেইটুকুই আপনি করেন। এই বলে শর্মিষ্ঠা শুরু করবে। অর্ধেক কাজ করেন আপনি। পঞ্চাশটা ফর্ম আপনাকে ফিল আপ করে দিতে হবে, সেদিন নিয়ে গেলেন মাত্র দশটা। দশটা করে নেবেন কেন? তার উপর সময় নেবেন এক সপ্তাহ করে। তারপর ফর্ম? ফর্মের প্রশ্ন আমি আপনাকে সব বসে বসে বাংলা করে লিখে দিলাম, তারপরও যেগুলো দিয়ে গেছেন ছাই, তাতে গাদাগাদা ভুল, ভুল ভরতি। পেয়েছেন কী? এরপরও ঠিক জানি পরের দশটা নিয়ে যেতে ভুলে যাবেন। কী বললেন, যাবেন না—ওঃ, আমার কী ভাগ্য। শুধু আপনার অসুবিধের কথা শোনান, পাঁচালি পড়েন, অসুবিধে কার নেই? আমার, আপনার, মিতার, নূপুরের, কার নেই? বলুন। চুপ করে আছেন কেন? কেন? আপনি এরকম ওয়াদিলেস কেন? আপনার শরীর ভালো নেই? কোন, কোনদিন, একটা দিনের কথা বলুন, যেদিন আপনার শরীর ভালো ছিল, যেদিন আপনার শরীর ভালো থাকবে। আমি জানি পারবেন না। আপনি কিছুই পারবেন না। কিচ্ছু না। শুধু শুধু আমায় ঝোলাচ্ছেন কেন? ছেড়ে দিন আপনি। ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিন।

বাক্য, বাক্যর পর বাক্য, প্রাস্ট, গতি, কিক, উত্তেজনা বাড়ছিল মাথায়, ঘাড় সোজা করে শর্মিষ্ঠা। পেট ভরে নিঃশ্বাস নেয়। রিল্যাক্স বেবি, কুল ডাউন। এত উত্তেজনা কেন, এত রাগ, এত ভায়োলেন্স? কেন এত ভায়োলেন্ট সিকোয়েন্স মাথায় বানিয়ে চলা—তুমি কি ভিতরে ভিতরে হিস্টেরিক হয়ে যাচ্ছ? তুমি এভাবে কোনওদিনই, কারও সঙ্গেই কথা বলতে পারবে না। দেবব্রত পারত। সার্ভিস কমিশনের সেক্রেটারিকে বলেছিল, আপনি এরকম ভিতু কেন যে শুধুই মিথ্যে কথা বলেন?

আর কেনই বা বলবে? সার্ভিস কমিশনের গাঙ্গুলি নহাজার টাকা মাইনে পেত, সবসময়ই শোনাত সেটা। মাধুরী বিশ্বাসী কী পায়? দুশো টাকা। একটা মেয়ে আছে। এবার মাধ্যমিক দিয়েছে। সংসারের ব্যস্ততার পর একটা মানুষ দুশো টাকার জন্য কী করতে পারে? বলা যায়, তাহলে কোরো না। না করেই বা কী করবে? দুশো টাকাও একটা টাকা, কেউ সেধে দেয় না। আর নিতান্ত বাধ্য না হলে কেউ এএমপিআর-এর এই চাকরি করতে আসে না।

মাধুরী বিশ্বাসকে সে এসব বললে সে যে চুপ করে শুনবে, তাও না। খুব ঝগড়াটে, এটাও শুনেছে শর্মিষ্ঠা। ফাঁকিবাজ আর ঝগড়াটে টিচারের উদাহরণ মাধুরী—এটা নাকি অজিত রায়ও জানেন —অতসী বলেছিল।

সেজন্যেই কি একটা ফেলোফিলিং, মাধুরী বিশ্বাসের প্রতি, শর্মিষ্ঠা বোধ না করে পারে না?

রাজীব ঢোকে। এদিকে, শর্মিষ্ঠার ডানদিকে, তাকায়। জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় শর্মিষ্ঠার দিকে। 'লোক এত কম?'

'কাজে গেছে।; বলে শর্মিষ্ঠা।

'এদিকে চা নিয়ে এলাম। শর্মিষ্ঠা এতক্ষণে লক্ষ করে ওর ঝোলানো ডানহাতে চায়ের পাত্র। ঢুকেই বাঁ হাত দরজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকায় নজরে পড়েনি।

'চা', বলে মিতা, সমস্ত ভালো লাগাটা গলার স্বরে প্রকাশ পায়। তার রেসপন্সে রাজীবও তাকায়। এক্সপেক্টেড অনেক জনের জায়গায় মাত্র দুজনকে চা খাওয়াতে হওয়ার বিষণ্ণতা একটু কমে কি এতে? একটা দুশ্চিন্তাও, নিশ্চয়ই, কাজ করে রাজীবের মাথায়, এক্সট্রা চাগুলো নিয়ে কী করবে? মুখে বলে, অফিসের কাজ হিসেবেই আনে, কিন্তু শর্মিষ্ঠার ধারণা কাপপ্রতি পাঁচ বা দশ পয়সা করে রাখে রাজীব। দুতিনটে চা নষ্ট হওয়া মানে হয়তো দশদিনের লাভ একবারে নষ্ট হয়ে যাওয়া।

কেটলিটা মিতার টেবিলে রাখে রাজীব। মিতা আর শর্মিষ্ঠার টেবিল থেকে গ্লাসদুটো নিয়ে ভিতরের জলটা ঝাঁকিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে, সিমেন্টের চাতাল এখনই শুষে নেবে। না নিলেই বা কী? গ্লাসের কাঁচের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা জল লেগে থাকে, তার

ভিতরেই চা ঢালে রাজীব, আজ কি চায়ের পরিমাণটা একটু বেশি? প্রথম দেয় শর্মিষ্ঠাকে। সেটাই দস্তুর। চায়ের প্রসঙ্গে এইমাত্র মনে পড়ে শর্মিষ্ঠার। 'ওকে দাও', বলতে বলতে শর্মিষ্ঠা গ্লাস তুলে চুমুক দেয়। পার্ফেক্ট পায়েস চা, তাদের ক্লাসের অর্পিতা যেমন বলত, এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আছে। এখনও শোনে হার্ডরেইনস—ওর প্রিয় গান? শর্মিষ্ঠা তো ঠিক করে নিয়েছিল, ব্যাঙ্ক বা বিসিএস কোনওদিন দেবে না, আমলা হবে না কলেজে পড়াবে, সেটা কি ভুল করেছিল?

চা-টায় দুধ বেশি, চিনি বেশি, সরের টুকরো, এলাচ লবঙ্গ টের পাচ্ছে, হয়তো জিরে আর পেঁয়াজ রসুন বাদে সব মশলাই দিয়েছে একটু একটু। 'চা-টা ওই শিখের দোকান থেকে এনেছ, না?'

'হ্যাঁ, এপারের দোকানটা বন্ধ, ভালো চা।' তাকিয়ে থাকে রাজীব।

সায়-বাচক মাথা নাড়ায় শর্মিষ্ঠা, উপর নিচে।

মিতা হাসিমুখে বলে, 'অবাঙালি চা মানেই এইরকম। চা সংক্রান্ত মজার জাড্যেই হয়তো, রাজীব চেয়ার টানে একটা, মিতার টেবিলের পাশ থেকে শর্মিষ্ঠার সামনের চেয়ারটাই কাছে হওয়া সত্ত্বেও। চেয়ারে পাশ করে বসে রাজীব, কাঁধটা চেয়ারের পিঠে।

'আজ একটু ফাঁকা ফাঁকা', বলে রাজীব। 'সবাই ঘরে না থাকলে মেজাজ আসে না।'

'মেজাজ আসে না, চা বিক্রি হয় না', শর্মিষ্ঠা বলে।

'ফাঁকা কী, কম্পিউটার ঘরে আছে, বাঁশরীদি এসেছে।' মিতা বলে।

'ও, তাই বলি, অনেককেই যেন দেখলাম এদিক ওদিক। নইলে কি আর আনতাম—', চায়ের কেটলিটার দিকে দেখায় রাজীব, শর্মিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে হাসে। শর্মিষ্ঠার পিছনে লাগাটা তাহলে ওর খারাপ লাগেনি।

'বাঁশরী সান্যাল এসেছেন আজ?' একটু অবাক, কেন অবাক তা সে নিজেই জানে না, শর্মিষ্ঠা জিগেস করে। 'সকাল থেকেই আছে।' মিতা বলেছিল। শর্মিষ্ঠা সোজা এখানে চলে এসেছে, রাস্তার এপারের বাড়ির ভাড়া নেওয়া গ্রাউন্ড ফ্লোরের ঘরে, মেইন বিল্ডিং-এ ঢোকেনি, জানতেই পারেনি। 'সামনে অডিট আসছে।' অডিটের কথাটা শর্মিষ্ঠারও কানে এসেছে। এখানের ব্যবসায় অডিটটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবেই, কত ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে অ্যাকাউন্ট বানানো হয়। সমস্ত ক্লারিকাল ডিটেইলস, খুঁটিনাটি কী পরিশ্রমে মেটানো হয়। আসল কাজটা যাই হোক, যে কাজের জন্য, যার নাম করে এএমপিআর, এখানে বসে মনেই পড়ে না।

'দু নম্বর তাহলে আজ কী করছে ওপরে?'

সুজাতা-বাঁশরী উপাখ্যানের চেনা কন্টেক্সট রাজীবের মুখে, 'ঘর থেকে তো বার করে দেয়, জাননে তো?' রাজীবের চোখ শর্মিষ্ঠা থেকে মিতার দিকে যায়। 'উপরের ঘরের থেকে একদিন দুনম্বরকে বার করে দিয়েছিল, আপনারা তখনও আসেননি। যাও, বেরিয়ে যাও। তারপর ইংরিজিতে, হেভি ইংরিজি বলে তো।'

'কে, স্যার?' মিতা জিগেস করে। দু-একটা কালচে বাদামি ব্রণ, তার ছেলেমানুষ মুখে পুরোটা শোনার কৌতূহল।

'না, স্যার না, একনম্বর, বাঁশরী দি। একদম দেখতে পারে না তো দুনম্বরকে।'

এখানে সবাই জানে বাঁশরী সান্যাল অপছন্দ করে সুজাতাকে। গল্প, কেচ্ছা, সবাই উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করে, যৌন রেষারেষি। বিষয়টা আদৌ যৌনতা না এএমপিআর আর তার সম্পদ, সম্পত্তি ও ক্ষমতার উপর অধিকার : প্রায়ই ভাবে শর্মিষ্ঠা। হয়ত দুটোই। একটা অশ্লীল হাসাহাসি অনুক্ষণই চলে এএমপিআর-এ। একটা কমিউনিটিতে একটা এনজিওর সঙ্গে আর একটা এনজিওর সে রেষারেষি চলে, রিলিফ নিয়ে, খাবার নিয়ে, টাকা নিয়ে, বাচ্চা নিয়ে : কমিউনিটির উপর কন্ট্রোল কার হবে, ফান্ডিং অথরিটিদের সামনে কে বেশি বাচ্চা শো করতে পারবে, ঠিক সেইরকম। বাঁশরী সান্যাল বা সুজাতাকে দেখলে লোকের মাথায় বোধহয় ওই একটা প্রসঙ্গই কাজ করে 'স্যার' অজিত রায়ের একনম্বর ভার্সেস দু নম্বর।

তাও, এসবের পরও, বাঁশরী সান্যালের প্রতি একটা ভালো-লাগা শর্মিষ্ঠার থেকেই যায়। কেন—ওর চেহারার জন্যে? লম্বা, ফর্সা, মৃদু মেদবহুলতা, যৌনতৃপ্তির হালকা মেদ, দক্ষিণ ভারতীয়দের যেমন, ভানুপ্রিয়া বা সুভাষিণীর, চুলের ধারের দিকে দু একটা স্ট্র্যান্ড পাকা, এমন হতেই পারে যে ওই কটাকে বাদ দিয়ে অন্যটুকু ডাই করা, তবে ডাই করলেই কমবেশি ডিসকালার্ড হয়ে যাওয়ার কথা, পুরো চুলটা পিছনে টেনে বাঁধা সব সময়ই, এই বয়সেও, অন্তত পঁয়তাল্লিশ, অসম্ভব আকর্ষণীয় শরীর। পিঠের, শোল্ডার ব্লেডের চমৎকার গড়ন হাইলাইট করার জন্য লম্বা হাতা লম্বা পিঠ অথচ পিছনে লোকাট ব্লাউজ। বাঁশরী সান্যালকে ডায়রিতে কখনও শর্মিষ্ঠা 'স্যারের এক নম্বর' বলে উল্লেখ করতে পারল না, এমনকী বাঁশরী সান্যাল বলে লিখতেও বোধহয় তার ভালো লাগে না। বাঁশরী দি বলে ডাকতেই, কিছু বলেই তো সামনা সামনি ডাকে না, বোধহয় ভালো লাগত শর্মিষ্ঠার। কেন? শুধু চেহারা আর মুখে এবং জেশ্চারে এলিট রকম, না কোথাও নিজেরই কমিউনিটির, অ্যাকাডেমিক কমিউনিটির বলে মনে হয়, তাই? বাঁশরী সান্যালের কোনও ফর্মাল স্কুলিং নেই, সেটা শুনে ভালো লেগেছিল তার, বাঁশরী সান্যালকে আরও ডিফারেন্ট, আরও রহস্যময় লেগেছিল, ডায়রিতে লিখে রেখেছিল। মর্ডান গার্লসে একবার ভর্তি হয়েছিল, দু চার মাসের মধ্যেই অ্যাপেন্ডিসাইটিস, ইস্কুলের ইতি। বাড়িতে টিচারের কাছে পড়ে প্রাইভেটে পাশ করে কলেজ। তারপর ইউনিভার্সিটি। বাহান্তরে এম এ, তিহাত্তরে চাকরি, পিএইচডি নেই বলে রিডার লিখতে পারে না, মাইনে রিডারেরই। এখন সাউথসিটির পল সায়েন্সের হেড ডিপ। এসব গল্প তাকে বাঁশরী সান্যালই করেছে, নিজেই, শর্মিষ্ঠার টেবিলে বসতে বোধহয় ওর ভালোই লাগে। কেন, ওই একই কারণ? শর্মিষ্ঠার হাইট পাঁচ চার, বাঁশরীদির চেয়ে কম, রং খারাপ আর তার চেয়েও বড় কথা এই গ্র্যাঞ্জার তার ভিতর আদৌ নেই, জানে শর্মিষ্ঠা। তাহলে, কমিউনিটি ফিলিং? নিজের চতুর্পার্শ্বকে কি বাঁশরী সান্যালেরও প্রায়ই অসহ্য বোধ হল, সব কাজের ভিতরই শুধু একা হতেছে আলাদা? এরকম ভাবতে শর্মিষ্ঠার ভালো লাগছে, বাঁশরীদিরও একটা নিঃসঙ্গতা আছে, একটা আন্ডারগ্রাউন্ড, এরকম ভাবতে তার ইচ্ছে করে। সে লেসবিয়ান হয়ে যাচ্ছে না তো, ভেবে মজা পায় শর্মিষ্ঠা, এই প্রসঙ্গটা দেবব্রত শুনলে, নিশ্চয়ই, এই মন্তব্যই করত। এটা কি একধরনের ইনফ্যাচুয়েশন—ভাবতে তার খারাপও লাগে। বাঁশরী সান্যালের এই এএমপিআর অস্তিত্বের ভিতরই একটা ভালগারিটি : বাঁশরী সান্যাল আর সুজাতা এক নয়। বজবজের রিফিউজি কলোনি থেকে শহরতলি হয়ে ওঠা এলাকার নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে থেকে নিম্নবিত্ত পরিবারের বৌ সুজাতা। তার সেক্সুয়ালিটি বেঁচে থাকার, টিকে থাকার সেক্সুয়ালিটি, ওডেসা ফাইলের যুবতী প্রেমিকা যেমন নাইটক্লাবে শুয়ে এবং শরীর দেখিয়ে টাকা এনে তার প্রেমিককে ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট থাকতে দিয়েছিল। যেমন শুনেছে, সত্যি কিনা জানে না, ল্যাটিন আমেরিকার লড়াইয়ের ছবি বানানোর টাকা তোলে কোস্টা গাভরাস হামবুর্গে গিয়ে ব্লু ফিল্ম তুলে। বাঁশরী সান্যাল তা নয়। শুধু ব্যবহৃত নয়, ব্যবহারকারীও। বাঁশরী সান্যালের সামাজিক পজিশন একটা পাওয়ার পজিশন। বাঁশরী সান্যালকে কেউ এরকম এএমপিআর করতে বাধ্য করেনি। অন্যরকম আর একটা এএমপিআর করার চেষ্টা বাঁশরী সান্যাল করতেই পারত। তার, শর্মিষ্ঠার, সায়নীর, মিতার, এইরকম আরও অনেকের কাজ করার একটা জায়গা হত।

মিতা আর রাজীব কথা বলছে। একটু নিচু গলা। রাজীবই কথা বলছে। মিতা শুধু মাঝেমধ্যে দু একটা প্রশ্ন করে। ছেলেমানুষ কৌতূহল। আর কীই বা করবে?

এএমপিআর-এর কাজের সবচেয়ে কম নির্বোধ আর কম বোরিং অংশ এটাই বাঁশরী সান্যাল-সুজাতার কেচ্ছা। হঠাৎ বুকের ভিতর একটু ফাঁকা লাগে শর্মিষ্ঠার। দম নেওয়ায় একটা বাধা। কাগজ থেকে চোখ উঠে যায় দরজার তেরছা ফাঁক দিয়ে বাইরের মেখলা তবু উজ্জ্বলতর জুলাই পৃথিবীর দিকে। কী করছে সে? কেন? না করেই বা কী করত? মা কখনও কিছু বলে না, বরং উল্টোটাই দেখানোর চেষ্টা করে। কিন্তু, বোঝাই যায়, টাকার টান আছেই। বাবা সঞ্চয়ী ছিলেন না কোনওদিনই, তবু শেষজীবনে হর্ষদ মেহতা জোয়ারে কিছু ইউনিট ট্রাস্ট, ম্যাগনাম বা শেয়ার। আর রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট। সে আর কত? মার উইডো পেনশন, ইনলেট এই একটাই। আর সবই আউটলেট। মার সঙ্গে তার কমিউনিকেশনও বেশ কম, চিরকালই। বাবার ডারলিং ছিল বলেই হয়ত মার ডারলিং সে কোনওদিনই হয়ে উঠতে পারেনি, শুভর মত। এলাহাবাদ প্রবাসী স্টুডিয়াস ভালো স্টুডেন্ট বিদেশে পড়াশুনো করে এসে সায়ান্টিস্ট অ্যাকাডেমিশিয়ান বুরোক্র্যাট বাবা নিজের পরিবারে ছিল আন্ডারডগ। সেটাকে মা-র খুব একটা অন্যায় বলেও মনে করতে পারে না শর্মিষ্ঠা। বাবা লিনিয়ার, ওভার সিমপল, জীবনের সব মডেলেই। মা ছিল ব্রেবোর্নের ছাত্রী, উজ্জ্বল ছাত্রী, ভোরেশাস এবং নিবিড় রিডার, নিজের একটা পরিস্কার ইন্টেলেকচুয়াল অস্তিত্ব ছিল মার, রিফাইন্ড, আরবান, কলকাতার বিভিন্ন সাংস্কৃতিকতায় আপডেটেড। সেইসব কিছু ছেড়ে, বিয়ের পর, বিহার আর উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন রিসার্চ সেন্টারে, সেখানে অন্য বৌয়েরা অফিসে বেরোনোর আগে স্বামীর পা টিপে দেওয়াটা দাম্পত্য অধিকার বলে মনে করত।মা ক্রমে রুড, ওভার পজেসিভ, ভেইন এবং কিছুটা প্রিটেনশাস। না হয়ে কোনও উপায় ছিল না মার, মার অ্যাসপিরেশনস-এর কোনও আউটলেট পায়নি। আর চারপাশের অন্যদের থেকে মা সত্যিই এতটাই বেশি স্মার্ট ছিল, স্বামীর চেয়ে তো বটেই যে শাসনটাই মার অভ্যস্ততা হয়ে দাঁড়ায়। শুভ ছোটবেলা থেকেই সে অর্থে প্র্যাকটিকাল। মার সামনে কখনও কোনও বিরুদ্ধতা করেনি, নিজের কথা কখনও ঘোষণা করত না, সিনেমায়ও যেত বাড়িতে না বলে, সেটা কখনওই করতে পারেনি শর্মিষ্ঠা, অপমান বোধ হত, গোপন করব কেন, আবার অশান্তিও ভাল লাগত না। তাই নিজের ভিতর, আর নিজের চারপাশে বইয়ের ভিতর ঢুকে গেছিল। বাবার শর্মিষ্ঠার প্রতি অ্যাটাচমেন্ট নিয়েও টেনশন ছিল মা-র। প্রথম স্কলারশিপের টাকায় স্টেটসম্যানের উল্টোদিকের দোকান থেকে বাবার জন্য সে কোটপিসটা কিনেছিল শর্মিষ্ঠা, সেটা দিয়ে কোনওদিনই মা কোট বানাতে দেয়নি। এরকম আরও কত কিছু। শুভ, যদিও অনেকটাই প্রিটেনশাস, ইন্টেলেকশনের স্তরে কখনওই মার কোনও কমপিটিটর ছিল না, মার হেজিমনি কখনও কোয়েশ্চেনড হয়নি। মার খুব প্রিয় ছিল ছোট মেয়ে শুভ, যাকে মা পুতুল কিনে দেয়, সাজায়, একরকমের পুতুল খেলা? সেই দূরত্বটা, মা আর শর্মিষ্ঠা দুজনেই ক্যারি করে, এখনও। ইস্কুলে কী নিয়ে যাবে, জন্মদিনের দিন, শুভর

জন্মদিনের আগের দিন সন্ধ্যায় কাস্টার্ড বানাত মা, ফ্রিজে ভরে রাখত। আর বিনি, ওর তো অত কিছু শখ নেই কোনওটাতেই, এক ওই বই ছাড়া,মা তার হাতে কয়েকটা রঙিন ছাপানো কাগজ দিয়ে দিত, চকোলেট কিনে নিও যাওয়ার পথে। টাকাটা হাতে নিয়ে শর্মিষ্ঠা তাকিয়ে থাকত ড্রয়িংরুমে রবীন্দ্রনাথের বড় ছবিটার দিকে। মাকে, সবাইকেই কত দূর বলে মনে হত। সেই দূরত্বটা মা আর শর্মিষ্ঠা দুজনেই ক্যারি করে, এখনও। শুভ করে না। ওর প্রেগনান্সি কনফার্ম করল ডাক্তার, ফিরে এসেই মাকে ফোন করল শুভ। প্রেগনান্সির শেষ দিকে হয়ত এসে থাকবে এখানে। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই। দেরি আছে। এখন মোটে ছয় সপ্তাহ। ওই দিকে, শুভর শ্বশুরবাড়িতে, সমরদের বাড়িতে এইসব নিয়ে অশান্তি চলছে কোনও, মা কখনও তার সঙ্গে আলোচনা করে না, শুভর কোনও খারাপ কিছু। সমররা বিরাট বড়লোক, উত্তর কলকাতায় তিনটেবাড়ি ছাড়াও দুটো মালটিস্টোরিড ফ্ল্যাটবাড়ি, উল্টোডাঙ্গায় আর বেহালায়। তাও একটাই থ্রিরুমড ফ্ল্যাটে থাকে সমর, শুভ সমরের বাবা মা, সমরের ভাই, তার বউ, তিনজন দাস এবং দুজন দাসী। অন্য সব বাড়িগুলো থেকে আয় হয়। সমরদের এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসা, প্রতিদিনই বাড়ছে, সমর পাবলিক রিলেশন খুব ভালো বোঝে, কারও সঙ্গে ওর কোনও মতদ্বৈধ হয় না। বাবা মাকে আপনি বলে, রোজ সকালে প্রণাম করে। শুভও করে। এইরকম ভাবে তো শুভ বড় হয়নি। বরং শুভই ছিল আগুন খেকো, রেজিস্ট্রি ছাড়া বিয়ে করবে না, শাঁখা সিঁদুর তো নয়ই, মেয়েরা কেন ছেলেদের বাড়িতে গিয়ে থাকবে, ইত্যাদি। এখন বেনারসী বালুচরী প্রতিমাসে একটা, কেনিয়ান আইভরির টেবল টপ, তা সত্বেও শুভ ভালো নেই, সমর ওকে সময় দেয় সপ্তাহে খুব বেশি হলে সাতঘন্টা, প্রতি রাতে বাড়ি ফেরে পাবলিক রিলেশনের স্কচে কাতর, নিজেরও কোনও জীবন নেই শুভর, শ্বশুর শাশুড়ি ভাবতেই পারে না বড় বৌ বাড়ি থাকবে না, চাকরবাকরদের সামলাবে কে, শুভর জন্য কষ্ট হয় শর্মিষ্ঠার, কিন্তু মার সঙ্গে কখনও কোনও কথাই বলে না শর্মিষ্ঠা, তার সম্পূর্ণ অন্য মানে দাঁড়াবে।

বাচ্চা হবে শুভর, এসে থাকবে, আরও একটা খরচ, সে কতটুকু আর দিতে পারছে—খারাপ লাগে শর্মিষ্ঠার। একটু অসহায় লাগে।এতটা খারাপ অবস্থা হত না টাকাকড়ির, মোটামুটি ভালোভাবেই চলে যেত মার বেঁচে থাকার বছরগুলো। কিন্তু বাবার চিকিৎসার ওই বিপুল খরচ। মারা যাওয়ার আগের দু তিনবছরে বাবার হাঁফানি দীর্ণ শরীরে বারবার ইনফেকশন হচ্ছিল। হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসার পরপরই সেবার হেপাটাইটিস বি হল, অথচ প্রতিষ্টা ট্র্যানসফিউশন সেট, ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ শর্মিষ্ঠা নিজে হাতে কিনে দিয়ে এসেছিল, রাত সাড়ে বারোটার অন্ধকার হরিশ মুখার্জি রোডে টেনে রাখা কোলাপসিবলের উল্টোদিকে দোকানের ভিতরকার একটা অস্পষ্ট মানুষের কাছ থেকে কিনে এনে। সবকটাই ডিসপোজেবল। তাও বাবার হেপাটাইটিস বি হল। কেন হল? কার কাছে সে অভিযোগ করবে? করেই বা কী হবে?

ওই শরীরে হেপাটাইটিস বি-র ধাক্কা বাবা আর সামলাতে পারল না, ধীরে ধীরে মৃত্যু ঢুকে আসছে, ঘরে মৃত্যুর গন্ধ, ঘরে পার্মানেন্টলি রাখা লম্বা লাল মারণাস্ত্রের মত অক্সিজেন সিলিন্ডার, আর জানলা থেকে জানলায় নাইলন দড়িতে সমরের টানিয়ে দেওয়া ড্রিপসেটের ছায়া ক্রমে লম্বা হয়, প্রতিটিবার ফুসফুস ফেটে যাচ্ছিল নিশ্বাসে। রাইবাভাইরিন, প্রচণ্ড দামী ওষুধ, ইমপোর্টেড, হেপাটাইটিস বির জন্য, আর এসেনশিয়েল, পাতার পর পাতা, দামগুলো শুনলেই ওষুধের নয়। জামাকাপড়ের বলে মনে হয়, ওতেই কয়েকহাজার গেছিল একমাসে, একদিন হিসেব করেছিল শর্মিষ্ঠা। আর দুর্বল শরীরে প্রতিবোধহীনতায় ফুসফুসে গজিয়ে ওঠা প্যাচটাও কিছুতেই যাচ্ছিল না, কোর্সের পর কোর্স অ্যান্টিবায়োটিক ক্রমে আরও দামী, আরও আধুনিক, আরও বিশেষ, হেপাটোপ্রোটেক্টিভ অ্যান্টিবায়োটিক। বাবা সারা জীবনে যতটাকার খাবার খেয়েছে, তার চেয়ে কি কম হবে মোট ওষুধের দাম, যা দুতিনবছরে বাবাকে খেতে হল? বাবার ওজনের চেয়ে অবশ্যই বেশি হবে, ওজন বলতে তো আর কিছুই ছিল না, একটা হাড়ের কাঠামো ঘিরে কিছুটা জীর্ণ, ক্ষয়গ্রস্থ, স্মৃতিশরীর।

শেষদিন ওই শরীরের উপর, বাবার সম্মুখস্থ বাতাস তখন টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে গেছে, এক একবার এক একটা টুকরো গিলে নেওয়ার অক্ষম চেষ্টা করছে বাবার মুখের কঙ্কাল, গলায় তখন ঘরঘর, ডাক্তারবাবু বলেছিলেন ডেথ্‌র‍্যাটল, সব কিছুরই একটা নাম শব্দ ও উচ্চারণ থাকে। মিউকাস জড়িয়ে জড়িয়ে ফেলছিল ফুসফুস গলা শ্বাসনালী, মৃত্যুকে মসৃণ করতে চাইছিল?

ডাক্তারবাবু কঙ্কালের পাঁজরে হাত দিলেন, দুপাশ থেকে চাপ, উপরে নিচে সামনে পিছনে, খরভর্তি আত্মীয়দের উদগ্র ব্যগ্র মুখ, এত নিকটে এত পাগ্রসর মৃত্যু, লাইভ শো অফ ডেথ, ডাক্তারবাবু কঙ্কালটাকে নাড়ছেন, চাড়ছেন, ঘষছেন, উল্টে ফেলেছেন, আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেশন। গলগল করে, শব্দটা কি সত্যিই ছিল, বাবার গলা থেকে দাঁত থেকে রক্ত বেরিয়ে এল। না-কাটা দাড়ির সাদাকালো সমাবেশ রক্তে লাল। তার ভিতরেই খাবলে খাবলে শ্বাস নিতে চাওয়া, লাঙের দেওয়াল পাতলা আর জীর্ণ হয়ে এসেছিল, রক্ত আর রক্ত, শবযাত্রার আগে রক্তে ভেজা পোশাক বদলে দিতে হয়। তখন আর শর্মিষ্ঠার কোনও অনুভূতি নেই। মামা, কাকা, পিসি, মাসি, মাসিদের মাসির অশ্লীল উপস্থিতি থেকে বাঁচিয়ে দূরে অন্যঘরে মাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। মা চুপচাপ দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, চোখে কোনও কান্না ছিল না। শুভ, সেই পরিস্থিতিতে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক থাকা যায় ততটাই, মৃত্যুপরবর্তিতা ও পারলৌকিকতা হ্যান্ডল করছিল।

বাবার মৃত্যুটা দৃশ্য হিসাবে না, শূন্যতা হিসাবে প্রায়ই আসে শর্মিষ্ঠার মাথায়, কেন? অসহায়তা? আশ্রয়রিক্ততা? বাবা তাকে চাকরির অ্যাড খুঁজে দিত। ভালো-লাগা কোনও চাকরি, সত্যিকারের কোনও চাকরি শর্মিষ্ঠা এখনও পেল না : এই এ এম পি আর, এই অশ্লীল সামগ্রিকতা : শর্মিষ্ঠার দমবন্ধ লাগে। বাবা মরে গিয়ে আরাম পেল, কষ্টের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

অন্যমনস্কতায় চোখে পড়েনি, রাজীবের মুখের ভঙ্গীতে মুখ ফিরিয়ে তাকায় শর্মিষ্ঠা : মাধুরীদি ঘরে ঢুকে এসেছে, চেয়ার টেনে বসে গেছে, ঠিক কোনও টেবিলের সামনেই নয়। রাজীব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, আর এক কাপ চায়ের প্রসপেক্ট। কাপ নয়, গ্লাস।

শর্মিষ্ঠার নিজের অন্যমনস্কতার প্রতি রাগ হয়। ঘরের কম্পোজিশনে তার চেয়ারের অবস্থানের প্রতিও। মাধুরী বিশ্বাস ঘরে ঢোকার শুরু থেকেই আজ তার চোখে থাকা উচিত ছিল, দরকার ছিল। শর্মিষ্ঠাকে আজ শাসন করতে হবে। প্রথম থেকেই চোখ, নড়াচড়া, বসা—সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে শাসনের আবহাওয়া জারি রাখা খুব শক্ত হয়। তখন একটু শাসনেই প্রত্যাখ্যাত করে বসার সম্ভাবনা থাকে। শাসনটাকে আর সঙ্গত ও চিরন্তন বলে মনে হয় না। আর আজ মাধুরী বিশ্বাসের নড়াচড়ায় একটা বাড়তি গ্রেস—সে কি ঠিক বুঝছে?— শর্মিষ্ঠাকে একটু বিরক্ত করে। বাড়তি লাইভলিনেস, প্রাণতা শাসনকে সবসময়ই আরও জটিল করে তোলে।

শর্মিষ্ঠার সঙ্গে চোখাচোখি হয়, কমদামি একটু বড় সাইজের ফোমের ব্যাগটাকে মিতার টেবিলে রাখতে রাখতে হাসে মাধুরী বিশ্বাস। নির্দ্বিধা হাসি। 'আমার মেয়েটা পাশ করে গেল।' শর্মিষ্ঠা তাহলে ঠিকই বুঝেছিল, একটু বাড়তি উদ্দীপনা। 'ওঃ, কত খরচ করেছি বলুন তো ওর পিছনে।' মাধুরীদি কথাটা আসলে নিজেকেই বলে, শেষ কথাটা। মিতা একটু ফিচেল হাসি হেসে কাগজে মুখ নামায় : প্রথমেই টাকা পয়সার উল্লেখ। আর ও জানে, শর্মিষ্ঠা আজ মাধুরী বিশ্বাসকে সাইজ করবে।

'বাঃ, ভালো খবর তো, চা দিয়েছে আপনাকে? রাজীবের দিকে চোখের ইঙ্গিত করে শর্মিষ্ঠা। প্রথম বাক্যটা নিজের বেশ মানানসই বোধ হয় তার পাওয়ার-পজিশনের সঙ্গে। কত ছোট ছোট পাওয়ার পজিশন, পাওয়ার্ড পজিশন, আর তার গ্রামার, তাতে মগ্ন হয়ে থাকা, শর্মিষ্ঠার হঠাৎ একটু বোকাবোকা লাগে।

'হ্যাঁ—এই তো'। গ্লাসের চায়ে গভীর চুমুক দেয় মাধুরীদি। 'কাল সারাদিন কেঁদেছে। ওর দেখাদেখি ওর বোনও কাঁদছিল। আসার আগে কত বুঝিয়ে এলাম।' কেন কে জানে, হয়ত একটি নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরে দুই বোনের যৌথকান্নার অর্ধহিউমারাকীর্ণ এই ছবি তাকে টানে, কোনও একটা লেভেলে নিজের সঙ্গে আইডেন্টিফিকেশন, ছোটবেলার কোনও স্মৃতি, শর্মিষ্ঠা মাধুরীদির কথার প্রতি মনোযোগ খুঁজে পায়।

'পাড়ায় ঢুকতেই বলল, আপনার খুকু পাশ করে গেছে। শুনে তবে শান্তি। এবারে অনেক ফেল। তবে কাছে একটা ছেলেদের ইস্কুল আছে—ওদের কী ভালো রেজাল্ট। কোনও ফেল নেই। স্টার, লেটার। আমার একটা ছেলে থাকলে ওখানে পড়াতাম। আমার জায়ের মেয়ে—সেও ফেল।'

হ্যাঁ, ঠিকই, তবে শর্মিষ্ঠা, শুধু নিজের মেয়ের পাশে কি এতটা উল্লাস হয়?

মাধুরীদি বেশ হাসিখুশি। এতটা হাসিখুশি কি আর থাকবে যদি শর্মিষ্ঠা তার কথা চলতে শুরু করে? রং না-ফরসা, না-কালো, কপাল থেকে সরু করে সিঁদুর। মাঝারি গড়ন, না-মোটা, না-রোগা—হাসিটা চমৎকার।

'আপনার অত বড় মেয়ে?' ঘন ভারি একটা ক্বাথের মত চায়ের শেষ চুমুকটা জিভ বেয়ে শর্মিষ্ঠার গলায় নেমে যায়। 'দেখে মনে হয় না, না? সবাই তাই বলে?'

কানে ছাড়া সোনার গয়না নেই। নাক বেঁধানো, কাঠি গোঁজা। সস্তার ছাপা শাড়ি। নিম্নবিত্ত এই সাধারণ গৃহিণীটিকে তার আক্রমণ করে কথা বলার ছিল। নিজেকে একটু করুণ লাগে শর্মিষ্ঠার : হাস্যকর। কী করে এখন সে প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে পৌঁছবে, ভাবে শর্মিষ্ঠা।

'আপনি স্কুলে কেমন সময় দিচ্ছেন?' নিজেই বুঝতে পারে শর্মিষ্ঠা, পূর্ববর্তী প্রসঙ্গের জাড্যে কথাটা যতটা গম্ভীর হওয়া দরকার হয়ে উঠল না।

কোথাও একটা কোলাহল, দমকে দমকে, স্পষ্ট সচেতন হয়ে উঠতে না উঠতেই তিনজন চারজন পাঁচজন টিচার ঢুকে আসে ঘরে : একটা কলরব, একটা উত্তেজনা। একাধিক টিচারের চোখ শর্মিষ্ঠার চোখের রেখায় আসে, পিছলে সরে যায় : রাগ, ঠিক রাগ নয়, একটা নাটকীয়তা? কেন, কিছু ঘটছে, কী?

ঢুকে আসার দমকের ভিতরও অভ্যস্ততা রয়ে গেছিল, দুজন টিচারই টেবিলে তাদের ব্যাগ রাখেন একটু উচ্চকিত, কিন্তু মিতার টেবিলে, বা পেরিয়ে গিয়ে নূপুরের টেবিলে—এখন সেখানে কেউ বসে নেই, শর্মিষ্ঠার টেবিলে নয়।

দমছুট, রোগা শরীরের বুক ওঠানামা করে, টিচার স্বপ্না, বসতে বসতে বলে ওঠে, 'আমি পরিস্কার বলে

দেব—এভাবে পারব না। আসুক, আসুক আজ পুলিশ, আমার কী?' কী বলবে হারিয়ে ফেলে স্বপ্না। 'আমার বাড়ি থেকে তো রোজ বারণ করছে— দরকার নেই এই চাকরির।' বারণের শূণ্যতাটাই কি লাফিয়ে ওঠে স্বপ্নার দৃষ্টি থেকে? শর্মিষ্ঠার বুকটা ফাঁকা লাগে।

জানু শেখের কথা শর্মিষ্ঠা আগেই শুনেছে। ওর কাছে ছোরা থাকে, তাও শুনেছে। আলিপুর রোডের ইস্কুল। টিচারদের কলরব পেরিয়ে, উষ্মা পেরিয়ে, এমনকী দু একটা 'আপনি তো সবে এসেছেন—কত দেখবেন' জাতীয় স্টেটমেন্ট পেরিয়ে শর্মিষ্ঠা জানতে পারে, আজ ইস্কুলে এসে জানু ক্লাসের মেয়েদের গায়ে হাত দিচ্ছিল। মিতা প্রশ্ন করে, 'হাত দিচ্ছিল মানে—?' চেয়ে থাকে মিতা। মিতা কি ভাবছে যে জানু ওদের মারছিল? টিচারদের মুখে বিরক্তি ও সঙ্কোচ আসে। একজন একবার আড়চোখে রাজীবের দিকে তাকিয়ে নেন : পুরুষ উপস্থিতি। 'আরে, গায়ে হাত দিচ্ছিল।' একজন টিচারের হাত তার নিজেরই কাঁধের উপর নড়ে সামনের দিকে আসে। 'দু তিনটে তো বেশ বড় মেয়ে—ডেভেলপড, বারো তেরো বছরের।' খুব চোখ, অর্থপূর্ণ সাইলেন্স, টিচারটি শর্মিষ্ঠার দিকে তাকিয়েছিলেন।

টিচাররা বাধা দিতে যাওয়ায় জানু ছোরা বার করে, মারতে আসে, বেঞ্চের গায়ে কোপ দেয়। তারপর বেরিয়ে গিয়েছিল।

মারতে আসা, বিবিধ ইন্টারোগেশনে জানা যায়, মানে হাওয়ায় দুএকবার ছুরি আস্ফালন। ছুরিটা কত বড় সে বিষয়েও বিশদ তথ্য পাওয়া যায় না। তবে জানু যে ডেনজারাস এতে সন্দেহ কী? সে তো অনেক আগে যখন একজন টিচার ওকে চড় মারতে যাওয়ায় ও শাসিয়েছিল, অন্ধকার রাস্তায় পেলে দেখে নেবে। মিতা নয়, এখানে শর্মিষ্ঠার ভিতরেই একটা ইয়ার্কি নড়েছিল, দেখে নেওয়ার ফর্মটা সুবর্ণা নয়। আর মাত্র দুশো টাকার জন্যে এইসব পরিস্থিতির সামনা করতে হয়, এই টিচারদের জন্যে তার খারাপও লাগে।

নিজের বয়সী বাচ্চাদের একটা গ্রুপ আছে জানুর। লিডার। পাড়ার লোকে একবার পুলিশে দিয়েছিল : চুরি, পুলিশ ছেড়ে দেয় বয়স কম হওয়ায়। দেশ বিহার। সেখানে পাঠালেই পালিয়ে ফের কলকাতায়। ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে দিলে ইস্কুলের মেয়েদের সঙ্গে রাস্তায় অসভ্যতা করে। ইস্কুলে ঢিল ছোড়ে।

টিচাররা কেউ আলিপুর রোডের কমিউনিটিতে ফ্রন্টিয়ার ঢুকে গেছে, 'ফ্রন্টিয়ার' অন্য একটা এনজিও, ওরা নতুন ঢুকছে বলে খাবার বেশি দিচ্ছে, জামাকাপড় দিচ্ছে, বাচ্চা এমনিতেই ভীষণ কমে গেছে আলিপুর রোডের ইস্কুলে। কেউ বলে পুলিশে কড়া করে জানানোর কথা। শর্মিষ্ঠার মাথায় আসে আমেরিকার টিন-এজার প্রোব্লেমের কথা। জানু একদম ডিফারেন্ট। থার্ড-ওয়ার্ল্ডের শ্রমজীবীর শ্রমজীবী বাচ্চা। মার্জিনের মার্জিনের ফুটনোট। আর কিছুদিনের মধ্যে জানু ডেভলপ করে যাবে, ভাল্লুক হবে, স্বপন হবে, দাঙ্গায় আর ইলেকশনে কাজে লাগবে, হাওলা সেন্টার বজায় রাখবে, পুলিশের সঙ্গে শত্রুতা থাকবে না, মৈত্রী তৈরি হবে, তাই নয়।

বাঁশরী সান্যাল আসে। ব্যস্ত উদ্বিগ্ন মুখ। অতসী, ড্রাইভাররা। আগেই সাত আটজন ছিল। এখন ঘর জুড়ে একটা মব।

রাজীবের দিকে তাকাল শর্মিষ্ঠা : দুটো ব্যবহৃত গ্লাসে জাগের জল দিয়ে ঝাঁকাচ্ছে : চা দেবে সবাইকে।

৭

হাঁটুর ঠিক উপর উরুটা অবশ হয়ে আসে, তাও দাঁতে দাঁতে চেপে নড়ায়। বৃত্তটা আরও বড় করো, আরও, ঘুরিয়ে চলো। ফিজিও কী বলেছিলেন? সার্কলটা ছোট হলে এফেক্ট পড়বে থাইয়ে, বড় হলে অ্যাবডোমেনের মাসলে। ঘোরাও, চালিয়ে যাও। কাঁধ থেকে পিঠ বেয়ে ঘাম গড়িয়ে মেঝেয় পড়ে। পিঠটা ঘামে ভিজে সেঁটে যাচ্ছে মেঝেতে। চোখ বন্ধ হয়ে যায় শর্মিষ্ঠার। একশ কুড়ি, একশো একুশ, একশো বাইশ। কালও দেড়শো বার করেছে, আজ এত কষ্ট হচ্ছে কেন? সিট-আপগুলো আগে করায়? একশো সাতাশ, একশো আটাশ। বুকের উপর জড় হওয়া হাত অপ্রতিরোধ্য ভাবে চলে যেতে চায় উরুতে। না, করতে তাকে হবেই, অ্যাবডোমেনের বাল্জটা তার কিছুতেই যাচ্ছে না। ছুটিকে বার করে আনার পথ করে দিয়েছিল। ডাক্তারবাবু সেকশন করেছিলেন ভার্টিকাল, নাভি থেকে সরাসরি নিচে। কেন? ফিটাল পজিশন? নার্সিং হোম থেকে বেরোনোর আগেই প্যান্টিকরসেট পরতে বলেছিলেন, ঠিকানা দিয়েছিলেন নিউ মার্কেটের একটা দোকানের। আর কেনাও হয়নি, পরাও হয়নি। কত কিছুই যেমন হয়ে ওঠে না, অকারণেই। এখন অনুতাপ হয়। একশো একচল্লিশ, একশো বেয়াল্লিশ, একশো তেতাল্লিশ—মুখ দিয়ে যন্ত্রণার একটা শ্বাস : শব্দ বেরিয়ে আসে, পা দুটো এসে পড়ে মেঝেতে, ডান গোঁড়ালিতে ব্যথা লাগে। পারল না, একশ পঞ্চাশ অব্দি সে পৌঁছতে পারল না, পারতে চেয়েছিল, পারার চেষ্টা করেছিল, ফুঁপিয়ে উঠল শর্মিষ্ঠা, অপারগতা, পারছে না, সে কিছুই পারছে না। এইরকম করতে করতে একদিন সমাধি, ফসিল, গাছের রেজিনে আটকানো রাইনল্যাণ্ডের পোকা, যে কিছুই পারল না, শুধু আটকে রইল পরিবর্তনহীন। একটা জীবনচর্যায়, একটা জীবনে পৌঁছতে চাইছে সে, নিজের মতো জীবন, নিজের জীবন, নিজের মতো কাজ, নিজের মত গতি—পারছে না, পারছে না, পারছে না সে। শরীর, তার নিজের শরীরও তার আদেশ মানছে না, নিজের শরীরটাই ক্রমে অনতিক্রমণীয়, কোনও একটা জায়গা, অন্তত একটা জায়গাও তো থাকতে পারত, সেখানে তার নিজের ইচ্ছের চরিতার্থতায় সে পৌঁছতে পারবে। পা দুটো ঘামে ভেজা অবশ লম্বমান, চারদিকে বাড়ি বাড়ি আর বাড়ির ফাঁক দিয়ে চুইয়ে কতটুকু আর আলো এই সকাল ছটায়, অন্ধকার এবং অন্ধকার, শর্মিষ্ঠার হাত দুটো উঠে আসে ঘামে ভেজা মুখে, চোখ ভ্রূ হনু চিবুকে চাপ সৃষ্টি করে হাতের তালু। কেন, কেন সে পারছে না, কিছুই পারছে না? আবার ফুঁপিয়ে ওঠে শর্মিষ্ঠা। অপরিসর ঘরের দেওয়াল আর খাট আর টেলিভিশনের নিচু টেবিলের মধ্যবর্তী অপরিসরতায় কোনওক্রমে চিত থেকে উপুড় হয়, কোমর থেকে হাঁটু ব্যথা অবশতা, পেটের পেশিতে অল্প খিঁচ, হাত ও কাঁধে ফ্রি-হ্যান্ডজনিত আড়ষ্টতা, উপুড় শর্মিষ্ঠার ঘামে ভেজা টি শার্টের ভিতর সন্তানবতী মায়ের ঢিলে স্তন এর উপর চাপ সৃষ্টি হয়, ব্যথা, বিশেষত বাঁদিকেরটায়, যেমন হত ছুটি দুধ খাওয়াকালীন, অ্যারিওলা থেকে ভিতরে অনেক ভিতরে হৃদয় মস্তিষ্ক অব্দি, সেই ব্যথায় আরাম থাকত, ঘুমন্ত ছুটির দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলেও তখন নিপল আর অ্যারিওলায় বিন্দু বিন্দু দুধ ফুটে উঠত: মাতৃত্ব। সেই ব্যথায় নিজের আবেগের চরিতার্থতায় পৌঁছনোর আরাম থাকত। এই ব্যথায় আরাম নেই, অসহায়তা, শরীরকে লড়াইতে হয়, হাতদুটোকে মাথার উপরে এনে ওজনকে টেনে আনতে হয় কাঁধে। ফোঁপাতে থাকে শর্মিষ্ঠা। চোখ জ্বালা করে। হয়ত কপালের থেকে ঘাম গড়িয়ে আসছে ভ্রূ বেয়ে চোখে। কাঁদতে পারছে না, সে কাঁদতেও পারছে না। শব্দকে আটকাও, আটকাও, দরকার হলে দমবন্ধ করে, মা আর দিদিমা বার্ধক্যে আর অসুখের অনিদ্রায় জেগে থাকে সারারাত, ঘুমোয় ভোরের দিকে, তাদের নতুন করে কোনও কষ্ট দিতে তুমি পারো না। ছুটিও ঘুমোচ্ছে, তারও ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। তোমার যন্ত্রণার উচ্চারণ বন্ধ করো। কাঁদা বন্ধ করো। কেঁদে কী করবে, কী পাবে? শুধু মাথা ভার হয়ে থাকবে, যন্ত্রণা করবে, চোখে একটা সর্বক্ষণ জ্বালার অনুভূতি। তোমার কাছে ছাত্রীরা আসবে, তাদের পড়াতে হবে, আর একটু পরেই।

ভাঁজ করা দুই হাতের আশ্রয় থেকে মাথা তোলে শর্মিষ্ঠা। পা দুটোকে গুটিয়ে এনে উঠে বসে বজ্রাসনের মত। এভাবে মিনিট দুয়েক থাকলেই পায়ের এক্সারসাইজগত সব যন্ত্রণাই চলে যায়। নিম্নাঙ্গের ট্র্যাকসুট লোয়ারের নাইলন কাপড়ের স্থিতিস্থাপকতায় টান পড়ে হাঁটুর উরুর কোমরের ভাঁজে। ম্যাসাজ করার মত একটা আরাম হয়। ছুটি তখন পেটে, পা ফুলে যেত, পায়ের পাতা থেকে শুরু করে স্মল অফ দি ব্যাক অব্দি টাটিয়ে ব্যথা হত সন্ধার পর থেকে। রাতে রিসার্চের কাজ থেকে ফিরে এসে আর বসে থাকতে পারত না। মাঝে মাঝে ম্যাসাজ করে দিত দেবব্রত। গোঁড়ালি থেকে পিঠ। আরাম, এত আরাম যে সেক্স এলাকায় অতক্ষণ অতটা নাড়াচাড়ার পর সে সেক্স হত না: শুধু আরাম। চোখ বন্ধ করে সেই স্মৃতি আরাম শরীরে ফিল করার চেষ্টা করে শর্মিষ্ঠা।

টি শার্টটা খুলে ফেলে। সারা গায়ের প্রতি মিলিমিটার ঘামে ভিজে। ভেজা টি শার্টটা মেঝেতে রাখে। খাটের কিনারে আগে থাকতেই রেখে দেওয়া তোয়ালেটা দিয়ে পিঠ বুক কাঁধ ঘাড় মুখ কপালের ঘাম মোছে। দুই গাল নাক চোখ কপাল থেকে গরমের হল্কা বেরোনোর একটা অনুভূতি। ঘামে সুতোগুলো একটু কোমল হয়ে ওঠা তোয়ালেটা দু হাতে করে মুখে চেপে ধরে। তখন, ঠিক তখনই, তীব্র, খুব তীব্র গন্ধটা পায় শর্মিষ্ঠা। দেবব্রতর শরীরের। কখনওই কোনও কসমেটিক নয়, শুধু সপ্তাহে দুবার শ্যাম্পু, আর দিনে অন্তত চল্লিশটা সিগারেট, দেবব্রতর ব্যবহার করা জামাকাপড়, বিছানা, তোয়ালে থেকে গন্ধটা ভুল করার কোনও উপায় থাকে না, এতটাই তীব্র। সেই গন্ধটা এখানে, এই তোয়ালেতে আসছে কী করে? দেবব্রত ব্যবহার করেছিল, সেই যখন এসেছে শেষবার? এটা কেন? তাও তো তিনমাস হয়ে গেল? তাহলে? সে কি তার নিজের ঘাম থেকে দেবব্রতর শরীরের গন্ধ পাচ্ছে? কীসের, কোন প্রাণীর কথা সে পড়েছিল, মেটিং সিজনে নারী প্রাণীটির শরীর থেকে এত ফিরোমোন বেরোয়, এত তীব্র তার ঘ্রাণ যে পুরুষপ্রাণী না পেলে নারীটি শেষ অব্দি পাগল হয়ে যায়? সত্যি কি পড়েছিল, না নিজের মনেই বানাচ্ছে সে?

একটা গ্লানি, অপমানবোধ, মাথায় ঘোরে শর্মিষ্ঠার। নিজের শরীরের উপর রাগ হয়। কেন এভাবে শরীরের বন্দী হয়ে থাকতে হয় মানুষকে? গোমুখাসন করবে সে? গোমুখাসন করলে শুনেছি সেক্স কমে যায়, হোস্টেলে মেয়েরা বলত, যারা চুল ভালো করার জন্য বজ্রাসনে বসে চুল আঁচড়াতে। সেক্স থেকেই হচ্ছে তার এরকম? নাকি অন্য কিছু থেকে, এই স্মেল হ্যালুসিনেশন? সে কি সিজো হয়ে যাচ্ছে? সিজো ফ্রেনিকদের তো অনেক হ্যালুসিনেশন হয়?

এই কথা ভাবাকালীন, ভাবতে ভাবতে, নিজের ভিতরে, রিমোট অভ্যন্তরে, কোথাও একটা বদল: একটা উত্তাপ তৈরি হয়, বজ্রাসনে বসে থাকা শরীরের ক্লান্ত দৃঢ়সংবদ্ধ উরু বেয়ে উঠে আসে। শরীরের ভিতর একটা গতিশীলতা, নিজের অবসন্ন বিষণ্ণতার বাইরে বেরিয়ে আসার দুর্লভতম প্রহরগুলোর একটা, বলয়ে বলয়ে, শর্মিষ্ঠাকে ঘিরে ফেলছে। ঘাস মুছে ফেলার তোয়ালে ঘষার অনুভূতি তখনও যায়নি, নিজের গুটিয়ে আসা দুই স্তনবৃন্তের উপর দুই হাত নিয়ে আসে শর্মিষ্ঠা। তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে।

একটা আলগা প্রায় বৃত্তাকার গতি। ঘড়ি মাথা আসনের ঋজুতা থেকে একটা ঢিলে অলস উষ্ণ আরামে পিছিয়ে যায়।

ওটা কি বার করবে, ওই ভাইব্রেটরটা, দেবব্রতর পাব্লিকের অফিস থেকে সামান্য দূরবর্তী ম্যাডান স্ট্রিট থেকে সেটা দেবব্রত কিনে এনে তাকে দিয়েছিল? নীল ফুল ছাপা মার্বেল পেপারে সেলোটেপ লাগানো একটা প্যাকেট, যার গায়ে সাদা একটা কাগজে লেখা ছিল 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে/ যখন জমবে ধূলা তানপুরাটার তার গুলায়/ যখন আশালতা উঠবে বেয়ে দোরগোড়ায়—'। ব্যাটারি নেই, অনেকদিন হল খুলে রাখা আছে, পাছে লিক করে, নষ্ট হয়ে যায়। এখন ব্যাটারি পাবে কোথায়? হাত বাড়ায়, টিভি-র টেবিলটার নিচে, ক্যাসেটগুলোর সঙ্গে ওয়াকম্যানটা আছে, ওর ভিতর দুটো ব্যাটারি। এই ওয়াকম্যানটা বাবা তাকে দিয়েছিল, বিদেশী, কোনও গবেষকের উপহার, শুভ একেবারেই পছন্দ করেনি, মা-ও নয়। তাই বাজাতে পারত না শর্মিষ্ঠা, রেখে দিয়েছিল, শুভ চাওয়ামাত্রই মুক্তি পাওয়ার অনুভূতির সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। কিছুদিন হল সমর শুভকে একটা সিডিওয়াকম্যান কিনে দিয়েছে, শুভ তাই রেখে গেছে। এখন শোনে শর্মিষ্ঠা। রাতে একা একা।

পাছে শরীরের উল্লাস মরে যায়, বাঁ হাত নিজের উন্মুক্ত স্তনে রেখে ডান হাতে ওয়াকম্যানের ব্যাটারি চেম্বার খোলে শর্মিষ্ঠা। প্লাস্টিসের স্ট্র্যাপ টেনে ব্যাটারি বার করে। এইসময় ও ঘরে টেলিফোন বেজে ওঠে। এই সকালে/ বিস্ময় এবং চমকের ভিতরেই ওয়াকম্যানটা খাটে রেখে লাফ দিয়ে ওঠে শর্মিষ্ঠা। মা দিদিমা ছুটি ঘুমোচ্ছে। ঘুম ভেঙ্গে যাবে। ঘামে ভেজা টি-শার্টটায় হাত দিতেও গা ঘিনঘিন করে, তবু সেটাই গায়ে গলাতে গলাতে প্রায় লাফিয়ে ওঘরে যায় শর্মিষ্ঠা। এর ভিতরেই রিংটা থেমে যায়, অর্থাৎ মা তুলেছে, একটা উদ্বিগ্নতা আছেই, শুভকে নিয়ে, আগের একটা মিসক্যারেন আছে ওর। এবার পুরোটাই শুইয়ে রেখেছে ডাক্তার। গেছে শর্মিষ্ঠা, দু-চারবার, হঠাৎ মনে হয়, আরও গেলেও তো পারত, যাওয়া উচিত ছিল, আসলে ওর শ্বশুরবাড়ির ওই ফ্ল্যাটে গেলেই এমন দমবন্ধ লাগে। তাও যাওয়া উচিত ছিল, খারাপ লাগে শর্মিষ্ঠার।

ঘামে আটকে যেতে চাওয়া টি-শার্টটা গা থেকে ছাড়াতে ছাড়াতেই দরজায় দাঁড়ায় শর্মিষ্ঠা, তখনই বলে মা, 'বিবি, তোমার ফোন।' মার গলা শুনেই বোঝা যায়, মা জেগে ছিল। কতক্ষণ? সারারাত?

এত সকালে কে ফোন করল? যাক, শুভর নয়, 'হ্যালো—'।

'হ্যালো, বিবিদি? আমি অরূপ বলছি।' অরূপ, এত সকালে, কী ব্যাপার, মানবদার কিছু হয়নি তো?

'অরূপ—হ্যাঁ—বলো, এই সকালে?'

'ওঃ, বড্ড সকালে করেছি, না? আসলে, সকালে, মানবদাই বলল তুমি বেরিয়ে যাও। ঘুমোচ্ছিলে?' লাজুক গলায় বলে অরূপ। অল্প দাড়িসহ, বাদামি বাদামি, পুরো কালো হয়নি, খুব রোগা একটা মুখে ভারি বড় দুটো ভাসানো চোখ, চোখে একটা দূরবর্তিতা, শর্মিষ্ঠার মাথায় ভেসে ওঠে। অরূপ তাকে বিবিদি বলে, শর্মিষ্ঠাদি নয়। কারণ দেবব্রতর মাধ্যমে আলাপ। দেবব্রতও তাকে একসময় শর্মিষ্ঠা বলত। পরে, কিছুটা জোর করেই, যেন শর্মিষ্ঠার বাড়ির নামকে গ্রহণ করা মানে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে শর্মিষ্ঠার বাড়িকেও গ্রহণ করা, 'বিবি' বলে ডাকতে শুরু করেছিল।

'না না, ঘুমোচ্ছিলাম না', বলে শর্মিষ্ঠা, ব্যায়ামের কথা উল্লেখ করতে ইচ্ছে করে না, 'বলো, কী করছ এখন, কবিতা লিখছ?' কথা বলতে বলতেই রিল্যাক্সড ফিল করে শর্মিষ্ঠা, অরূপের সঙ্গে কথা বলতে তার ভালো লাগছে, আর টেনশনেরও কিছু নেই, নইলে বোঝা যেত।

গলার মধ্যে একটু হাসে অরূপ। কবিতার কথা বলতে, যে কোনও নতুন কবিরই যেমন, ভালো লাগে অরূপের। 'নাঃ, একদম লিখছি না।'

'সে কী—তাহলে কী করছ?'

'করার কত কিছু আছে। এই যেমন তোমায় ফোন করলাম।' তার মজা পাওয়াটা টেলিফোনের তার বাহিত হয়ে অরূপ অব্দি পৌঁছে যাচ্ছে, এটা ভালো লাগে শর্মিষ্ঠার।

'সকালে উঠে দিদিদের ফোন করা—এটা ব্রেকথ্রু কবিদের অ্যাজেন্ডার মধ্যে পড়ে নাকি আজকাল?' 'দিদি' কথাটা বলতে শর্মিষ্ঠার ভালোই লাগে, আবার মনে হয়, একটু ন্যাকা-ন্যাকা শোনাল না তো? 'বেশ আনএমপ্লয়েড আছ দেখছি?'

'আনএমপ্লয়েড মানে, ভয়ঙ্কর আনএমপ্লয়েড। আর আমি ব্রেক থ্রু কবি এটা তোমায় কে বলল?'

'বলার কত লোক আছে। জীবনানন্দ, বিনয় মজুমদার, জয় গোস্বামীর পরই বাংলায় নতুন কবি।'

'যাঃ, যত বাজে কথা', আর লড়াই চালাতে পারে না অরূপ, সত্যিই লজ্জা পেয়ে যায়। 'দেবব্রতদাটা এমন বাড়িয়ে বাড়িয়ে কথা বলে যে সে আর বলার নয়।'

'এত লজ্জা পাচ্ছ কেন—দেবব্রতর কাছে কত গল্প শুনেছি তোমার ফেনোমেনাল কনফিডেন্স-এর। তুমি কখনই অকওয়ার্ড হও না।'

'কিচ্ছু বিশ্বাস কোরোনো তো—সব বাড়িয়ে, বলা কথা। আমি কী লিখেছি—কিচ্ছু না। তবে লিখব।'

'এই তো, এবার বেশ চেনা যাচ্ছে। অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। নামটা কমনপ্লেস। সেইজন্যেই কবি হিসেবে অসাধারণ—যে কোনও কিছু ভেবে নেওয়া যায়।' সত্যিই এরকম ভাবতে বেশ মজা পায় শর্মিষ্ঠা, কবি হিসাবে বিরাট দাঁড়িয়ে গেছে অরূপ। নামটাকে কমনপ্লেস বলল বলে ওর আবার খারাপ লাগেনি তো? না, ততটা প্যারানয়েড নিশ্চয়ই নয় অরূপ। 'ও, তুমি ফোন করছ কোথা থেকে, বাড়ি থেকে তো?'

'হ্যাঁ, কেন?' একটু আড়ষ্ট গলায় জিগেশ করে অরূপ।'

'না, বাড়ি থেকে করলে ঠিক আছে। বাইরে থেকে করলে—যে আড্ডা মারার মুডে কথা বলছি' মানবদার কাছেই শুনেছিল মামাবাড়িতে থাকে অরূপ, মামাদের সঙ্গে। ফ্ল্যাটে। মানবদাদের একই হাউজিং-এ। মামা বাড়ি মানে যতই হোক নিজের বাড়ি নয়, সেখান থেকে ফোন করার, খুব দীর্ঘ কোনও ফোন করার কোনও সমস্যা আছে কিনা, এই সচেতনতাও শর্মিষ্ঠার মাথায় কাজ করছিল।

'অবশ্য, আমার টিউশনি আছে, একটু বাদেই।' ঘামে ভেজা জামাটা একটা অস্বস্তি, আরও এখানে ফ্যান চলছে, ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। মাকে কমাতে বললেই মা হয়ত অফ করে দেবে, তাতে দিদিমার কষ্ট হবে। ফোনটা ও ঘরে রাখাই যায়, কিন্তু, দিদিমার জন্যে মূলত, নানা আত্মীয়-স্বজনের এত ফোন আসে। বরং শর্মিষ্ঠার ফোনই কম আসে।

টিউশনির উল্লেখে সুরটা কেমন কেটে গেল। সুরটা আবার তৈরি করতে ইচ্ছে করে। 'ও, তোমাদের সেই পত্রিকার কী হল?' মানবদা কিছুদিন ধরেই একটা পত্রিকা বার করার কথা ভাবছিলেন, দেবব্রত, অরূপ আর আরও কয়েকজনকে নিয়ে।

'সেই জন্যেই তো তোমাকে ফোন করা।'

'আমাকে—কেন? দেবব্রতকে কিছু জানাতে হবে?'

'না, সে তো আমার কাছে ঠিকানাই আছে। আর আমি তো গেছিলাম। দুদিন ছিলাম। গত উইকের আগের উইকে।'

অরূপের পুরুলিয়া যাওয়ার কথা শুনে একটু আনইজি হয়ে পড়ে শর্মিষ্ঠা, সে জানত না, এটা কি তার খারাপ লাগছে? কেন? পোজেজিভনেস? 'কেমন লাগল—এনজয় করলে?'

'হ্যাঁ, বেড়ে জায়গা, বেড়ানোর পক্ষে চমৎকার। চারদিকে পাহাড়। ধানক্ষেত। ছোট ছোট পাহাড়, ওখানে ওগুলোকে ডুংরি বলে।'

'হ্যাঁ, বেড়ানোর পক্ষে খুবই চমৎকার।' দেবব্রত এখন আর পুরুলিয়া শহরে নেই। কলেজের কাছেই একটা গ্রামে আছে। কাছে মানে চার কিলোমিটার। সেখানে এক প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী আছেন, তার সঙ্গে আড্ডা মারে, চিঠিতে লিখেছিল। 'কোনও উল্টোপাল্টা কিছু করোনি তো?' দিদি সুলভ ভঙ্গিতে জিগ্যেস করে শর্মিষ্ঠা। সরাসরি মদের কথা বলতে তার অস্বস্তি হয়: দিদিমা এত কাছে শুয়ে আছে, সবই জানে, গোপনও নয়, তবুও।

আবার গলার ভিতর হাসে অরূপ। 'ওখানে জানো একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানে দেশী রাম পাওয়া যায়। বাইরে, লেখাও আছে, বড় বড় লাল অক্ষরে।' অরূপ গলাটা একটু নামিয়ে বলে। ওরও সামনে কেউ আছে? নাকি সহজাত শোভনতা? সেটা ভাবতে কি শর্মিষ্ঠার একটু খারাপ লাগে, কেন? শোভনতার ভান আর অরূপকে মেলাতে খারাপ লাগে তার?

'কোরো না ওসব বেশি।' এর সঙ্গেই শর্মিষ্ঠা বলতে যাচ্ছিল, আরও তুমি যা রোগা। বলে না, মনে হয়, অরূপের খারাপ লাগতে পারে। সব পুরুষেরই এমন একটা কুসংস্কার থাকে ভিরাইলতম হয়ে ওঠার। আর ভিরাইল এবং আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার মানেই যেন স্ট্যালোনেস্ক একটা শরীর। 'তারপর, পত্রিকার সঙ্গে আমার দরকার মানে? আমি তো কাব্যচর্চার কিছু বুঝি না।'

'তোমাকে একটা বড় লেখা অনুবাদ করে দিতে হবে। মানবদা বলেছে।' একটা ফাইনালিটির টোনে বলে অরূপ।

'মানে?'

'রিথিং কিং মার্স্কিজমে, নাইনটি ফোর এর বোধহয় ফল-সংখ্যায়, হ্যারিয়েট ফ্রাড এর একটা লেখা। অ্যানোরেকশিয়া নাব্ ভোসা, বডি অ্যাজ এ সাইট অফ ক্লাস-স্ট্রাগল শেষটুকু সিওর না। এই লেখাটা তোমায় অনুবাদ করে দিতে হবে। আমাদের পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বেরোবে।' একটু থামে অরূপ, আরও কিছু বলতে চায়।

'আচ্ছা বিবিদি ফল মানে কী গো—শীতকাল? যখন বরফ পড়ে? আমি মানবদাকে আর জিগ্যেস করলাম না।'

'না, অটাম। শরৎ-হেমন্ত। যখন পাতা পড়ে গাছ থেকে।' তাড়াতাড়িই অন্য প্রসঙ্গে যায় শর্মিষ্ঠা, খারাপ লাগা অতিক্রম করেই প্রশ্নটা তাকে করেছে অরূপ। ভালো লাগে শর্মিষ্ঠার, সত্যিই দিদির মত লাগে নিজেকে। কোনও একটা জায়গায় নিজের কনফিডেন্স আছে বলেই নিজের না-জানাটা ওপন করতে পারে অরূপ। 'কিন্তু, আমি বুঝতে পারছি না, পত্রিকাটা আমি পাব কোথায়? আর আমি কেন, আর কেউ নেই?'

'লাইব্রেরি থেকে তুলে নিতে বলেছে। মানবদার কাছে ছিল। কে একটা নিয়ে গেছে, আর দেয়নি।'

'কোন লাইব্রেরি থেকে? ন্যাশনাল?'

'তাতো-কিছু বলেনি।'

'তালে সেন্টার লাইব্রেরিই হবে। ন্যাশনালে শেষ ম্যাগাজিন আছে হয়ত এইটটিন নাইনটি ফোরের। অন্তত নিতে গেলে তো তাই বলে। আর সেগুলো তো ভীষণ ব্রিটল। অথবা নট ফাউন্ড, তাই দিতে পারে না।'

'কোনও কাজ করে না, না?'

'কাজ করে না, এটা একটা আন্ডারস্টেটমেন্ট।'

সেন্টারে তো কোনও অসুবিধা নেই, আরও তুমি তো ওখানে ছিলে।'

'না, সে ঠিক আছে, শুধু আমি বলে নয়, ওটা অনেক ওয়েল-মেইনটেইন্ড। স্টাফরাও অনেক কো-অপারেটিভ। তবে ওখানে থাকলে হয়, মেইনস্ট্রিম জার্নাল তো নয় রিথিংকিং।'

'আর তপনদার কাছে, ওই ফরেন বুক, খোঁজ নিতে বলেছে, দাঁড়াও আমি লিখে রেখেছি—'। কাগজের খশখশ শব্দ। শর্মিষ্ঠার ভালো লাগে মানবদা তাকে একটা অনুবাদ করে দিতে বলেছে। শুধু পত্রিকার কাজ করিয়ে নেওয়া নয়, মানবদা তাকে এটার ওয়াদি বলে মনে করেছে।

'—হ্যাঁ, বিবিদি, হ্যালো, তুমি লাইনে আছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'ভীষণ ডিস্টার্ব্যান্স হচ্ছে এদিকে। ইয়া, ওই হ্যারিয়েট ফ্রাড এরই, আর বেজনিক অ্যান্ড উলফ, তিনজনের এডিটেড, ব্রিং দেম অল ব্যাক হোম। প্লুটো প্রেসের বই।'

'কী—প্লুটো?'

'প্লুটো, প্লুটো, পি ফর প্যারট, সৌরজগতের শেষ গ্রহ। ও, না, এখন তো ভাইকিং না কী একটা আছে।'

'হ্যাঁ—প্লুটো প্রেসের—বইটা খোঁজ নিতে হবে?'

'যদি পাও, তাহলে নিয়ে নেবে, দাম যাই হোক।'

'আর যদি না পাই?'

'পাবে না বলেই মনে হয়। কয়েকদিন হল বইটা বেরিয়েছে। উলফ চিঠি দিয়েছে মানবদাকে। না পেলে আনাতে বলবে তপনদাকে।'

'এই দুটো কাজ তো?' শর্মিষ্ঠার এখন সত্যিই একটু ব্যস্ত লাগে। দুটি মেয়ে আসে যোধপুর পার্ক থেকে, একজন বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, আর একজন ঢাকুরিয়া। এখনি, যে কোনও মুহূর্তেই, এসে যাবে। তার চান করা, জামাকাপড় ছাড়া, কিছুই হল না।

'এ দুটো মানবদার কাজ। বিবিদি।' একটু থামে অরূপ। কিছু একটা বলতে সময় নিচ্ছে। 'আর আমার জন্য একটা দুটো টিউশনি দেখো না, টাকাপয়সা, দরকার পড়ে তো।' অরূপকে টিউশনি খুঁজতে হচ্ছে এটা ভালো লাগে না শর্মিষ্ঠার। কেন? দেবব্রত টিউশনি করত না বলে? কোথাও একটা আইডেন্টিফিকেশন? অরূপ ভালো কবিতা লেখে, সাঙ্ঘাতিক ভালো, মানবদা আর দেবব্রত দুজনের কাছেই শুনেছে, নিজে পড়েনি শর্মিষ্ঠা, ছাপা হয়েছে বোধহয় খুবই কম, তাকেও বাঁচার জন্যে টিউশনি করতে হবে? আনন্দমেলায় মাঝে মাঝে কভার স্টোরি করে অরূপ, সেটা যে কোনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হতে পারে না বোঝাই যায়। আনন্দবাজার গ্রুপে কোনও চাকরি হতে পারে না অরূপের? অরূপ কোনওদিনই রাজনৈতিক ছিল না, সেদিক থেকে কোনও অসুবিধা নেই। আসলে হওয়াটাই একটা প্রশ্ন। আনন্দবাজার গ্রুপের চাকরি ছেড়েই দাও, একটা প্রাইভেট ফার্মের ছোট্ট চাকরির জন্যই শ-শ দরখাস্ত পড়ে। এল আই সি-তে শুনেছে চারজন এম এ পাশ ঢুকেছে, এইট পাশ সার্টিফিকেট দিয়ে। কোনওদিন বলতে পারবে না এম এ পাশ, বললেই চাকরি যাবে। ক্লান্ত অসহায় পরিচিত বিষণ্ণতাটা নিজের ভিতর ফিরে আসছে, টের পায় শর্মিষ্ঠা।

'আসলে অরূপ, তোমার সাবজেক্ট তো হিস্ট্রি, হিস্ট্রিতে ইউজুয়ালি টিউশনিটা কম পাওয়া যায়। কলেজ টিচাররাই পড়ায়। ব্যাচে। ফিজিক্স, ম্যাথস, ইকো এগুলোয় টিউশনি অনেক বেশি। স্ট্যাটিস। আর আমার মা যোগাযোগ সবই তো সাউথে—'। কী বলবে সে অরূপকে? সত্যিই নিজের ভাই হলে সে কী বলত? এই একই টোনে কি কথা বলত?

'আচ্ছা, বিবিদি, তুমি তো শুনলাম একটা এনজিওতে করছ। ওদের কাজও তো অন্যরকম, ওখানে কিছু একটা হয় না?'

অরূপের একটু আগের দ্বিধাগ্রস্থতার অর্থ এতক্ষণে বোধহয় খুঁজে পায় শর্মিষ্ঠা। বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল অরূপের। গতকালই মানবদার কাছে শর্মিষ্ঠার এই কাজটার কথা শুনেছে অরূপ, প্রথম যৌবন কত রোমান্টিক, এর ভিতরেই হয়ত ভাবতে শুরু করেছে, 'অন্যরকম': সমাজসেবা, মানবিকতা, মন খারাপ হতে থাকে শর্মিষ্ঠার। তার কাছেও কেউ ফোন করছে এক্সপেক্টেশন নিয়ে? কান্না পায় শর্মিষ্ঠার, অরূপের, অরূপদের কথা ভেবে।

যা, ভাবছ তা না, অরূপ। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে শর্মিষ্ঠার ভিতর থেকে। 'এই জায়গাগুলো বরং আরও বীভৎস। এর চেয়ে সরকারি চাকরিও ভালো।।

'কে দিচ্ছে সরকারি চাকরি, বিবিদি? আমলা হওয়ার কথা ভাবতে একটা কেমন লাগে, তাও দেওয়ার কথা ভেবেছিলাম। তা ক্লার্কশিপের জন্যেই যা প্রিপারেশন দেখলাম। আরও আমরা তো অঙ্কটা একদম জানি না।' শান্ত নির্বিকার কিন্তু শূন্য গলায় কথা বলে অরূপ।

'পলিটিকাল সায়েন্সে তবু টিউশনি জোটে, হিস্ট্রিতে এম এ ভাবলেই কেমন একটা হাসি পায়। সত্যিই অল্প হাসে অরূপ। নিজের ভিতর অল্প শিউরে ওঠে শর্মিষ্ঠা ঃ সে কি একটু হাইপার-সেনসিটিভ হয়ে পড়ছে? মানুষ তো এই নিয়েই বেঁচে আছে, বেশ বেঁচে আছে, বেশ। মোহরা, বোম্বে, হামসে হ্যায় মুকাবলা হিটও করছে। কারা, কারা দেখে ফিল্মগুলো? কারা বসে ভিক্টোরিয়ায়, লেকে গঙ্গার পাড়ে?

'অরূপ, তুই প্রেম করিস?'

'অ্যাঁ—না,' হাসে অরূপ, 'ওই ঝামেলা নেই। কিন্তু আর অল্পদিনের মধ্যেই কিছু একটা না পেলে আমায় বানীপুর চলে যেতে হবে, হাবড়া থেকে একটু দূরে, বাবা বাড়ি করেছিল, ডিজেবিলিটি বেনিফিটের টাকা দিয়ে। বাড়ি মানে একটা ঘর, বারান্দায় রান্না হয়, একটা খোলা বাথরুম, একটা টিউবওয়েল আর সি এম ডি এর বানানো একটা ছকোনা পায়খানা। সেই বাড়িতে একটা ঘরে মা বাবা আর বোনের সঙ্গে গিয়ে থাকতে হবে।' একটু নৈঃশব্দ্য। 'ওই বনগা লাইনেই, হাবড়ার আর কয়েকটা স্টেশন পরেই চাঁদপাড়া, সেখানে বিনয় মজুমদার থাকে। পাগল, একা।' শর্মিষ্ঠা চুপ করে থাকে, বলার কিছু পায় না।

'টিউবওয়েলটার জলে একটা পাঁকের গন্ধ, মুখে দিলেই বমি আসে। আমি নাক বন্ধ করে খাই, যদি বমি হয়ে যায়।' শর্মিষ্ঠার নিজের গাও কি একটু গুলিয়ে ওঠে? কেন, অরূপের নৈর্ব্যক্তিক বলার ধরণে? 'আমার দুটো কবিতায় ওই জলের কথা আছে।

অন্য কেউ পড়ে অবশ্য বুঝবে না।'

হঠাৎ সামনে মা, কিছু একটা বলছে, হাতে শর্মিষ্ঠার ঘরে পরার জামা, শর্মিষ্ঠা তার অন্যমনস্কতার বাইরে আসে। 'কী ওরা এসে গেছে? সায়বাচক মাথা নাড়াতে নাড়াতে বাঁ-হাতের তর্জনীতে চাবির রিং নিয়ে মা দরজার দিকে যায়। 'অরূপ এক সেকেন্ডে, প্লিজ'। রিসিভারটা পাশ করে রেখে সাদার উপর হালকা ছোট ছোট লাল ডট ঘরে পরার জামাটা পরে নেয় শর্মিষ্ঠা। টি সার্ট আর ট্র্যাকশুট লোয়ারের উপর। টি শার্টের হাত বুক ফ্যানের তলায় বসে শুকিয়ে গেছে। পিঠটা ভিজেভিজে, চেয়ারের কুশন টেনে নিয়েছে কিছুটা, বাবা মারা যাওয়ার আগের কিছুদিন অনুক্ষণই এটায় বসে থাকত। শুলে কষ্ট আরও বাড়ত। জামাটা গলিয়ে নিয়েই চেয়ারে বসে পড়ে শর্মিষ্ঠা। মার খেয়াল করে জামাটা এনে দেওয়া তার বেশ ভালো লাগে। মার সবদিকেই খেয়াল থাকে। যে কদিন এখানে থাকে দেবব্রত, তার কোনও দিনই রাতে পড়াশুনোর পর খাবে বলে ফ্লাস্কে চা রাখতে ভুল হয় না মার। এটা সে মা খুব অ্যাফেসশনবশত করে তা নয়, করার এফিশিয়েন্সির অভ্যেসে করে।

'টেনশন কোরোনা, অরূপ, কিছু একটা হয়ে যাবে ঠিক।'

'না, টেনশন কী, তোমার ছাত্ররা এসে গেছে, না?'

'ছাত্রী। ছাত্র নয়।'

'ওই একই হল, আমি ছাড়ি তাহলে।

দুজন মেয়ে এসেছে, আরও দুজন আসবে, শর্মিষ্ঠার সামনে দিয়ে ভিতরে যায়। মেয়েগুলো কি জামার নিচে পায়ের বেরিয়ে থাকা অংশে ট্র্যাকশুট লক্ষ করল। মেয়েদের লক্ষ্য একটু বেশি হয়। করলেই বা কী?

'আচ্ছা, আর ওই এনজিওর ব্যাপারে তোমার সঙ্গে দেখা হলে কথা হবে।'

'ঠিক আছে, ছাড়ছি, তুমি বই আর অনুবাদের কথা ভুলো না। আমি মানবদাকে বলে দেব তোমায় বলে দিয়েছি।'

'আচ্ছা। ছাড়ছি।'

খাওয়ার টেবিলের চেয়ারের পিঠ থেকে তোয়ালেটা তুলে বাথরুমে যায় শর্মিষ্ঠা। তাড়াতাড়ি করতে হবে। দিদিমা উঠেই চান করে পুজোয় বসবে।

সমস্ত ব্যতিব্যস্ততা সত্বেও একটা মজা কোথাও রয়ে যায়। একটা অভিনবত্বের মজা। যেমন সকালে ফোন করল অরূপ, এইরকম সকালে, এর চেয়েও সকালে মাঝেমাঝে এসে পড়ত দেবব্রত। বেল বাজিয়ে ঘুম ভাঙাত। বাবার খুবই অপছন্দ ছিল, ঘোর, সভ্যতার অভাব। বিয়ের আগের সেই প্রেমের দিনগুলোয়। হয়ত সবই ঠিক, কিন্তু প্রেমিকের ওরকমই হওয়া উচিত, দিওয়ানা, পাগল, আনপ্রেডিক্টেবল। নইলে সমরের মত হয়। বিয়ের আগের দু একটা চিঠি কখনও চোখে পড়েছে, ইংরিজিতে লেখা দুলাইন, অফিসের ফাইল লেখার ইংরিজি। বিয়ের আগে থেকেই শুভকে গয়না আর শাড়ি দেয়। আজ অরূপের ফোনটা পুরোনো, হারিয়ে ফেলা সেই উজ্জীবনকে হঠাৎ একটু জাগিয়ে দিল।

খোলা শাওয়ারের নিচে চামড়ায় জল ঝরার অনুভূতির ভিতর শর্মিষ্ঠা কব-ডগলাস প্রোডাকশন ফাংশন মনে পড়ানোর চেষ্টা করে। এখনি এদের পড়াতে হবে। হোমোজেনেইটির ফরমুলা মনে করে, ফাংশান অব ল্যামডা এক্স ইজ ইকুয়াল টু ল্যামডা টু দি পাওয়ার নিউ মালটিপ্লায়েড বাই এক্স, পার্শিয়াল করে এল আর কে-র মার্জিনাল প্রোডাক্ট। স্মৃতিতৃপ্ত শর্মিষ্ঠা ব্যায়ামের ঘাম থেকে ক্লেদ ধুয়ে ফেলছিল, জল, জলের আরাম, বয়ে চলে শরীর বেয়ে।

৮।।

শর্মিষ্ঠার ডায়রি থেকে ঃ

'এখানের টিচারদের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠছে। মালাদি এখানের একজন সিনিয়ার টিচার। বি এড ও করেছিলেন। তাও এখানে করে কেন কে জানে? অবশ্য স্কুলের টিচারি পাওয়া এখন বোধহয় কলেজের চেয়েও ঝকমারি। কলেজ তবু কমিশনের কয়েকজনের কারুর সঙ্গে একটা লাইন। আর স্কুল মানে ছোট ছোট পুকুর, ছোট পুকুরের ছোট কুমীর। প্রদীপের বউ বি এড করা, এম এ পল সায়েন্সে। ওকে কোন্নগরের একটা ইস্কুলে বলেছিল চল্লিশ হাজার টাকা দিতে হবে। তাও তো কয়েকবছর হয়ে গেল। এখন হয়ত ফিগারটা লাখ হয়ে গেছে। হয় লাখ টাকা নয় পলিটিকাল লাইন। টাকা না থাকলে লাইনে তো দাঁড়াতেই হবে।

মালাদির বয়স বছর চল্লিশ। আমার জন্যে একটা মিষ্টির প্যাকেট এনেছিলেন। অতসী সামনে থাকায় বার করলেন না। আমার ঠিক মনে হচ্ছিল কী একটা অস্বস্তিতে আছেন। আমি একবার জিগ্যেস করেছিলাম মাথা ধরেছে কিনা, চা খাবেন কিনা। মালাদির ইস্কুল চেতলায়, পরমহংস রোডে। মিষ্টির প্যাকেটটা পরে মিতার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে। প্যাকেট মানে চারটে ছোট সন্দেশ। আমাকে মিষ্টি দিতে চেয়েছিলেন, তাতেও অনেক অসুবিধা। যদি পরে কথা ওঠে। কীরকম অদ্ভুত অমানবিক পরিবেশে এরা কাটিয়ে দিচ্ছে। হয়ত সারাজীবন। নিজেকে এর সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে আমার ভয় করে।

রবিবার সকাল আটটা থেকে দুটো পর্যন্ত টিচাররা কাজ করেছে। খাওয়ার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এত দেরি হবে ওরা বোঝেনি। তাই টিফিনও আনেনি। এ এম পি আর থেকে চাইলেই একটা কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারত। করেনি। ইকনমিক্সে আমাদের যে পড়তে হয়েছে সারপ্লাস লেবার ওয়েজ রেটকে কমিয়ে আনে, প্রাইস অফ লেবারকে, এর চেয়ে তার ভালো উদাহরণ হয় না। আন্ডার গ্রাজুয়েটে অমর্ত্য সেনের যে থ্রি অ্যাস্পেক্টস অফ এমপ্লয়মেন্ট পড়েছিলাম, ইনকাম, রেকগনিশন আর প্রোডাকশন, তার কোনওটাকেই বোধহয় ঠিকভাবে এটা সার্ভ করে না। তাও এটা একটা এমপ্লয়মেন্ট। প্রোডাকশন একরকম তো হয়ই, অজিত রায় বাঁশরী সান্যাল খোকন সোনা কোম্পানির এই শান ও শওকত। ইনকাম, হ্যাঁ, দুশো কি আড়াইশোও একটা ইনকাম তো বটেই। আর রেকগনিশনও। কিছু একটা তো করি। বেশিরভাগ মেয়েই, নারীই, তার নিজের বাড়িতে যেভাবে থাকে, তার বাইরে একটা শ্বাস নেওয়ার মত মুক্ত হাওয়া, নিজের হাওয়া, পাওয়ার একটা ফুরসত।

সেদিন এশিয়ান এজে ফ্রন্ট পেজে একটা স্টোরি করেছিল, একসঙ্গে কয়েকশো নারী কর্মীর চাকরি চলে যাচ্ছে রাজস্থানের সমাজকল্যাণ দপ্তর থেকে। তারা ডিমনস্ট্রেট করছে, ইত্যাদি। এরা বছরের পর বছর খুব কম টাকায়, একশো না দেড়শো, কাজ করে গেছে। এদের অফিসাররা পেত কয়েকহাজার করে। এই নারীরাই ওদিকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে পণপ্রথার বিরুদ্ধে কথা বলত, বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে, বেশি বাচ্চা না হওয়াতে বলত, মেয়েদের টিউবেকটমি করিয়ে নেওয়ার কথা বলত। রাজস্থান মানেই তো বিজেপি সরকার, রাজস্থান মানেই রূপ কানোয়ারের সতীদাহ, সতীদাহের স্পটে গর্বিত কুলপুরুষ এবং সরকারি আমলাদের উপস্থিতি, রাজস্থান মানেই কোনও একটা প্রাচীন তীর্থে লাখ লাখ মানুষের একত্র উলঙ্গ পুজোপার্বন, কোথায় একটা পড়েছিলাম পুলিশ কনস্টেবল, ইন্সপেক্টর, দারোগারাও সব উর্দিখুলে উলঙ্গ হয়ে পুজোর সমাবেশে মিশে যায়। পড়ে মজা লেগেছিল, মনে হয়েছিল উলঙ্গ হওয়ার পর পুলিশদের ও কি মানুষের মত দেখতে লাগে? সেই রাজস্থানের গ্রামে গিয়ে এই সব বোঝানো—জীবন্ত রিচ ব্রাউন মেল অর্ডারের মুখোমুখি, এইসব কর্মীদের রেপড হতে হয়েছে, মার খেতে হয়েছে, অন্যান্য নিগ্রহ তো আছেই। পড়তে পড়তে ভাবছিলাম, দেড়শো, মাসপ্রতি মাত্র দেড়শো টাকার জন্য মানুষ এত কিছু পারে, রেপড হতে পারে? আসলে কাজগুলো করতে পারে এরা শুধু নিজের জন্যেই, নিজের কাছে নিজেকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে, নিজেদের তেমন টাকা থাকলে হয়ত নিজেরাই সরকারকে দেড়শো করে টাকা দিতে মাসপিছু এই কাজ করতে দেওয়ার বদলে। মনের গভীর কোনও স্তরের কোনও লড়াই, তাকে বার করে আনার ফর্ম, রিলিজিয়াসনেস, আমি কিছু একটা হয়ে উঠছি, আমার কিছু করার আছে, কিছু একটা বলার আছে, নিজের মত, নিজের মত চারপাশটাকে করে তোলার মত।

ইমমর্টালিটিতে মিলান কুন্দেরা এই প্রবণতাটাকে শ্লেষ করেছিল। মিলান কুন্দেরা আমার ভালো লাগে না। অগভীর লাগে। অগভীর স্মার্টনেস। অ্যাগনেস স্নানাগারে। স্নানাগারে বসে নিজের মত হওয়া, নিজের মত কথা বলা, অন্যের সামনে মডেল হয়ে ওঠা। আবার মডেলের মত সবাই যদি হয়ে পড়ে তখনই স্বতন্ত্রের কোনও স্বতন্ত্র রইল না। একটা কন্ট্রাডিকশন ইন ইটসেলফ। নিজেকে এস্টাবলিস করতে গিয়ে অ্যানিহিলেট করা। কুন্দেরা শুধু ফ্যাশন হিসাবে স্বাতন্ত্রকে দেখেছিল। মোড অফ লাইফ হিসাবে, বাঁচার উপায় হিসাবে স্বাতন্ত্রকে দেখতে পারেনি। যখন শুধু বাঁচতে গিয়েই চারপাশটাকে বদলানোর চেষ্টা

করতে হয়। থার্ড ওয়ার্ল্ড মেয়েদের দেখতে পারেনি কুন্দেরা। অথবা এমন নয়তো, যে আমি আমার চারপাশকে রোমান্টিসাইজ করছি? টিচারদের, এই নারীদের অসহায়তাকে দেখতে গিয়ে তাদের মহিমান্বিত করে তুলছি?

কালীঘাটেরই একটা স্কুলের টিচার মিনতি। ও সেদিন গল্প করছিল। ওর বৌদির ভাই-এর সঙ্গে বৌদিকে দেখতে যাচ্ছিল নার্সিং হোমে, বাচ্চা হওয়ার পর। বৌদির ভাই সম্পর্কে আর কিছুই বলেনি মিনতি। কিন্তু বলাকালীন ওর চোখ, মুখ, শব্দ উচ্চারণের সঙ্কোচ থেকেই বোঝা যাচ্ছিল অন্য একটা কন্টেক্সট, রাস্তায় মিনতির ইস্কুলের বাচ্চারা ওকে দেখে 'দিদিমনি, দিদিমনি' বলে চেঁচাচ্ছে। বৌদির ভাই বলল, তোমায় ডাকছে নাকি?

'আমি বললাম দূর, আমায় কে চিনবে এখানে? ভাবুন, ন্যাংটো ন্যাংটো সব ছেলে, রাস্তায় ঘুরছে, নাক দিয়ে শিকনি ঝরছে—আর আমি তাদের দিদিমনি। আমি বাবা কাউকে বলি না, না পাড়ায়, না বাড়িতে।

'দিদির বিয়ের পর সবাই গেল কালীঘাট। শাঁখা পরাতে। আমি বললাম, আমি কিছুতেই যাব না। বলল, চল, গাড়ি করে যাচ্ছি সবাই। আমি বললাম, রোজ যাই—আমার আর ভালো লাগে না। গেলাম না। যাই আমি, আর শেষে ওই ছেলে গুলো যদি আবার ডাকাডাকি করে, 'ওই' পাড়ায়।'

'একদিন ট্রামে করে যাচ্ছি আমরা দুজন। আমি আর আমাদেরই সেন্টারের একজন টিচার। সামনের সিটে বসেছি দুজনে, বেশ ফাঁকা ট্রাম। একটা ছেলে গঙ্গায় চান করে ভিজে জামাকাপড়েই ট্রামে উঠেছে, মায়ের সঙ্গে। আমাদের দেখিয়ে বলছে 'অঙ্ক দিদিমনি', 'বাংলা দিদিমনি'। বলেই যাচ্ছে, বলেই যাচ্ছে। শেষে আমাদের অস্বস্তি দেখে এক ভদ্রলোক, বুঝতে পারেননি যে আমরা সত্যিই তাই, বলল, তবু তো সম্মান দিচ্ছে, দিদিমনি বলছে, খারাপ কিছু তো বলেনি।'

'ইস্কুলে গিয়ে খুব বকলাম ছেলেটাকে। বলল, তুমি চিনতে পারলে না কেন তখন? এখন বকছ?'

মিনতির এই গল্প শুনতে শুনতে শুধু বাচ্চাটার না, বাচ্চাটার মার প্রতিক্রিয়াও আমার মাথায় আসছিল। সেই মহিলাটির মুখ কতটা কালো হয়েছিল, তার সন্তানের টিচার নিজের টিচারত্ব স্বীকারে অসম্মান বোধ করায়? কতটা ডিগনিটির অভাব বোধ করেছিল মা-টি? ডিগনিটি? শব্দটাই বোধ হয় আউট অব কন্টেক্সট। নইলে সেই সমস্যা তো মিনতিরও অন্য টিচারদেরও। সেই কাজ করে চলা, করেই চলা, যা বাড়ির লোকের সামনে স্বীকার করা যায় না, প্রেমিকের সামনে উচ্চারণ করা যায় না। সেই ছাত্রদের টিচারি করা, রাস্তায় দেখলে যাদের কিছুতেই ছাত্র বলে স্বীকার করা যায় না। একটা লজ্জা, একটা হীনতা।

শুধু মিনতি কেন, সব টিচারেরই তাই। বাড়িতে অফিসের কাউকে নিয়ে যায় না, পাছে বাড়িতে জেনে ফেলে। বাড়িতে অন্য কিছু বলে। কত কিছু। স্কুল এখনও পার্মানেন্ট হয়নি, হবে, এরকম কত কিছু। টিচার এই শব্দটায় সে সামাজিক পরিচিত আছে, সেইটায় পৌঁছতে চায়। ওই স্কুলের টিচারি মানে যেন 'কমিউনিটির' বস্তির একজন হয়ে পড়া।

এক কল্পনাদি একটু অন্যরকম। কেন? কল্পনাদি বাধ্য হয়ে এই কাজ করতে আসেনি বলে? শুধু রিটায়ার্ড সরকারি অফিসার স্বামী নন, ভেল-এ কর্মরত প্রবাসী পুত্র এবং নৈহাটিতে শ্বশুরের রেখে যাওয়া অনেক জমি। আমি এদের জন্য কাজ করছি, যেমন মিশনারিরা করত এনলাইটেনমেন্ট, লাঘব করত তাদের হোয়াইট মেনস বার্ডেন, সেইরকম আমি এদের জন্য করছি কিন্তু আমি কিছুতেই এদের একজন নই, একথা নিজের কাছে স্পষ্ট ভাষায় কল্পনাদির উচ্চারণ করার ক্ষমতা আছে বলে? আমার কেন নেই? বস্তিতে কাজ করা নিয়ে কোনও লজ্জা, হীনতা তো দূরের কথা, একটা চাপা গর্ববোধ করি—কেন?

নাকি ওই হীনতা আর গর্ব দুটোই একই জিনিসের দুটো নাম? গর্ব, কারণ পাপমুক্ত হচ্ছি, অগরীব হওয়ার, অসাবঅলটার্ন হওয়ার পাপ? জুডিও ক্রিশ্চিয়ান পাপবোধ—সেই হোয়াইট মেনস বার্ডেন? আর আমার বাম রাজনীতির হেরিটেজ, সেটাও কি ওই একই জায়গা? মানবদার ক্লাসে, ইকনমিক্স অব মার্কস স্পেশালের ক্লাসে, কত চুলচেরা বিচার তর্কাতর্কি হত। হোয়াট ইজ টুবি ডান-এর সেই বিখ্যাত কোটেশনাংশ—ওয়ার্কিং ক্লাস কনশাসনেস ইজ ব্রট টু দি ওয়ার্কিং ক্লাস ফম উইদাউট। এই উইদাউট এর সংজ্ঞা, বুর্জোয়া সায়েন্স বলতে কী বোঝায় এই সমস্ত কিছু নিয়ে তর্ক। দেবব্রত সবসময়ই নকশালী কথাবার্তা বলত। ও বলেছিল উইদাউট বলতে লেনিন হেগেলীয় উইদাউট এর কথা বলেছেন। মার্ক্স-এর মত লেনিনও হেগেলীয় কুসংস্কারে ভুগত, হেগেলের ভুত, স্পেক্টর অফ হেগেল। যে কুসংস্কার পরে পুরোটাই পেল, শুধু ভুত টুকুই পেল, ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি, সুইজি ডব কনফর্থ থম্পসন। পুরো মাল্লটাই বদ হজম হয়ে গেল, নইলে ক্লক টাইম দিয়ে অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার মাপে? এত হেগেলীয় হয়ে গেল যে হেগেলও বুঝল না। লেনিনও রোমান্টিসাইজ করল, ক্যাপিটালের প্রথম চ্যাপ্টার মার্ক্সের পরে আর কেউ বোঝেনি, গত একশ বছরে কোনও মার্ক্সবাদী নেই এইসব বলে। তোরা ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির বমি পড়ে মার্ক্স শিখছিস, তোরা বুঝতেই পারবি না, উইদাউট কে বুঝতে হবে অ্যালথুসের দিয়ে, গ্রামশির ফল্‌স্ কনশাসনেস দিয়ে। এই নিয়ে প্রদীপ-দেবব্রতর প্রায় মারামারি। লুকাচ অন্টলজি অফ সোশাল বিয়িং এ এঙ্গেলস এর না-বোঝা নিয়ে যে ক্রিটিক করেছেন সেটা ঠিক না বেঠিক? ফ্র্যাংকফুর্ট স্কুল বা অ্যাডোর্নো কতটা রেলিভ্যান্ট? এখন ভাবলে কেমন নস্টালজিয়া হয় সময়টার জন্যে। কত উত্তেজনা ছিল, একটা গতি।

উইদাউট বলতে যাই বোঝাক, সেটা অন্য একটা হেজেমনির পার্ট হোক বা নাই হোক, কমিটমেন্ট বলতে, দায়বদ্ধতা বলতে, রিলিজিয়াসনেস বলতে নিজের ভিতর যা পরিব্যাপ্ত থাকতে দেখছি তার ভিতর একটা 'ফ্রম অ্যাবভ' ডাইমেনশন আছেই। যেন একটা কলোনি, কমিউনিটি বা বস্তি, তার উপর দিয়ে উড়ে যেতে মেতে দেখছি। সুনীল গাঙ্গুলির এরকম একটা লাইন ছিল না, হেলিকপ্টারের জানলা দিয়ে বন্যা দেখতে যেও না ইন্দিরা, এ বড় বিপজ্জনক খেলা। এরকমই কিছু একটা। আবার সুনীলের আনন্দবাজারেই জীবনবন্দর লাইন দিয়ে ইন্দিরাকে বর্ণনা করেছিল, 'দ্রোণফুল, লেগে আছে মেরুন শাড়িতে তার। ছোটবেলার স্মৃতি। পুরোটাই মনে আছে। ইস্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে রাস্তায় দেখলাম একটা ক্ষ্যাপাটে শিখ একটা টেম্পোয় চড়ে, টেম্পো তো আজকাল দেখিইনা, মাইক হাতে নিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে যাচ্ছে, আমেথিমে সঞ্জয় গান্ধী হার গয়া, রায়বেরিলিমে ইন্দিরা গান্ধী হার গয়া, কেউ বিশ্বাস করছে না। তারপর মাঝরাত্তিরে, রাত্তির তিনটের সময় ছোট রেডিওয় বিবিসি শুনে বাবার উন্মাদ চিৎকার। গাঙ্গুলি কাকুকে ঘর থেকে বার করে, সেই রাত্তিরেই লাফালাফি আমাকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলেছিল বাবা, বিবি, কাল তোকে কালীঘাটে বলি দেব। আর কিছুই তেমন বুঝিনি, শুধু একটা বদ্ধ আতঙ্ক কেটে গিয়ে হাওয়ায় একটা মুক্তির স্ফূর্তি আর দেখতে দেখতে চোখের সামনে সেই ইন্দিরাই কেমন মহাপুরুষ হয়ে গেল। মহানারী।

বস্তি, কমিউনিস্টগুলোকে এই কলোনি অ্যাস্পেক্ট থেকে দেখলে লেফট্ পলিটিক্স এর সঙ্গে এনজিওগুলোর সম্পর্কের টেনশনও ব্যাখ্যা করা যায়। রাজনীতি করাকালীন, শচীন সেনের কন্সটিটুয়েন্সিতে কাজ করার সময় এই টেনশনকেই দেখেছি সম্পূর্ণ উল্টোদিক থেকে। বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে হাজরা রোড ধরে ল্যান্সডাউনের দিকে যেতে, শচীন সেন মারা যাওয়ার পর এখন বোধহয় রবীন দেবের কন্সটিটুয়েন্সি, ওখানে গড়চা রোড ডোভার লেনের পচা বাড়িগুলোর পাশ ঘেঁষে অনেক বস্তি। 'হেলা' বস্তি, অনেকগুলো অবাঙালি বস্তি। রাস্তা পেরিয়ে ওপারে কেয়াতলা বস্তিও ওই একই কন্সটিটুয়েন্সিতে। কেয়াতলা বস্তি অবশ্য কতটা বস্তি বলা যায় কে জানে? বোধহয় এমন কোনও ঘর নেই যার মাথায় টিভি অ্যান্টেনা নেই। ওই বস্তিগুলোয় অনেকগুলো এনজিও কাজ করে। এ এস পি আর-ও। তখন তাদের কমপিটিটর বলে মনে হত। একটা সন্দেহ, কী গন্ডগোল এরা পাকাচ্ছে কে জানে, মাথায় ঘুরত। এনজিওর গাড়ি বা লোকজন দেখলেই। সবার মধ্যেই। আরও আসামের যুক্তিগুলো তখন বাতাসে। 'বঙ্গাল খেদা' আসলে পুরোটাই মিশনারিদের কনককটেড, বানানো। 'বঙ্গাল খেদা'র চূড়ান্ত সময়গুলোতে গুয়াহাটির চায়ের দোকানে, সিগারেটের দোকানেও নাকি ডলার ভাঙানো যেত। ইত্যাদি। পশ্চিমী দেশগুলোর, 'আমেরিকার সাহেবদের এত দরদ কীসের এদেশের গরিবদের জন্যে? আর এনজিও-রা তো টাকা পায় বিদেশ থেকেই। তখন এনজিওদের নাম ছিল ভলান্টারি অরগানাইজেশন। তার থেকে শ্লেষসূচক ভোল্টু। পার্টি আড্ডাগুলোয় একজনকে না একজনকে সবসময়ই পাওয়া যেত, সে কলকাতায় মোট কত লোক ভোল্টু মারফৎ সিয়ার পে-রোলে আছে তার হিসেব দিতে পারে। দুজন নামী বাঙালি নাট্যকার পরিচালকের একজন সে তার গ্রুপ থিয়েটারের ছেলেদের ডয়েশমার্ক ভাঙিয়ে পয়সা দেয় আর অন্যজনের গ্রুপের ছেলেরা সব কোনও না কোনও মিশনারি স্কুলে চাকরি করে, এবং সে, যখনই ভারতের বাইরে যায় তখনই তার সঙ্গে থাকে একজন নামী দাগী সিয়ার গুপ্তচর, সেসব জানতে পেরেছিলাম। এর পুরোটাই সে বানানো তাও মনে হয় না। কিন্তু আসল হল অস্বস্তি, আনসার্টেনটি, সংশয়, এই এনজিওদের সামনে দেখলেই। দাড়িওলা একজন ছিলেন, বোধহয় ক্ষিতীশ চৌধুরী। আমরা ক্ষিতীদা বলতাম। বিরাট চেহারা। তিনি প্রথম থেকেই আমায় একটু অপছন্দ করছিলেন। প্যাটার্নের পার্থক্য। আরও ইউনিভার্সিটি ইউনিট থেকে ইলেকশনের কাজ করতে সরাসরি ব্র্যাঞ্চ লেভেলে পাঠানোয়। কোনও গণ আন্দোলন না করেই ডিম ফুটেই এরা সব নেতা হবে এইরকম ভাবতেন বোধহয়। স্টুডেন্ট ফ্রন্টের লোকজনের প্রতি লোকালের লোকজনের যেমন অপছন্দ থাকেই। আমি একদিন জিনস আর পাঞ্জাবি পরে গিয়েছিলাম বলে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন, জিনস পরে চুইংগাম খেতে খেতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব করা যায় না। যদিও আমি চুইংগাম কোনওদিনই খাই না। ভদ্রলোককে আমার বেশ ভালোই লাগত। ডোর-টু-ডোর ক্যাম্পেন শেষে একদিন ফিরে এসে পোস্টার লেখাকালীন খালি গা হওয়ায় দেখেছিলাম প্রশস্ত পুরুষ পিঠে দাগড়া দাগড়া ক্ষতচিহ্ন, পুলিশ আর কংগ্রেসি মস্তানদের করা। এখন এই ডাইরি লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের প্রতি বোধহয় আমার মাইল্ড ইনফ্যাচুয়েশনই ছিল। দুধর্ষ মেল ইমেজ। অবিবাহিত, অত্যাচারিত, বীর। তারপর চে গুয়েভারা দাড়ি। গুয়েভারার মতই একটু প্লাম্প।

ক্ষিতীদা একদিন ভাঁড়ে চা খেতে খেতে, বিড়ি খেতে

খেতে, বিড়ির বিটার পানজেন্ট কিন্তু সেনসুয়াল গন্ধ, বলেছিলেন, 'শালারা হেলা-বস্তিতে টাকা ছড়াচ্ছে'। 'শালারা মানে একটি এনজিও। 'সুব্রত মুখার্জির সঙ্গে ডাইরেক্ট চেন'।

আবার এর উল্টোটাও দেখছি। শুধু এএমপিআরে না। সায়নী বলছিল প্রাকৃতেও একই রকম। এনজিও ফোরামের মিটিং-এ কিড এর সুরত্না আর ফ্রন্টিয়ার-এর আলাউদ্দিন, দুজনেই অভিযোগ করেছে লেফ্‌ট পার্টির পক্ষ থেকে ওদের অসুবিধা সৃষ্টি করা হচ্ছে কাজ করার। লোন রিপেমেন্টের জন্য, এনজিও-র থ্রু দিয়ে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট বাড়ানোর জন্য যে লোন দেওয়া হয়, সেই টাকা চাইতে গেলেই নাকি পার্টির লোকেরা শিখিয়ে দিচ্ছে লোন ফেরত দিতে হবে না, এগুলো সব ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের টাকা। ইত্যাদি এনজিও-তে কাজ দেওয়ার সময়, পরে, বারবার সাবধান করে দেওয়া হয়, খুবই ওপনলি, পার্টির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রেখো না, কোনও সাহায্য নিও না, কোনও যোগাযোগ রেখো না, এইসব। এলাকার পার্টির ছেলেদের সঙ্গে কখনও কোনও বিষয় আলোচনা করবে না। ওরা সবসময়ই ঢুকে পড়তে চায়, ইউনিয়ন করতে চায়, সবকিছু নষ্ট করে দেবে। যেটুকু করে খাচ্ছ তাও চলে যাবে। কোনও একটা এনজিও সুব্রত মুখার্জির থেকে কখনও টাকা খেতেও পারে, আবার নাও পারে। আবার কোনও একটা পার্টির লোক কখনও কাউকে বলতেই পারে, টাকা ফেরত দিতে হবে না। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। গণ্ডগোলটা অন্য জায়গায়।

একজন ভালো পার্টিকর্মীর বা ভালো এনজিও কর্মীর বস্তির মানুষের সঙ্গে, কমিউনিটির সঙ্গে সম্পর্কটা একই রকমের, পথপ্রদর্শকের। গণ্ডগোলটা এখানেই, কারণ পথদুটো আলাদা। অন্টলজিকালি লেফ্‌ট পলিটিক্স অস্তিত্বের মূল ভিত্তি বলে যাকে মনে করে সেই ইকনমিককে প্রশ্ন করে। প্রশ্ন করে ইডিওলজিকাল, পলিটিকালকেও। ইন্টারোগেট করে। ভাঙতে চায়। বদলাতে চায়।

এনজিওদের ভূমিকা বরং গ্যাপ ফিল আপ করার। ইকনমিক, পলিটিকাল তাদের মত থাকুক। কিছু ইনডিভিজুয়ালের বাঁচার কতকগুলো ন্যূনতম পূর্বশর্ত তাদের হয়ে জোগাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করা। মার্কেট মেকানিজমের লেভেলে পাওয়ার আর সাবঅলটার্নের ভিতর একটা যোগাযোগ, কিছু রিলিফ এনে দেওয়া। সম্পর্কটা একেবারেই ইন্টারোগেশনের নয়। ম্যাক্সিমাম একটা অনুযোগ, ঈশ্বর বা প্রভু বা সরকার তোমার আর একটু ভালো হওয়ার কথা ছিল। বরঞ্চ কাজ করতে পারার কারণেই এনজিওকে পাওয়ারের সঙ্গে পারতপক্ষে ভালো সম্পর্ক রাখতে হয়। এইখান থেকেই পুরো গণ্ডগোলটা। এই গণ্ডগোলটা মেটানো যায় না? এখন, যখন সবকিছুই বদলে যাচ্ছে? এইচ ডি এফ সি, মর্ডান ক্যাপিটালিস্ট একটা কনসার্ন প্রত্যেক মাসের শুরুতে মেগাপলিসে মেগাপলিসে বড় বড় হোর্ডিং করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, এ মাসে গৃহপ্রবেশের শুভ দিন কোনগুলো। হিস্টরি আর থিয়োরি নিয়তই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, হ্যারিয়েট ফ্রাডের বই এর ভূমিকায় গায়ত্রী চক্রবর্তী যেমন লিখেছেন। হিস্টরি অনুযায়ী প্রিক্যাপিটাল জ্যোতিষ মূল্যবোধ ক্যাপিটালের অ্যান্টি থিসিস। তারা তো বেশ মিলে যাচ্ছে হাউসিং ডেভলপমেন্টের বিজ্ঞাপনে। পাওয়ার যদি মেলাতে পারে, সাব অলটার্ন মেলাতে পারে না তার নিজের বেঁচে থাকার স্বার্থে?

সায়নী আমার থেকে খুবই ডিফারেন্ট। কোনওদিন রাজনীতি করেনি। করার কথা ভাবতেই পারে না। মিডলটন রো লরেটো থেকে সরাসরি প্রেসিডেন্সি, তারপর এম-এও প্রেসিডেন্সিতেই। মেধা পাটকর, কিরণ বেদি, মার্টিনা নাভ্রাটিলোভার ফ্যান। সাংবাদিক হতে চায়, ঘুমোয় নিজের ফানস্কুল টেডির সঙ্গে। ও আর আমি মিলে, আরও অনেকে, আমরা একটা এনজিও বানাতে পারি না? যেখানে এই ডিফারেন্ট ধরনের কমিটমেন্ট মিলে যেতে পারে?

এনজিও-গুলো যা টাকা পায় তাতে যারা যুক্ত তাদের রিজনেবল জীবনসংস্থানের পরও যথেষ্ট কাজ করা যায়। এই এএমপিআর থেকে অন্যরকম, সুরত্না, আলাউদ্দিন এদের থেকে অন্যরকম একটা এনজিও। আমার, সায়নীর, অরূপের, মিতার—আমাদের একটা কাজ করার জায়গাও হয়। কলেজের চাকরির অপেক্ষা করলাম, প্যানেলে ঝুলে রইলাম অষ্টাশি থেকে পঁচানব্বই এই সাতবছর, পার্ট টাইম পড়ালাম আজ আটবছর চলছে। কিছু তো হল না। নিজের মত কিছু করতে পারি না? নিজের মত করে কিছু একটা? যা ব্যাঙ্কের চাকরি নয়, আমলার চাকরি নয়, তার থেকে অন্যরকম কিছু।

ডাইরিতে এই কথাগুলো লিখছি আর একটা অচেনা উত্তেজনা ঘটছে আমার কানে গালে হাতের আঙুলে। পেনের উপর হাতের চাপ বেড়ে যাচ্ছে।

একটা স্বপ্ন। একটা উত্তেজনা। অনেক ছেলে, অনেক মেয়ে। একসঙ্গে কাজ করছি। একটা মেইনফ্রেম। অনেক, অনেকগুলো টার্মিনাল। অনেক ডেটা। সারা কলকাতা। সারা এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা। ঘানা থেকে, ইথিওপিয়া থেকে, পেরু থেকে ওখানের এনজিওদের লিটারেচার ইমেইল-এ চলে আসছে আমাদের হাতে। কালো হলুদ বাদামি। ভ্যারিয়েশনস অন দি থিম অফ ননহোয়াইটনেস।

অর্জুন সেন বুঝতে পারেনি আমারও কিছু করার আছে। রাতুল দত্তও পারেনি। ছাত্রনেত্রী হওয়ার, রাতুল দত্তর নোট বিক্রি আর টিউশনির প্রতিবাদ করার মূল্য বুঝে নিয়েছিল ইকনমিক্সের হেডডিপ রাতুল দত্ত, মরা তেলাপিয়া মাছের মত চোখ তুলে পলিটেকনিকের লেকচারারের ইন্টারভিউতে আমায় একটা প্রশ্নও না করে। বলেছিল, বায়োডাটা তো রইল—প্রয়োজন পড়লে জানাব। এদের সবাইকে আমার একটা কিছু জানানোর আছে। দেবব্রত আমাকে প্যারানয়েড ভেবেছিল। ভাবুক। পুরুলিয়া শহরের একজন মাস্টারমশাইএর নামহীন গৃহবধূ হতে আমি চাইনি, চাইনি, চাই না।

অনেকক্ষণ পেন নামিয়ে রেখেছিলাম। আজ অনেকটা সময় পেয়েছিলাম নিজের মত। মা গেছে ছুটিকে নিয়ে। শুভর ছেলে হয়েছে। তিনকেজি দুশো। এতক্ষণে ফেরার সময় হল। ওপাশের ডিভানটা এখন দিদিমার খাট। সেটা থেকে নেমে দিদিমা মেঝেয় শুয়েছে। মেঝের ঠাণ্ডা থেকে যতটুকু আরাম। একটু আগে ডানদিকে কাত হয়ে শুয়ে লাল শান করা মেঝেতে আঙুল নড়াচ্ছিল, বারবার, একই নকশায়। যখন খুব যন্ত্রণা করে, অসহ্য, দিদিমা তখন নামজপ করে আর আঙুল দিয়ে অদৃশ্য অক্ষরে দেওয়ালে কি বিছানায় কি মেঝেতে লিখতে থাকে। সাতটি সন্তানের মা, জরায়ুতে অসুখ ছিল, প্রত্যেকবার সন্তান জন্মানোর পর অসহ্য কষ্ট পেত, অনর্গল রক্তপাত হত বহুদিন ধরে। একজন সরকারি ইঞ্জিনিয়রের স্ত্রী, যার স্বামী চিরকাল বাইরে বাইরে থেকেছে, তারপর ছেলেমেয়েরা অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকতেই মরে গেছে। এখন ছেলের বৌদের সঙ্গে থাকতে পারে না দিদিমা। সামনাসামনি কোনও অশান্তি নেই। মুখেও কখনও কিছু বলে না। কিন্তু এখানে থাকতেই পছন্দ করে, ছেলেরা যথেষ্ট বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও। শরীরব্যাপী ক্যান্সারের যন্ত্রণা। লাং ক্যান্সার প্রথমে ম্যানিফেস্ট করল ডান হাতের আঙুলে। আঙুলটা পাকল, ফেটে গেল। তারপর এখন চোখের আর কানের যন্ত্রণা। কান থেকে রক্ত পড়ছে কদিন হল। দিদিমা তার ক্লিষ্টতার রক্তমোক্ষণের এই নারী জীবনে কী পেল? কৈশোরে, চোদ্দ বছরে বিয়ে হওয়ার এবং পনেরোয় প্রথম সন্তান হওয়ার আগে দিদিমা কবিতা লিখত। একটা কবিতা প্রবাসীতে ছাপাও হয়েছিল। কী পেল দিদিমা?

ওরা এসে গেছে—সামনে একটা ট্যাক্সি থামল।'

৯।।

এএমপিআর-এ ইন্টারকম বসল। নানা বাড়িতে ছড়ানো ছেটানো ঘরগুলো মূল বাড়ির সঙ্গে, পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হল। ঘর বদলাল। কে কোন ঘরে বসবে, কোন ঘরে কে কে এই সমস্ত সাংগঠনিক অদলবদল। এইজন্যে দু চার দিন একটু বেশি থাকতে হল শর্মিষ্ঠাকে। অন্যদেরও। আবার আইএলও-র অফিসারদের ইন্সপেকশন আসছে।

রাগী সুবর্ণা একদিন বলল, 'ইন্সপেকশন? ওসব আমায় দেখিও না। একবছর হল কাজ করছি এখানে, সব জেনে গেছি।' বলল, ডক্টর রায় ঘাঘু অ্যাডমিনিসট্রেটর, মিষ্টি কথায় সব ঠিক বুঝিয়ে দেবে। এখানে সব ধান্দাবাজি, হোয়াট দে পে ইজ পিনাটস। নেহাত ওর বাবা বাঁশরী সান্যালের বাড়ির হাউজ ফিজিসিয়ান, সেইসূত্রে। আর আর একটা সোশাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনে ও কাজ করছে, তাদের অবশ্য গ্রেড অ্যান্ড ট্রেড আছে, পুরোটাই বিদেশী টাকা, তাই স্কেল ছুটি সবই সেরকম, আবার সন্ধ্যায় বাবারই চেম্বারে বসা, মধ্যিখানে এক ঘন্টার জন্য ও কি আনোয়ার শা রোডে, ওদের বাড়িতে ফিরে যাবে? সেইজন্যেই এখানে করছে। সব জানে ও। এই যে অডিট গেল, আর অত চপবাজি, হল কিছু? অডিটরেরও তো বউয়ের জন্য চারটে শাড়ি চাই। চিকেন চাউমিন আর হুইস্কি চাই।

হুইস্কি শব্দটা এমন একটা টোনে বলল যাতে শব্দটাই বিজাতীয় অ্যালিয়েন কিছু বলে মনে হয়। তৃণাঞ্জন সাংবাদিক, সাংবাদিকরা সচরাচর অমদাপ হয় না, এরকম অচেনা হওয়ার কথা না সুবর্ণার। আসলে রাজনৈতিক বাড়িতে লিকারের প্রতি একটা অ্যালার্জি থাকেই। রুচিশীল, ফর্সা, ভদ্র অনামেরিকানতা।

'অডিটার আসায় বলল আপনি কি মনে করেন হরলিকস কমপ্ল্যান খেলে নারিশমেন্ট বাড়ে? আমি বললাম আমি মনে করি না, প্রেসক্রাইবও করি না, যত সব মাল্টিন্যাশনালের থার্ড ওয়ার্ল্ড ট্র্যাশ। এএমপিআর যদি ভাত মাছের ঝোলের বদলে, কাঁচকলার বদলে ওদের হরলিকস কমপ্ল্যান খাওয়ায় তাতে আমার কী? অবশ্য এএমপিআর-ও ওগুলো কেনে খাতায় কলমে। পঞ্চাশটা ধরলেই মাসে আড়াই হাজার, তাই বা বাদ দেবে কেন? যা পাই তাই খাই। অডিটার এলেই দেখবে তাদের জামাই খাওয়া খাওয়ানো হচ্ছে। আমার লেটারহেডে ওই দালালগুলোর একজনকে দেখে প্রেসক্রাইব করতে বলেছিল—আমি বললাম, যান—আমার রেজিস্ট্রেশন নম্বর নিয়ে যান।'

সুবর্না এই কথাগুলো বলে। রাগ থেকেই বলে। মিতা নূপুর এদের সামনে তো বটেই, অতসীর সামনেও। টিচারদের সামনেই বলে : বাঁশরী সান্যালকে এই টিচাররা এত সাংঘাতিক ভয় পায়, এদিকে বাঁশরী সান্যাল তো বাড়িতে বসে নির্দেশ দেয়, স্কুলে যায়ও না, টিচারদের প্রতি বাঁশরী সান্যালের কোনও সিমপ্যাথি নেই।

কিন্তু এইসব বলে লাভ? মৌসুমী, পার্ক সার্কাস আইপেক স্কুলের টিচার, সেদিন বলল, 'ডাক্তাররাও গরিব হয়। নইলে এএমপিআর-এ আসে আমাদের মত? আমি ভাবতাম ডাক্তার মানেই অনেক টাকা তাদের।'

সুবর্নাই বা কী করবে? পোস্টিংও হচ্ছে না। একদিন গল্প করছিল ওর মেডিক্যাল কলেজের এক প্রফেসরের কথা। সিনিয়র ডাক্তার হয়ে পড়ানো ছেড়ে টাকার জন্যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করল। নার্সিং হোমটা একজন ডাক্তারের, মারোয়াড়ি, আগে ওই প্রফেসরেরই ছাত্র ছিল। স্যারকে ডেকেছে নার্সিং হোম করতে, নিজে ব্যবসা করে, বিশাল শিপিং ম্যাগনেট। সারাদিন ডকে—কী আসছে, ডক থেকে কী ছাড়ছে, নার্সিং হোমে যতক্ষণ থাকে হাতে কর্ডলেস ফোন, শুধু ফোন আসছে। এই নার্সিং হোমে কিছুদিন কাজ করেছিল সুবর্ণা। সেই মালিক যে ছাত্র ছিল সে ঘরে ঢোকা মাত্রই স্যারকে উঠে দাঁড়াতে হয়। 'কী ভালগার, ভাবো শর্মিষ্ঠা। আমি রাগ করায় বললেন, নানা ও লোক খুব ভাল। ধুর, এর চেয়ে শালা সরকারি চাকরি ভালো। একখানা নাইট, দুটো অ্যাডমিশন ডে বা ইভনিং রাউন্ড। এতটাও কেউ দেয় না কলকাতায়। কাজ নেই তবে রিস্ক বেশি। পাবলিক। আমার মনে হয় রুরাল পোস্টিং ভালোই লাগবে, কী বলো, কলকাতায় পাওয়া যা লাইনের ব্যাপার, এই ধরো সোনারপুর টোনারপুর। তবে তার চেয়েও রুরাল হলে মুশকিল।'

সামনেই আই এল ও থেকে ইনস্পেকশন, জোসেফ আসবে, আইপেক প্রোগ্রামের ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর। আরও অন্যরা। সেইসময় ডাক্তার ব্যাপারটা খুব ভাইটাল। অজিত রায় সুবর্ণাকে ফুলটাইম হয়ে যেতে বলেছে। দু হাজার দেবে, এক হাজার এর জায়গায়। তবে অন্য বেনিফিট আর পাবে না। বেনিফিট মানে ছুটি, যখন খুশি আসা-যাওয়া। সুবর্ণাও সময় বুঝে আজকাল যেখান থেকে খুশি ফোন করে গাড়ি পাঠাতে বলছে। আজ বলছে পার্ক স্ট্রিট পৌঁছে দিতে। কাল মেডিকেল কলেজ।

শর্মিষ্ঠার মনে হয়, সুবর্ণাকে বললে কেমন হয়, নিজের, নিজেদের একটা এনজিও করার ব্যাপারে তার ভাবনাচিন্তার বিষয়ে। কাজটা বোধহয় খুব একটা শক্তও নয়। এখন তো সকলেই একটা করে এনজিও করছে। ফ্রস্টিয়ার এর এক্সিকিউটিভ বডির প্রত্যেকেরই দু তিনটে করে এনজিও। ওদের মূল যে আলাউদ্দিন, তার শুনেছে নিজেরই সাতখানা এনজিও। আলাউদ্দিনের ছেলে ফ্রস্টিয়ার-এর এল ডব্লু এস, লুথেরান ওয়ার্ল্ড সার্ভিস প্রোজেক্টের একজন টিচারকে বলেছে, আগে আমরা গরিব ছিলাম, এখন তো পাপা বড়লোক, একটা ভিসিআর কিনেছে। সেই টিচারের আবার বন্ধু এখানের একজন টিচার। আলাউদ্দিন লোকটা বুদ্ধিমান, ধারালো দুটো চোখ, শক্তপোক্ত কালো শরীরে একধরনের একটা ব্যক্তিত্বও আছে। দেখলেই বোঝা যায় প্রচুর ভাইটালিটি।

শর্মিষ্ঠা ঠিক করে সুবর্ণার সঙ্গে কথা বলবে, একজন ডাক্তার সঙ্গে থাকলে ভালোই হয়। সায়নীর সঙ্গে টেলিফোনে কথাও হয়েছে। সায়নীর হয়ত সুবর্ণাকে একটু লাউড লাগবে। লাগুক। ডাক্তারদের এত পড়তে হয় এমবিবিএস-এ, এত চীৎকার করে পড়তে হয় যে তাদের একটু লাউড হওয়ার অধিকার আছেই।

এর মধ্যে একজন নতুন টিচার এল। অনিতা আইচ। স্কুল দেখে ফিরে এসে অন্য একজন টিচারের কাছে বলেছিল, স্কুল মানে এরকম জানলে ও আসতই না। যতসব পয়সা বাগাবার ধান্দা। কর্মক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন দেখে এসেছিল। টিচারের বিজ্ঞাপন বেরোয় কর্মক্ষেত্রে। সুপার ভাইজার বা অন্য পোস্টের জন্য স্টেটসম্যানে।

অনিতার কথা বলার ভঙ্গীটাই অন্যরকম। শর্মিষ্ঠা যেচে আলাপ করল। প্রথম দিনেই, জয়েন করার দিনেই যে আসতে একটু দেরি হবে বলেছে, সেটা কেন, তা জানতে চাইল।

'মিটিং আছে, ডালহাউসিতে।'

শর্মিষ্ঠার বুকের ভিতরটা কেমন একটা ধক করে উঠেছিল: আবেগ, নস্টালজিয়া? নাকি কোনও অচেনা আত্মীয় পেয়ে যাওয়া?

'রাজনীতি করেন, কোন ফ্রন্ট?' নিজের মনে মেলানোর চেষ্টা করে শর্মিষ্ঠা। ছোটখাট শক্তপোক্ত চেহারা—বেশ একটা দীপ্তি আছে। মহিলা ফ্রন্ট হলে ভীষণ বয়সের ছাপ থাকে। আবার ছাত্রর কমবয়েসি তীক্ষ্ণতাও নেই। নিশ্চই যুব। বা সিটু, নিদেন কো-অর্ডিনেশন।

'আমি ব্যানার্জী-পন্থী। মমতা। মমতা তো আর একদিনে মমতা হয়নি। ওকে আমরাই মমতা করেছি।' শর্মিষ্ঠা কি নিজের ভিতর একটা দম ফুরিয়ে যাওয়া অনুভব করে?

'আমার সঙ্গে মমতার তুমি-তুমি সম্পর্ক। অনিতা আইচের নাম করবেন, সবাই চেনে। এই বছর তিনেক একটু কম সময় দিতে পারছি। নইলে আমি সারাদিন কাজ করতাম।'

শর্মিষ্ঠা একটা বিস্মিত কৌতূহল অনুভব করে নিজের ভিতর, চেনার একটা ইচ্ছে, কংগ্রেসের লোকেরা ঠিক কেমন হয়, ব্যক্তি হিসেবে? একসময় তো কেমন অ্যালিয়েন, বিজাতীয়, রিপালসিভ একটা অনুভূতি হত, কাউকে কংগ্রেসী শুনলেই। 'মমতা মেয়ে খুব ভাল। কাজের। কিন্তু কাজ করবে কী করে? চারদিক থেকে চাপ। ভিতর থেকে, উপর থেকে। সোমেন আর সুব্রত তো সত্যিই তরমুজ—ভিতরে ভিতরে লাল।' আচ্ছা অনিতা তার মুখ দেখে কিছুই বুঝতে পারছে না? 'ফ্রন্ট' শব্দটাতেও তো ধরা উচিত ছিল। নাকি কংগ্রেসের লোকেরা অত ভাবেই না? 'বাড়িতে এখন একটু দরকার পড়েছে, তাই এখানে এলাম। বাড়িতে মা আমার দিকে। এমনিতে হয়নি, করতে হয়েছে, ভাই যে সিপিএম। মাসতুতো ভাইও এলসিএম। ইলেকশনের সময়টময় কথা বন্ধ হয়ে যায়। খুব খারাপ সম্পর্ক হয়ে যায়। অবাক দিদি তো যতই হোক।' প্রচুর কথা বলে যায় অনিতা। কেন এত কথা বলে? শর্মিষ্ঠাকে কি ওর ভালো লাগছে? কেন?

অনিতা বলে চলে। ওর মেয়ের বয়স দু বছর দশ মাস। মায়ের কাছে রেখে বেরোয়। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয় না। বিয়ের পর রাজনীতির কাজও বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তাই ছাড়াছাড়ি। সন্তোষপুরে থাকে অনিতা, জানাল, ওই এলাকা থেকে মমতাকে বার করে আনতে কম পরিশ্রম করতে হয়নি। অনিতাও সিঁদুর পরে না, সেই অর্থে বিয়েটাই তো আর নেই।

শর্মিষ্ঠাও বিবাহিত, মেয়ে আছে, তাও, সিঁদুর পরে না দেখে জিগ্যেস করল 'আপনি ব্রাহ্ম?' না শুনে চুপ করে গেল। কী ভাবল কে জানে? হয়ত জিগ্যেস করতে চাইছিল, আপনারও কি স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি? জিগ্যেস করলে কী উত্তর দিত শর্মিষ্ঠা?

ডায়রিতে অনিতার কথা লিখতে লিখতে শর্মিষ্ঠার মনে হয়েছিল, তার সঙ্গে অনিতার কত জায়গায় মিল। নাকি মিলটা আসলে তাদের দুজনের নয়, যে কোনও মেয়ের সঙ্গে যে কোনও মেয়েরই?

একদিন এনজিও ফোরামের মিটিং হল। কিড-এর অফিসে। কে আই ডি কিড। যে কথাটার প্রথম অক্ষর নিয়ে কে আই ডি সেটা একটা জার্মান কথা বলে শুনেছে শর্মিষ্ঠা, যার মানে দুর্গত বাচ্চা, চাইল্ড ইন ডিসট্রেস। জার্মান ভাষায় কিন্ডের মানে বাচ্চা না? সেই গানটা 'উই হ্যাড জয় উই হ্যাড ফান, উই হ্যাড সিজনস ইন দি সান'-এ ছিল 'টুগেদার উই ক্লাইম্বড হিলস অ্যান্ড টিজ/ কিন্ডের হার্টস অ্যান্ড কিন্ডের নিজ/লার্নড অফ লাভ অ্যান্ড এবিসিজ।' লাইনগুলো কি ঠিক মনে পড়ছে?

জার্মান বলে শুনেছে। জার্মান না হয়ে ওটা সুইডিশও হতে পারে। কারণ কিড-এর প্রেসিডেন্ট-এর বউ সুইডিশ। ইউ এন ওতে চাকরি করে। প্রেসিডেন্ট ডক্টর মৌলিক নামেই বাঙালি, বাংলা বলেন আটকে আটকে, ইংরিজিতেও একটা কন্টিনেন্টাল অ্যাকসেন্ট থাকে। কিড-এর সমৃদ্ধির একটা মূল কারণ সেইটা: মিসেস মৌলিক।

কিড-এর অফিসের দিকে যেতে ডানদিকে একটা বিরাট দীঘি। পদ্মপাতা ভাসছে। দীঘিটা ঘুরে যেতে হবে। দুপাশে চমৎকার আলো লাগানো কংক্রিট রাস্তা। লম্বা লম্বা বড় বড় গাছ। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ল্যান্ডস্কেপ বলে মনে হয়। বাঁদিকে বিরাট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট এর বিল্ডিং। এই লাইব্রেরিতে কয়েকবার এসেছে সে আর দেবব্রত। কিছুটা বেড়াতেও। লাইব্রেরির কাজ সারার পর এই দীঘির পাড়ে বেঞ্চে বসে থাকা। এই লাইব্রেরি থেকে ফুকোর ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ ঝেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল দেবব্রত। পেটের মধ্যে বইটা ঢুকিয়ে ফাঁকা লাইব্রেরি থেকে করিডোর অব্দি চলে এসেছিল। তারপর হয়ত পানিশের ভয়ে, হয়ত শর্মিষ্ঠার ডিসিপ্লিন সংক্রান্ত উপদেশে ফেরত গেছিল। পরে বারবার বলত, নিতে দিলে না, অথচ বইটা ওখানে পচছে, কেনার পর প্রথম বছরে একবারও ইশু হয়নি। তপনদার দোকান থেকে কিনে শর্মিষ্ঠা পরে প্রেজেন্ট করেছিল। এত রেফারড, অথচ বইটা কখনও পড়ে উঠতে পারেনি শর্মিষ্ঠা, এত বীভৎস: জ্যান্ত মানুষের ঘোড়া লাগিয়ে হাত পা ছিঁড়ে নেওয়ার, পেটের ভিতর জ্বলন্ত ধাতু ঢেলে দেওয়ার বর্ণনা।

তখনও অন্যেরা আসেনি, অনেকটা আগে এসে পড়ায় একটা নাটকের শেষটুকু দেখতে পেল শর্মিষ্ঠা।

কিড-এর একটা চিলড্রেন্স হোম আছে। জানবাজারে। আস্ত একটা বাড়ি। সামনে কংক্রিটের স্ল্যাবে রিলিফে লেখা 'বাচ্চাদের বাড়ি', বাংলা অক্ষরে। পাশে স্টাইলাইজ বাচ্চা মেয়ে আর বাচ্চা ছেলের ছবি। অনেকটা নিচে ছোট ইংরেজি অক্ষরে 'কিড'। পথবাসী বাচ্চাদের জন্য। মেয়ে বাচ্চারা রাতে থাকে।

সেখানে অনেক মেয়ের ভিতরই একজন পূজা। হোমে মেয়েরা থাকে, খেতে পায়, পড়াশুনো করে, খেলা করে। সুইডিশ টাকা। পুরো বাড়িটায় কোনও আসবাব নেই, সব কাজ হয় মেঝেয়। মাদুর আর ডেস্ক। কিড পুরোটাকে ইমপ্রেসিভ করে তুলতে জানে, আরও বিদেশীরা কিসে ইমপ্রেসভ হয়: ওরিয়েন্টাল।

মেয়েদের টাকার কোনও দরকার পড়ে না। তাও ওরা টাকা চায় ওদের ছেলে বন্ধুদের কাছে, আকবর, ম্যালকম, ইত্যাদি: ক্রমবয়সমান লুম্পেন প্রোলেতারিয়েত, সামনের ফুটপাথেই ঘুমোয়। বয়স বছর চোদ্দ পনেরো ছেলেগুলোর, কেউ রিকশা সারাই-এর কাজ করে, কেউ মোটর গ্যারাজে। মেয়েদের টাকার দরকার পড়ে নেশার জন্য, গুল কিনে খাবে। কাল রাতেও গ্রিল-এর ফাঁকে দিয়ে হাত বাড়িয়ে আকবর পূজায় হাত ধরেছিল এবং দু টাকা দিয়েছিল। অনেকবার বারণ করা হয়েছে, শোনেনি, তাই কাল শেষ অব্দি পুলিশে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ ওর পায়ে পঞ্চাশ ঘা মেরেছে। খুঁড়িয়ে হাটছে। টলছে।

কিড-এর অফিসে ঢুকলো শর্মিষ্ঠা, তখন অভিমানে কান্নায় চেঁচাচ্ছে আকবর। সুরত্না ওকে বোঝাচ্ছে। ওরা নিজেদের লোক হয়ে কিনা পুলিশে দিল। কলকাতায় আর ও থাকবে না। ওর বাবা আর বাবার বৌ কলকাতায় থাকে। ও দেশে গিয়ে চাচার কাছে থাকবে। ও শুধু জানতে চায় পূজাকে ওখানে রাখা হবে, না অন্য কোথাও পাঠানো হবে? মুখ নিচু। পূজা ওর বোনের মত, তার গায়ে কেন হাত দেবে ও? ওকে কেন গুল সিগারেট খাওয়ার টাকা দেয় আকবর, সুরত্না এই প্রশ্ন করায় একবার মুখ তুলে তাকাল। চোখে জল। আবার মুখ নিচু।

শর্মিষ্ঠার জানুর কথা মনে পড়ল। জানু শেখের গল্প অনেক শুনেছে। চোখে দেখেনি কখনও।

কিছুক্ষণ গল্প করল সুরত্না আর শর্মিষ্ঠা। তার মধ্যে উচ্চবিত্ত বাড়ির গৃহিনীর মত আদুরে গলায় সুরত্না ওদের একটি কর্মচারীকে কফি আনতে বলল, 'মনোহরদা, একটু কফি খাওয়াও না আমাদের।' কফি আর চানাচুর এল।

সুরত্নাকে তার ভালোই লাগে। বেশ স্মার্ট। দেবব্রত পুরুলিয়ায় থাকে শুনে বলল, 'বরকে ছাড়া থাকো কী করে, আমার তো দমবন্ধ লাগে।' 'দমবন্ধ' শব্দটার ভিতর পুরো সেক্সটাকে এনেছিল সুরত্না। ছাপ ছিল ওর বম্বেতে বড় হয়ে ওঠার, ছাপ ছিল বম্বেতে গ্রুপ থিয়েটার করার অভিজ্ঞতার। কলকাতার কোনও মেয়ে এভাবে বলত কি? সুরত্না গল্প করছিল ওর রিসেন্টতম মুসিবৎ-এর। ওর দিদি উটি বেড়াতে গেছে। কুকুর বব '—'কে দিয়ে গেছে সুরত্নার কাছে। সুরত্না বাড়ি গিয়ে দেখে বড় মেয়ে রিঙ্কি ঘরের দরজা বন্ধ করে পড়াশুনো করছে, ক্লাস সিক্সে পড়ে, সামনে এক্সামস, আর ছোট মেয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে রেখে পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে বসে ভিসিআরে কমিকস দেখছে। আর বব কোথাও নেই—কী কাণ্ড। 'ছোট মেয়েকে কাল খুব বকেছি—এই বয়সেই এত প্রেম করা কিসের?'

সুরত্না এনজিও আর তাদের কাজের ডোমেইনটাকেও চেনে। বেশ ভাল করেই চেনে। এখানের এখন মূল দুজন, ডক্টর মৌলিকের পরই, সুরত্না আর পর্ণা ওদের এনজিও কেরিয়ার শুরু করেছিল টিচার হিসেবে। পুরো এশেলনটাকেই জানে। এরকম কাউকে একটা যদি সঙ্গে পাওয়া যেতে পারত নিজে এনজিও করার উদ্যোগে, বেশ হত। কিন্তু সুরত্না নিশ্চই নিজের জায়গায় সন্তুষ্ট। কিড এএমপিআর নয়, ভালোই পে করে। নিশ্চই জব স্যাটিসফ্যাকশনও পায়। আর সত্যিই কাজ হচ্ছে কিনা, কতটা হচ্ছে, কিংবা হয়ে কী হল, এসব প্রশ্ন সুরত্নার ভিতর আছে বলে মনে হয় না।

সুরত্নার সম্পর্কে সে এরকম ভাবছে এটা নিজেরই ভালো লাগে না শর্মিষ্ঠার। প্রশ্ন, উত্তর খুঁজে না পাওয়া এগুলো মানুষ বোধহয় নিজে নিজে বানিয়ে তুলতে ভালোবাসে। মিথ। নিজেকে নিয়ে মানুষ এত মিথ বানায়, বিশ্বাস করে আর শেষ অব্দি অন্যকেও বিশ্বাস করায়। আসলে মানুষ কাজ করে বোধহয় নিজের জন্য। একটা লেবেল খোঁজার ডিজায়ার থেকে। নিজের জন্য একটা খোপ খোঁজে। একটা খোপ যেখানে নিজেকে রেখে, নিজেই নিজেকে একটা নামে ডাকা যায়, প্রতিমা করে তোলা যায়। করে কী হয়, এই প্রশ্নটা কিছুতেই নিজেকে করতে চায় না শর্মিষ্ঠা। এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই, শুধু ধূধূ শূন্যতা, শুকনো নিষ্পত্র মাঠের উপর দিয়ে একটা পাখিও ওড়েনি, একটা মাছিও রৌদ্রে উড়ে আসেনি, হাঁটো হাঁটো, হাঁটার কোনও মানে নেই, কোনও মানে নেই, কোথাও কোনও জল নেই। জলে বিবর্ণ প্রাসাদের ছায়া, জলে সোনালি আগুন, জলের ভিতরে আভা দহে যায়, জলের ভিতরে এই অগ্নির কোনও মানে বোঝা যায় না, শুধু ঢের দূর ভূমিকার পর নমুণ্ডের হেঁয়ালিকে মাথায় নিয়েই নিদ্রা যেতে হয়।

ফোরামের আজকের এই মিটিংটা আইপেক প্রোগ্রাম কীভাবে পপুলার করা যায়, আরও মানুষের কাছে, পাবলিসিটি, ক্যাম্পেন এইসব নিয়ে। কোন এনজিও কী করবে, কীভাবে করবে, কী কী কাজ হবে এই আলোচনা। সায়নীও এসেছে। সায়নী আগেই বলে রেখেছিল শর্মিষ্ঠাকে, একটা ওয়ার্কশপ হবে, একটা সেমিনার, সেই দুটোর জয়েন্ট দায়িত্ব কিড আর প্রাকৃত এর। কিড স্বাভাবিকভাবেই বিগ রিচ ব্রাদার হওয়ার সুবাদে পুরো প্রচারটাই নিজে নিতে চাইছে, মিটিং-এ বিবিদি যেন তাকে সাপোর্ট করে। টেলিফোনটা হাতে থাকা অবস্থাতেই বেশ একটা ষড়যন্ত্রের আনন্দ পেয়েছিল শর্মিষ্ঠা। সেই পুরোনো সময়ে মিটিং-এ বসে নিজের ডিসিশন পাকা করিয়ে আনার টেকনোলজি। সেই অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লেগে যাওয়ার উত্তেজনা।

মিটিং-এর শুরু থেকেই নিজের সাপোর্ট বেস বাড়িয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা আগে থাকতেই ছিল শর্মিষ্ঠার : সুযোগ এসে গেল প্রায় মিটিং শুরু হওয়া মাত্রই। আইএলও, হয়ত নামের ভিতর লেবার শব্দটা থাকাতেই, ইন্ডাস্টিটিউসান হিসাবে একটু র‍্যাডিকাল। আইএলও চাইছে ট্রেড—ইউনিয়নগুলোকে ইনভল্ড করতে এই আইপেক প্রোগ্রামে। অন্তত এনজিওগুলো তাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করুক। তারপর ট্রেড ইউনিয়নগুলো যা করার করুক। এই ইশুটা ওঠা মাত্রই শর্মিষ্ঠার মাথায় একটা প্ল্যান লাফিয়ে উঠল। ব্যাকড্রপ হিসাবে কাজ করল ফ্রন্টিয়ার এবং খিদিরপুরের এনজিওগুলোর বিরাট মুসলিম উপস্থিতি। আরও এতটা সাউথে উত্তরের এনজিওগুলো কমই এসেছে। এলেও একজন করে। ফ্রন্টিয়ার এর পাঁচজন এসেছে। আলাউদ্দিন, মুস্তাফা গাউস আর তবানুম নিসা মিনি তিনজনকে চেনে শর্মিষ্ঠা। অন্য দুজনও নিশ্চয়ই মুসলিম।

'এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড, এখানে আমার একটা কথা আছে, অন্য ট্রেড ইউনিয়ন, সিআইটিইউ, আইএনটিইউসি, এআইটিইউসি—এগুলোয় আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু বিজেপি ট্রেড ইউনিয়নকে ডাকার বিষয়ে আমার আপত্তি আছে, ডিসটিংকট অ্যান্ড পজিটিভ। অ্যান্ড আই থিংক এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনার দরকার আছে।' একটু থেমে থেমে, শব্দে একটু বেশি স্ট্রেস দিয়ে বলল শর্মিষ্ঠা।

সুরত্না স্পষ্টই একটু আঁতকে উঠল। 'ও গড, ইউ আর টকিং লাইক এ পলিটিশিয়ান।'

হাসি পেয়ে গেল শর্মিষ্ঠার। হাসল মিষ্টি করে, বিনয়ী, মেজার্ড। পুরো মিটিং জুড়ে একটা আনইজি সাইলেন্স।

'বাট হোয়াই', বলল সুরত্না।

'আই ডোন্ট ওয়ন্ট টু গো ইনটু দি ডিটেইলস অ্যান্ড ইনট্রিকেসিজ অফ দি পোলিটিকাল প্রসেস, বাট দি থিং ইজ দ্যাট, ইউ নো, বিজেপি দাঙ্গা বাধায়, দাঙ্গা করে, অ্যান্ড ইনোসেন্ট পিপল ডাই। আই অপোজ টু দি ভেরি সাজেশন অফ ইনভাইটিং দেম, ইয়েস আই ডু, আই ডু।' কথা বলতে বলতেই নিজের কান গরম হয়ে যাওয়া টের পায় শর্মিষ্ঠা। এতটা, এতটা রাগ ছিল তার বিজেপির উপর, নিজের মনে?

'কিন্তু দাঙ্গা তো সব পার্টিই, করে। অল অফ দেম আর ইনভল্‌ভড ইন ইট।' কিড এরই পর্ণা সুরত্নার সাহায্যে আসে।

'দ্যাট ইজ সাম আদার কোয়েশ্চেন। অ্যান্ড লুম্পেনস ডু বিলং টু নো পার্টিস, নো পার্টিস অ্যাট অল। দ্যাটস এ ডিফারেন্ট পয়েন্ট। কিন্তু বিজেপি ইজ এ পার্টি দ্যাট সিম্পলি প্রিচস অ্যান্টি মুসলিমিজম, সরাসরি এরা অ্যান্টি-মুসলিম কথা বলে।'

'আই থিংক ইউ আর টকিং অন বিহাফ অফ ইয়োর বডি, আই মিন, এএমপিআর।' শ্লেষ, মৃদু শ্লেষের গলায় বলে সুরত্না।

'অ্যাট লিস্ট ইউ হ্যাভ টু অ্যাশিউম দ্যাট, অ্যাজ দেয়ার ইজ নো ওয়ান আদার প্রেজেন্ট হিয়ার, ডোন্ট ইউ?' শর্মিষ্ঠা অবাক হয় সুরত্না এত আপত্তি করছে কেন? ওকে দেখলে একটুও পলিটিকাল বলে মনে হয় না। ওকে বিজেপি বলে কিছুতেই ভাবা যায় না। আসলে ওর বোধহয় অদ্ভুত, অবস্থিওর, রিডিকুলাস লাগছে এই পুরোটা। অন্য এনজিও-র কাউকে এতটা লাইমলাইটে চলে আসতে দেখতেও বোধহয় ওর ভালো লাগছে না।

চারপাশে তাকায় শর্মিষ্ঠা। সবার চোখ ওর দিকে—এই মনোযোগ পাওয়ার অনুভূতিটা ভীষণ ভালো লাগে ওর। চোখের মতামতগুলো সহজেই পড়া যায়। নিজেকে মনে মনে মৃদু হেসে বলে শর্মিষ্ঠা : ওকে, বেবি, ক্যারি অন।

মিটিং এর সিদ্ধান্তগুলো এতটাই বেশি নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করে শর্মিষ্ঠার দ্বারা যে, সায়নী যেটা চেয়েছিল, যে ব্যাগে করে সেমিনারে লিফলেট, ফোল্ডার, প্যাড, কিড এর একটা প্রোপাগান্ডা ক্যাসেট এসব দেওয়া হবে, খরচ কিড-এরই, সেই ব্যাগের গায়ে কার এমব্লেম থাকবে, কিড এর কিনা, এই প্রশ্নে শর্মিষ্ঠা বলে, কোনও একটা এনজিও-র নয়, এমব্লেমটা থাকবে এনজিও ফোরামেরই। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই ওকে সাপোর্ট করে। পর্ণা বলার চেষ্টা করে, সেটা একটা বিরাট এমব্লেম, দ্যাট উড লুক অড, এইসব। কেউ পাত্তা দেয় না।

সায়নী শর্মিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে হাসে : কৃতজ্ঞ, ঠোঁট টিপে দুর্লক্ষ্য মাথা নাড়ে।

কিড এর মুস্তাফা গাউসের বোধহয় তাকে বেশ ভালো লেগে যায় এই মিটিং জুড়ে, কারণ চলে আসার সময়, ফ্রন্টিয়ার এর অন্যরা তখনও রয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মুস্তাফা গাউস উঠে আসে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে, বেহালার এনজিও প্রগতি-র বিলাসবাবু আর সায়নীর মত। বিলাসবাবুর সঙ্গে শর্মিষ্ঠার বেশ একটা বন্ধুত্ব হয়ে গেছে, এবং আশ্চর্যের কথা বন্ধুত্বটার শুরু একটা ডিম-খাওয়াকে কেন্দ্র করে।

এনজিও-ওয়ার্কশপ হচ্ছিল আইপেক প্রোগ্রামের উপর। দায়িত্বে ছিল ফ্রন্টিয়ার। সারাদিনের। সকাল থেকে সন্ধে অব্দি। এনজিও ব্যাপারটা মাঝমাঝে শোবিজ বলে মনে হয়, এত ভান, প্রিটেনশন এর প্রতিটি ক্রিয়ার পরতে পরতে গোঁজা থাকে। ফ্রন্টিয়ার সবার জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করেছিল প্যাকেট, প্যাকেটে রুটি তরকারি ডিমসেদ্ধ একটা কলা। এমন নয় যে এর চেয়ে বহুগুন ভালো খাবারের ব্যবস্থা করার সাধ্য ফ্রন্টিয়ারের নেই। আসলে সবাইকে বোঝানো যে ফ্রন্টিয়ার কত কেজো, ওয়ার্কম্যানলাইক। তার বিলাস কত কম। আবার এটা জানা কথা যে এনজিও-ওয়ার্ল্ডের এলিটদের ফ্রন্টিয়ার থেকে রুটি তরকারি দেওয়া হতে পারে না। তাই অন্য একটা প্যাকেটের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল, বিরিয়ানির। যেন সেটা সারাদিন যারা কাজ করেছে, অর্গানাইজার, প্রচুর পরিশ্রম করেছে তাদের জন্যে। ফ্রন্টিয়ার এর নিজের বেশিরভাগই এই বিরিয়ানির প্যাকেট খাচ্ছিল। এবং বহিরাগত যারা, ইউনিসেফ থেকে বা সাংবাদিক, আইএলও তো বটেই, আর এনজিও জগতের চকচকে যারা, সুরত্না ইত্যাদি, তাদের হাতেও পৌঁছে যাচ্ছিল এই দ্বিতীয় প্যাকেট। রুদ্রাংশু ব্যানার্জি, রাণু দাশগুপ্ত ইত্যাদি মানুষেরাও, যারা কেউ সরকারি পদজনিত কারণে, কেউ কে জানে কেন, কেউ ক্যাপার্ড-এর সঙ্গে যোগাযোগের কারণে এনজিও মহলের বিভিন্ন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেন। চকচকে এবং ক্ষমতাবান, অর্থাৎ যোগাযোগ সম্পন্ন। শর্মিষ্ঠার নিজেও যথেষ্ট ইংরিজি বলে, যথেষ্ট গতিতেই বলতে পারে, তাই তার কাছেও এসে যেতেই পারত দ্বিতীয় প্যাকেট। ঝটপট প্রথম প্যাকেট থেকে রুটি বার করে তরকারিসহ ও খেতে শুরু করে। লাঞ্চব্রেকে নানা দিকে নানা জটলা যেমন তেমনি শর্মিষ্ঠার জটলায় এএমপিআর-এর এর অতসী ছাড়া বিলাসবাবুও ছিলেন। চোখের সামনে জাতিভেদের এই ভালগারিটি বাতাসে একটা বিষণ্ণতা এনেছিল। শর্মিষ্ঠার খুব কষ্ট হচ্ছিল। অসহায়তার বোধের কষ্ট। অতসী যে রুটি তরকারির প্যাকেট খুলতে অস্বস্তি পাচ্ছে, খুলবে কি খুলবে না : খোলাটা কি অপমান, এই দৃশ্য বিষণ্ণতা এনেছিল। আলাউদ্দিন, যাকে কিছুটা পছন্দ করতে ওর ইচ্ছে করে,

তেলতেলে মুখে একটা দ্বিতীয় প্যাকেট হাতে নিয়ে রুদ্রাংশু ব্যানার্জির সামনে হেঁ হেঁ করছে অদূরেই এটাও ওকে কষ্ট দিচ্ছিল। সবচেয়ে কষ্ট পাচ্ছিল বিলাসবাবুকে দেখে। ওনার কিছু এসেই যাচ্ছে না, খাওয়া থেকেই এভিডেন্ট ওনার খিদে পেয়েছিল। কে একজন একটা দ্বিতীয় প্যাকেট পেয়ে যাওয়ায় প্রথম প্যাকেটটা ওনাকে দিয়ে দিল, উনিও অবলীলায় নিলেন, খাচ্ছেন। একটু আগে ওনার হাতে ব্রিফকেসটা দেখছিল শর্মিষ্ঠা, কোনগুলো ক্ষয়ে গেছে, তবু ব্রিফকেস তো নিতেই হবে ঃ স্ট্যাটাস। ব্রিফকেসটা একবার খুলেছিলেন, ভিতরে কিচ্ছু নেই, ফাঁকা, শুধু একটা খবরের কাগজ, হয়ত পুরোনো, আর একটা ছোট চকচকে অ্যালুমিনিয়মের কৌটো, হয়ত নস্যি বা লবঙ্গের। আর আজকের ওয়ার্কশপ থেকে দেওয়া ফোল্ডারগুলো। সব এনজিও প্রোগ্রামেই দেখা হয়, বিলাসবাবুকে আগেই চিনত, শুকনো একটু ক্ষয়াটে চেহারা, পয়সা বা পড়াশুনো কোনও প্রিভিলেজের ছাপই নেই, একটা মানুষ দারিদ্রের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে, নানাভাবে, বাঁচতে তো হবেই, হয়ত একটা ছেলে আছে যার পরীক্ষার ফি জোগাড় করতেও কষ্ট হয়, এরকম কোনও মানুষ তো অসহায়তা ছাড়া, অনন্যোপায়তা ছাড়া এনজিও করতে আসে না। গুমোট ভার অসহায়তাটা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল শর্মিষ্ঠা। কিছু একটা, কিছু একটা করে যে করে হোক।

একবার, দুবার ঠুকলো সিদ্ধ ডিমটা পিছনের দেওয়ালে। কে জানে কেন খোলাটা ফাটল-না। কীরকম একটা এলোমেলোত্বে পড়ে শর্মিষ্ঠা, বোকার মতই, ডিমটা এনে ঠোকে তার বাঁ কবজির ভিতর দিকে ঘড়ির ব্যান্ডের আটকানোর ধাতব পাতটায়।

বিলাসবাবুর বলে উঠলেন, 'আপনি করছেন কী—ডিম ছাড়াতে পারছেন না?'

নিজের মুখের বোকা হাসিটা আর একটু বোকার মত করে তুলে শর্মিষ্ঠা ডিমটা বিলাসবাবুর হাতে দিল, 'দিন না একটু', বলল একটু বেশি ছেলেমানুষিতে, যে সুযোগটা সে খুঁজছিল, পেয়ে গেছে।

চতুর্পার্শ্বস্থ সকলেই তখন ডিম-এপিসোডের ইন্টার্নালাইজড, সবাই হাসে। শুধু ফাটিয়ে নয়, পুরো খোলাটা ছাড়িয়ে দাদাপ্রতিমতার সঙ্গে শর্মিষ্ঠার হাতে ডিমটা দেয় বিলাসবাবু। 'সত্যি একটা ডিম ও ছাড়াতে পারেন না—কী যে করবেন?' এক মুহূর্ত হলেও, ভদ্রলোক তাকে বোন হিশেবে ভাবছেন, গলার টোন থেকেই বোঝা যায়, মানুষ তো কোনও না কোনও একটা মডেলেই প্রতিকৃতি হতে ভালোবাসে।

সায়নীর সঙ্গেও বিলাসবাবুর পরিচয় আছে, প্রাকৃত এর অ্যাকাউন্টসও দেখেন উনি, সামান্য কিছু টাকাও পান। অ্যাকাউন্টস ব্যাপারটা তো এনজিওগুলোতে সবচেয়ে ইমাজিনেটিভ এবং ক্রিয়েটিভ কাজ। প্রথমে উনি প্রাকৃতেই কাজ করতেন। তারপর সৃষ্টিশীলতার এই বিবিধ ব্যাকরণে অভ্যস্ত হয়ে আসার পর নিজেও একটা এনজিও খুলেছেন নিজের এলাকা বেহালায়।

ওরা চারজন হাঁটে ঃ কিডএর অফিস থেকে বাসস্টপ অনেকটাই দূরত্ব, পশ্চিম ইউরোপীয় কোনও শহরের সেই বুলেভার্ড দিয়ে।

গাউস বলে, 'শর্মিষ্ঠাদি, বুঝলেন, এসসিডি-র, সোসাইটি ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের ওই যে মেয়েটাকে দেখলেন, ও খুব ভালো মেয়ে। এর পরের ওয়ার্কশপ তো এএমপিআর-এ, ওকে আসতে বলব ওখানে, দেখা হলে, বুঝলেন?'

খুব সরল অমায়িক গলার বদমাইসিতে, এখন সবারই বেশ মুড ভাল, সায়নী বলল, 'ওঃ, আপনার গার্লফ্রেন্ড তো?'

একটু এলিয়ে পড়ে গাউস, একটু বোকাবোকা হাসে, এরকম ক্ষেত্রে সবারই যা করার কথা। আরও শর্মিষ্ঠা যতটা দেখেছে, মুসলিম ছেলেরা অনেকটা বয়স্ক নয় এমন নারীদের সঙ্গে ইন্টারাকশনে একটু অকওয়ার্ড থাকে, হয়ত অভ্যস্ততার অভাবেই।

এই টপিকটাই একটু লিংগার করাতে চায় শর্মিষ্ঠা, স্পষ্টতই বিষয়টা গাউসের কাছে খুবই রুচিকর, 'আচ্ছা—খুব ভালো মেয়ে বুঝি—তাহলে তো বলতেই হয়।' তারপর আবার বলে, 'আচ্ছা গাউস, আপনাদের ওই, ভারি চমৎকার নামটা, রান্নুম নিসা মিনি, ও ও তো খুব ভালো মেয়ে?'

হঠাৎই একটু গুটিয়ে যায় গাউস। দু এক সেকেন্ড ডুপ করে একটু? তারপর বলে, মাথাটা তুলে, কেমন একটা সিদ্ধান্তের গলায়, 'বুঝলেন শর্মিষ্ঠাদি, আমি ফ্রন্টিয়ার ছেড়ে দেব ঠিক করেছি। আর ভালো লাগছে না।'

একটা নৈঃশব্দ্য নামে। একটু বাদে বিলাসবাবু বলেন, 'কেন আপনাদের আলাউদ্দিন সাহেব তো খুব ভালোই চালাচ্ছে?' নিজের ভিতরও ছিল, তবু বিলাসবাবুর এই কৌতূহলের প্রকাশটা, গাউসের বিষণ্ণতার সুযোগ নিয়ে, ভালো লাগে না শর্মিষ্ঠার। তার উপর গাউস কমবয়েসি ছেলে, তাকে 'শর্মিষ্ঠাদি' বলে, এবং মুসলিম ছেলে ভাবতে গেলে খারাপ লাগে, তবু তার ভিতর একটা প্যাট্রনাইজিং না এসে পারে না।

'আপনার বাড়ি কোথায়, গাউস?' আক্রান্ত পুরুষের প্রতি নারী কোমলতায় জিগ্যেস করে শর্মিষ্ঠা।

'বাঁকুড়া, আমি তো বাঁকুড়ার ছেলে।' মুখ তুলে শর্মিষ্ঠার দিকে তাকায় গাউস। 'ক্যালকাটায় আছি কলেজ থেকে। তারপর পিজি, এলএলবি।

'ওঃ তুমি আইনপাশ, বাব্বা, গাউসদা তুমি উকিল।' শর্মিষ্ঠা যা করতে চেয়েও পারছিল না, শুধু তার কম বয়েসের অ্যান্ডভান্টেজে সায়নী সেটা করে দেয়। 'যাঃ, উকিল ভাবলেই আমার কেমন বিচ্ছিরি লাগে, কেমন ইন্টারোগেট করে, উকিলরা ভীষণ রুথলেস হয়।' সায়নীর প্রসঙ্গচয়ন থেকেই বোঝা যায় একবছরও হয়নি ওর ইউনিভার্সিটি পেরোনোর। আর ফ্ল্যাটে বড় হওয়া নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির কেয়ারড বাচ্চারা বড় হতে কি একটু বেশি সময় নেয়? অথবা এমন হতে পারে যে এদের বড় হয়ে ওঠার ফর্মটাই শর্মিষ্ঠার অচেনা।

'উকিল নানারকম হয়। জমিজমার উকিল হয়, ট্যাক্সের উকিল হয়, ফৌজদারি উকিল হয়। আর আইন পাশ করেই কি উকিল হয় নাকি? আমাদের আলাউদ্দিন-ভাইও তো ল-পাশ। বুঝলেন শর্মিষ্ঠাদি, আমাদের কমিউনিটিতে ছেলেরা ল-টা একটু বেশি পড়ে, জমিজমার ব্যাপার থাকে তো।' গাউস বলে।

'ও, আলাউদ্দিন সাহেবও ল-পাশ?' 'সাহেব' বলতে তার ভালো লাগছিল না, কিন্তু মনে মনে বলে 'বাবুটা এত বেমানান লাগল। আরও এইমাত্র বিলাসবাবু বলল।

'হ্যাঁ, লপাশ করে, এই ফ্রন্টিয়ার করছে।' একটু সামনে তাকিয়ে থাকে গাউস, শূন্যে। 'এখন তো বেশ ভালোই করছে। নিজের আলাদা চেম্বার করেছে। কাঁচ লাগানো দেওয়াল। সেই চেম্বারে শুধু আলাউদ্দিন বসে, আর একটা মেয়ে। ওর সেক্রেটারিই বলতে পারেন।' এবার গাউস আলাউদ্দিনের সঙ্গে 'ভাই'টা লাগায় না। ওর গলায় একটা ঈর্ষা থাকে। ঈর্ষা নয় ঠিক, হিন্দিতে বললে বলা যায় 'জ্বলন'। আলউদ্দিনের অফিসের-বড়-সাহেব ইমেজের প্রতি।

'এবার আমি বুঝলেন একটা অন্যরকম এনজিও করব', গাউস বলে। ফ্রন্টিয়ারএর সবারই নিজের নিজের এনজিও আছে, ফ্রন্টিয়ার সেই এনজিওগুলোর প্ল্যাটফর্ম গোছের। এনজিও মানে ছোটখাট ক্লাব। বস্তির বাচ্চাদের নিয়ে বছরে একবার হয়ত একটা কালচারাল অনুষ্ঠান করে, একটা স্পোর্টস। আর বড় কিছু ঘটলে, বৃষ্টিবন্যা, বা গ্যাস্ট্রোএনট্রাইটিস, এই যেমন বাগবাজারে ঘর পুড়ে গেল, বা পার্কসার্কাস চারনম্বর ব্রিজের পাশে স্কোয়াটার সেটলমেন্ট, ঝুপড়িগুলো ধ্বসে গেল, তখন রিলিফ—এইসব। 'এই চাইল্ড লেবার তো অনেক হয়ে গেছে। প্রসটিটিউট চিলড্রেনও হয়েছে। এখন এইডস হেভি গ্রান্ট পাচ্ছে। এইডস এর একটা বাজার আছে। আর ভাবছি অ্যাডাল্ট এডুকেশন একটা নাম্বাব। আমার একটা কোচিং সেন্টার আছে, বুঝলেন, আমি আছি, আমার এক বন্ধু আছে, ভাই আছে। বি কম দেওয়ার পর গ্রামে ফিরে যেত। তা কোচিং করছে টুকটাক। ওই কোচিং সেন্টারটাকে একটা অ্যাডাল্ট এডুকেশন এনজিও বলে চালিয়ে দিই, কী বলেন?'

গাউস আরও অনেক কথা বলছিল, শুনছিল ওরা। ওদের ভিতর সবচেয়ে বয়স্ক বিলাসবাবু অভিভাবকের গম্ভীর গলায়, বললেন, 'এদিকে বাস একটু কম, একটু তাড়াতাড়ি।'

আইএলওর অফিসারদের এএমপিআর-এ আসার দিন চলে এল। আজ শর্মিষ্ঠা অফিসে একটু তাড়াতাড়ি এসেছে। অন্যরাও তাই। মিতা শর্মিষ্ঠাকে ডাকল একটু, আলাদা কথা আছে।

ঘরের বাইরে গিয়ে মিতা বলল, 'স্যার কাল আমাকে বললেন, তোমাকে বলে দিতে, তুমি যেন বলো ওদের, যে তুমি এখানে পার্টটাইম করছ।' মিতা একটু ঘাবড়ানো চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'ঠিক আছে।' স্মিত হাসে শর্মিষ্ঠা। 'ডঃ রায় নিজে বলল না কেন?'

মিতা তাকিয়ে থাকে।

টিচারদের জনতা, অপেক্ষা করে আছে জিনিসপত্রের জন্য। প্রতিটি আইপেক স্কুলের জন্য প্লাস্টিসিন, রং, প্লেট, মেসোনাইট বোর্ড, আরও অনেক কিছু যা যা লাগবে বা লাগতে পারে, শিশুশিক্ষার জন্য, শ্রমিক শিশুদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য সমস্ত কিছু প্রতিটি স্কুলের টিচারদের আলাদা আলাদা করে দেওয়া হল। এগুলো এরা আবার আজই ফেরত আনবে, ইন্সপেকশন টিম চলে যাওয়ার পর। অন্য ইন্সপেকশনের দিন আবার লাগবে। এই স্কুলের, অন্য স্কুলের।

জোসেফ কেরালিয়ান। শর্মিষ্ঠা ভেবে রেখেছিল পরিচিত কেরালিয়ান চেহারাই দেখবে। বরং উল্টোটা, জোসেফ লম্বায় মাঝারি, একহারা চেহারা আর অসম্ভব ফরসা, এতটাই ফরসা যে ঠোঁট মুখ গোলাপি বলে মনে হয়। নিশ্চয়ই কেরলের উচ্চবর্ণ, অথবা ক্রিশ্চিয়ান যখন, হয়ত ইউরোপীয় রক্তের মিশেল, ভাবে শর্মিষ্ঠা। ঠিক কাজের কথার মুহূর্ত টুকু ছাড়া মুখে একটা স্মাইল, যে স্মাইলটার অ্যাবসলিউটলি কোনও মানে নেই। স্মাইলটা ঠোঁটে ধরাই আছে, যেন আঠা দিয়ে লাগানো। খোকনবাবু দু একবার অন্যের কথার মধ্যে দু একটা কথা বলতে যাওয়ায় বলল, 'ইউ প্লিজ ডু আনসার হোয়েন অ্যান্ড ওনলি হোয়েন আই হ্যাভ আস্কড ইউ', সেই সময়ে মুখে হাসিটা ধরা, এবং বলার ভঙ্গী এত শান্ত এবং বিনীত সে মনে হতেই পারে নেমন্তন্ন বাড়িতে অতিথি আপ্যায়ণ করছে জোসেফ। এটাই বোধহয় প্রোফেশনাল স্মার্টনেস, লোকটা পাওয়ার এক্সারসাইজ করতে জানে, জোসেফের সঙ্গে জোসেফের অরগানাইজেশন কাজ করার একটা লোভ শর্মিষ্ঠার মাথায় কাজ করেছিল কয়েক মুহূর্তে জন্যে।

জোসেফকে নিয়ে এল বাঁশরী সান্যাল, এএমপিআর-এর একমাত্র অ্যামবাসাডরে, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের গেস্ট হাউস থেকে।

একটামাত্র ইস্কুলেই যাওয়া হল, কল্পনাদিদের ইস্কুলে।

সেখানে বাচ্চাদের আগেই শিখিয়ে রাখা হয়েছিল, বলবি যে কাজ করি। কিন্তু কদিন আগেই এই স্কুলটাকে চালানো হয়েছিল ওয়ার্কিং ক্লাস মাদারের চাইল্ড-এর ক্রেশ হিসাবে। তখন ঠিক উল্টোটা শেখানো হয়েছিল বলতে। আর তখন বয়স কমিয়ে বলতে বলা হয়েছিল, এখানে আবার আইপেক এর বার আছে ছয় থেকে চোদ্দ।

দু একটা বাচ্চা গুলিয়ে ফেলল। তাও যে রেসকিউ করা যেত না তা নয়, কিন্তু সেইমুহূর্তে জোসেফ আর বাচ্চাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করছে মিতা : জোসেফ খর চোখে তাকিয়ে এবং জোসেফের ব্যক্তিত্ব, মিতা সঠিকটাই বলে ফেলল। আর এমন হতেই পারে যে জোসেফ অল্প স্বল্প বুঝতেই পারছিল, কারন হিন্দিটা জোসেফ মোটামুটি ভালোই বলে, আর এই বাচ্চাদের বাংলাও অনেকেরই হিন্দি হিন্দি বাংলা, কলকাতায় বাংলাভাষীর চেয়ে হিন্দিভাষী এখন বেশি, শ্রমজীবীদের মধ্যে তো বটেই।

জোসেফ ঘুরে দাঁড়ায়ে, বাঁশরী সান্যাল এবং শর্মিষ্ঠাদের দিকে তাকিয়ে সম্পূর্ণ অনুযোগহীন বিবৃতির ভঙ্গিতে বলল, 'ইউ আর নট মেইনটেইনিং দি এজ স্পেসিফিকেশনস অ্যান্ড দি কন্ডিশন কনসার্নিং ওয়ার্ক স্টেটাস।'

বাঁশরী সান্যাল জোসেফকে বোঝাল যে ওরকম ছাত্র কখনওই মোট ছাত্রের পাঁচ পার্সেন্টের চেয়ে বেশি হবে না, এবং এটুকু রাখতেই হয়, নয়ত কমিউনিটি অ্যাস্টাগনাইজড হয়ে যায়, আমাদের সব ছেলেমেয়েকে তোমরা নিচ্ছ না, তখন স্কুল চালানোই শক্ত হয়ে পড়ে।

জোসেফ আর পারসু করল না। শর্মিষ্ঠার কেন জানি মনে হল জোসেফ স্কুলের ব্যাপারটায় ততটা ইন্টারেস্টেড নয়, যতটা ইন্টারেস্টেড অফিশিয়াল বিষয়ে। হয়ত হাতে ততটা সময়ও নেই।

জোসেফ হঠাৎই জিগ্যেস করল, 'ওয়েল, দেন, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং টু এলিমেনেট চাইল্ড লেবার?' এবার স্পষ্টতই বাঁশরী সান্যালকে নয়। মিতা শর্মিষ্ঠাদের।

শর্মিষ্ঠা চাইল্ড লেবার এলিমেনেট করার কিছু সমস্যার কথা বলে। পভার্টি থার্ড ওয়ার্ল্ডে চাইল্ড লেবার পুরোপুরি এলিমিনেট করা ইজ নেক্সট টু ইমপসিবল। ইত্যাদি।

'বাট পভার্টি ইজ নট দি ওনলি কজ অফ চাইল্ড লেবার। আদারওয়াইজ হাউকাম চাইল্ড লেবার এক্সিস্টস ইন আমেরিকা অর ইউরোপ? এ চাইল্ড দেয়ার ওয়ন্টস টু বায় এ কার ফর হিমসেল্ফ অ্যান্ড দেয়ারফোর হি ওয়র্কস। অ্যান্ড আইপেক অবজেকটিভ ইজ টু এলিমিনেট চাইল্ড লেবার এভরি হোয়ার।'

'ইউ সি, প্রব্লেমস ডিফার ফ্রম ডিসিজ টু এলডিসিজ।'

'ওয়েল, কেরালা ডাজনট হ্যাভ মাচ অফ চাইল্ড লেবার বাট ইট ল্যাগস বিহাইন্ড ওয়েস্টবেঙ্গল ইন টার্মস অফ পারক্যাপিটা ইনকাম।'

'এডুকেশন মুভমেন্ট স্টার্টেড অ্যাটলিস্ট ওয়ান জেনারেশন ব্যাক ইন কেরালা অ্যান্ড দ্যাট কন্ট্রিবিউটস টু এ হাই এক্সটেন্ট টুওয়ার্ডজ দি লো ভলুম অফ চাইল্ড লেবার।

জোসেফ ও শর্মিষ্ঠার এই প্রায় তর্ক আরও কিছুক্ষণ চলল। জোসেফ চাইল্ড লেবারের পেরেন্টদের সঙ্গে কাউন্সেলিং করার কথা বলে, এদের পোশাক বই সাপ্লিমেন্ট ইনকাম দেওয়ার কথা, স্কুল থেকে বার করে মেইনস্ট্রিম এডুকেশন নিয়ে যাওয়ার কথা : খরচ আই এল ও-র, আসলে এটা একটা ইনভেস্টমেন্ট কারণ একটা মানুষ তার জীবনে গড়ে তিরিশ লাখ টাকা আয় করতে পারে, তার জন্যে এটুকু ব্যয় করাই যায়।

শর্মিষ্ঠা জিগ্যেস করে, 'হাউ ডু ইউ কনভিন্স দি পেরেন্টস অফ দি ওয়ার্কিং চাইল্ড, দি পেরেন্টস ফর হুম দি প্রেজেন্ট ইজ দি ওনলি টেন্স, দে আর আনএবল টু থিংক অ্যাবাউট দি ফিউচার।'

'দ্যাট ইজ ইয়োর জব।'

সবাই ওরা ফিরে আসে এএমপিআর-এ। বাঁশরী সান্যাল, জোসেফ অ্যামবাসাডরে। অন্যরা সবাই সেই না বাস না-ভ্যান গাড়িতে। সেই অন্যদের ভিতর, শর্মিষ্ঠা বুঝতে পারছিল, তার প্রতি সম্ভ্রম একটু বেড়ে গেছে। ওর একটু দুশ্চিন্তাও হচ্ছিল বাঁশরী সান্যাল-অজিত রায়ের প্রতিক্রিয়া কী হয় এই তর্কাতর্কিতে, ওরা যে পরিমাণ তেল দিয়ে চলেছে জোসেফকে। তারপরেই মনে হয় এরা তাকে ফায়ার করে দিলেই ভাল, তাকে আর নিজে ছাড়তে হয় না। সে তো নিজে এনজিও করছেই। সে, সায়নী; অন্য সবাই। ডাক্তারকে ইনস্পেকশনে থাকতেই হবে, পুরো সময়টাই ছিল, অথচ বিদ্রোহী সুবর্না আজ একবারও তার মুখ খোলেনি। নির্বাক ছিল প্রায়, পুরো সময়টাই।

জোসেফ, মহামান্য জোসেফ কফি খেলেন। বাঁশরী সান্যালের ল্যামেন্টেশন সহ সে এই ইনস্ট্যান্ট কফিই দিতে হল, ফিল্টার্ড কফি অ্যারেঞ্জ করা গেল না। জোসেফ তার সেই অর্থহীন স্মাইল মুখে নিয়ে মাথা নাড়ল। জোসেফের কফির সঙ্গে দেওয়া হল কাজুবাদাম আর মিষ্টি আনা হল নিকটতর 'মৌচাক' থেকে নয়, 'বাঙ্কারাম' থেকে : কোয়ালিটি।

জোসেফের সঙ্গে এসেছিল, আবার পরের দিন এল রাণু দাশগুপ্ত। প্রথম দিন কোনও কথাই বলেনি। জোসেফের সঙ্গে কী সূত্রে কে জানে, হয়ত জোসেফ বলেও থাকতে পারে সঙ্গে আসতে। রাণু দাশগুপ্ত কলকাতায় মডার্ন গার্লসে কয়েকবছর পড়িয়ে এখন দিল্লিপ্রবাসী। বাঁশরী সান্যালের কাছে থেকেই শোনা এগুলো। রাণু দাশগুপ্ত দিল্লি গিয়ে নতুন আর একটা বিয়ে করে রাণু কাপুর হয়, দিল্লিতে এলিট সার্কলে নিজের নাম বলে শুধু রাণু। আর কলকাতায় এসে রাণু দাশগুপ্ত। নিজের মূল ব্যবসা ভারতের বিভিন্ন হ্যান্ডিক্র্যাফটস বাইরে এক্সপোর্ট করা, এবং সেটার ইনকাম ট্যাক্স ব্যালান্স করার নিজের নিউ আলিপুরের বাড়িতে 'নালন্দা' নামের একটা টিচার্স ট্রেনিং স্কুল, এনজিওগুলোর নন ফর্মাল স্কুলের টিচারদের ট্রেইন করা হয়। কলকাতায় এসে নিজের দিল্লিবাসী স্বাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য অনর্গল সিগারেট খায়, যখন টানে না তখনও আঙুলে ধরা থাকে জ্বলন্ত সিগারেট। এনজিও জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী ইনডিভিজুয়ালদের একজন রাণু দাশগুপ্ত।

রাণু দাশগুপ্ত স্কুলে গিয়ে কথা বলাকালীন বারবার রেফার করছিলেন প্রাকৃত-এর কথা, প্রাকৃত-এর টিচাররা কত ভালো। পরে সায়নীর কাছ থেকে শর্মিষ্ঠা জানতে পারল প্রাকৃত এর টিচারদের নালন্দায় ট্রেইন করা হয়েছে এবং রাণু দাশগুপ্ত কলকাতায় এলেই অনাদি চক্রবর্তী তার বাড়ি গিয়ে বসে থাকে। এটা শুনে শর্মিষ্ঠার ভালো লাগেনি, তবে এটা হতেই পারে অনাদিদা যা গোবেচারা লোক, হয়ত মনে করে রাণু দাশগুপ্ত তাকে কী স্নেহ করেন। আরও প্রাকৃতেও কী একটা পাওয়ার গেম শুরু হয়েছে, রুদ্রাংশু ব্যানার্জির হাতে প্রাকৃত-এর টেকওভার আটকাতেই নাকি অনাদি চক্রবর্তী রাণু দাশগুপ্তর সঙ্গে আরও যোগাযোগ রাখছে।

যোগাযোগ রাখার ফলও মিলছে। পাঁচবার অন্তত বলল রাণু দাশগুপ্ত প্রাকৃত-এর কথা, জোসেফ এর সামনেও। গ্র্যাজুয়েট টিচার নেই, তাও কত ভালো কাজ করছে, কত কমিটেড টিচাররা। লিংক তো ঠিক এইটাই করে—প্রয়োজনীয় জায়গায় নামটাকে সাজেস্ট করে দেওয়া। রাণু দাশগুপ্তর মনে হয় ক্যাপার্ড এর ভালো যোগাযোগ, অন্তত ক্ষমতা আছেই, যে কনফিডেন্স নিয়ে বললেন, নালন্দা ইজ র‍্যাদার দি অফিসিয়াল ট্রেইনার অফ দি এনজিওফোরাম। এনজিও ফোরাম মানে সব এনজিওই, তারা ওকে পাত্তা দেবে কেন, ওর নালন্দাকে, যদি টাকার বিষয়ে ওর কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকে?

প্রচুর উপদেশ দিলেন রাণু দাশগুপ্ত। কমপ্রিহেনসিভ স্টাডি মেটিরিয়াল : শুধু ল্যাঙ্গোয়েজ বা ম্যাথস নয় ড্রয়িং, ক্রাফটস : ইনডিভিজুয়াল পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট অফ দি চাইল্ড। আইপেক লেসনস এর একটা পুল ফর্ম করা দরকার। আরও সেখানে আইপেক-এ কোনও স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বই নেই। একটা স্পেসিমেন লেসনকে, উইথ সাম পেজেস লেফট ব্ল্যাংক ফর লোকাল ভ্যারিয়েশনস কীভাবে এনরিজ করা যায়, লাইক 'এ বটগাছ ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল, অ্যান্ড এ ক্যামেল ফর রাজস্থান।' নিউয়ার ভোকেশনাল ট্রেইনিংস : নার্সিং, ম্যাসাজিং, ক্যাটারিং, বিউটিশিয়ান। 'টিচ দেম কারাটে, টিচ দেম ফুটবল, অর অ্যাকটিং, সেন্ড ডিফেন্স ফর দি গার্লস।'

শর্মিষ্ঠা নিজের ভিতর ভীষণ রেগে যাচ্ছিল।' কথা শুনতে শুনতে। তার কারণ শুধু এই নয় সে প্রায়ই স্কুল ফাইনাল-ন্যূন টিচারদের সঙ্গে রাণু দাশগুপ্ত প্রায় একটিও বাংলা শব্দ ব্যাতিরেকে ইংরিজিতে কথা বলে যাচ্ছিল এবং টিচাররাও কুকুরের লেজ-এর মত করে মাথা নাড়ছিল, কুকুরের কাছেও তো তার মনিবের মনুষ্যভাষা অবোধ।

শর্মিষ্ঠার মনে পড়ে যাচ্ছিল গত কাল জোসেফ চলে যাওয়ার অনেক পর সন্ধেবেলায় ইস্কুল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় মালতীদির হাউ হাউ কান্না, এতটাই এলোমেলো হয়ে পড়েছিল মালতীদি, সে বালিগঞ্জ স্টেশন অব্দি পৌঁছে দিয়েও, পরে শর্মিষ্ঠার কেবল টেনশন হচ্ছিল, কিছু হয়ে না যায়। অকারণই, কারণ এভাবে কিছু হয়না, মালতীদিরা খুব শ্লথগতিতে মরে, গরীব এবং অসহায়দের মৃত্যুতেও কোনও নাটক থাকে না।

মালতীদির সম্পর্কে শর্মিষ্ঠার স্মৃতিতে প্রথম রেফারেন্সটা খুবই রিডিকুলাস, সব টিচাররা একদিন হাসাহাসি করছিল কারণ মালতীদি ওর শ্বশুরের চশমা পরে আসে। নিজের চশমাটার ডান্ডা ভেঙেছে, সারাতে দেবে। কতদিন হল—শর্মিষ্ঠা জিগ্যেস করেছিল। প্রায় এক বছর। কালো ফ্রেমের ছোট ছোট কাঁচের শ্বশুরের চশমা। দ্বিতীয় রেফারেন্সটাও খুব অদ্ভুত। অডিট-এর সময় ওকে একদিন খোকনবাবু এসে ধমকাচ্ছিল, স্বামীর পেশায় এক একবার এক একরকম লিখেছেন কেন? এক জায়গায় টাইপিস্ট, আর এক জায়গায় ব্যবসা? করুণ চোখে মালতীদি, সেদিন তাকিয়েছিলেন, কারণ নিউব্যারাকপুরের শ্বশুরবাড়িতে ওর ড্রাগ অ্যাডিক্ট এবং রুগ্ন স্বামী শুধু পড়েই থাকে, আর স্বামীর পেশা বেকার লিখতে ওর খারাপ লেগেছিল।

শর্মিষ্ঠার মনে পড়ে গেছিল টিভিতে সেই মেয়েটির সাক্ষাৎকার, যার স্বামী মুসলিম ধর্ম নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল, বিয়ের কথাটা মেয়েটি কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারছিল না, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলছিল বিয়ের কথায় এসেই, কাঁদছিল আর বলছিল, 'ম্যায় তো বোলা থা, ম্যায় তো বোলা থা, আপ মুঝকো পিটাই কিজিয়ে, লেকিন ইয়ে...'। 'পিটাই' শব্দটা বলছিল মেয়েটা আর শর্মিষ্ঠা ভাবছিল নারী হওয়া সত্ত্বেও এই নারীটি তার কাছে কত অপরিচিত।

মালতীদির স্কুল সি আই টি রোডে। ওর হিন্দি ট্রেনিং নেওয়া আছে। উর্দু জানেন অল্প। ওর কাছে একদিন উর্দুর কথা তোলায় কী ছেলেমানুষ খুশিতে হিন্দি উর্দু ছড়া শুনিয়েছিল, তখন ওর মুখটা অপরিচিত লেগেছিল।

ক্যানিং-বনগাঁয় করে বালিগঞ্জ স্টেশনে নেমে স্কুলে আসে মালতীদি। ক্যানিং-বনগাঁ প্রায়ই লেট করে। ওরও যেতে যেতে প্রায়ই লেট হয়ে যায়, প্রায়ই। এমনিতে টিচাররা একদিন কামাই করলেই কুড়ি টাকা করে কাটা হয়, মাস মাইনে, দুশো থেকেই। কোনও কামাই ছিল না, তবু অত

লেট করে বলে অজিত রায় কাল জোসেফ চলে যাওয়ার পর ওকে ডেকে বলে এ মাসেও অর্ধেক মাইনে পাবে। মালতীদির কালকের কান্নাটা ওর মাথায় কাজ করছিল, রাণু দাশগুপ্তের মুখে 'বটগাছ' শব্দটা শোনামাত্রই ও বলে ফেলল, 'ও—আপনি বাংলা বলতে পারেন?' কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রাণু দাশগুপ্ত, কী ভাবল কে জানে, এভাবে কথা শুনতে আদৌ অভ্যস্ত নয়, নিজের মুখচোখও শর্মিষ্ঠা বুঝতে পারছিল, তারপর সিচুয়েশন বদলে ফেলার ব্যবসায়ী দক্ষতায়, যেন ইয়ার্কি, অল্প হেসে বলে উঠল, 'দেখে পারি না বলে মনে হয়, না?'

পরে শর্মিষ্ঠা ভাবল সে এরকম যে কোনও জায়গায় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছে কেন, লাইমলাইটে আসতে চাইছে? নিজের এনজিও করার পরিকল্পনাটা মাথায় কাজ করছে বলে? রাজনীতি করার সময় কনফারেন্সে কেউ খুব ঝাঁঝালো গালাগাল দেওয়া মাত্রই যেমন বোঝা যেত সে এবার নতুন কমিটিতে আসবে, হয়ত সিগনালও পেয়েছে, সেইরকম?

১০ ॥ বেলটা বদলাতে হবে, বদলাতে পারলে ভালো হত, প্রত্যেকবারই বাজার সময় মনে হয়, পরে আর মনে থাকে না।

বেলটা বাজে, বুকের ভিতরে একটা ধাক্কা। চমকে উঠতে হয়। বুকের ভিতর একটা উদ্বিগ্নতা লাফ দিয়ে ওঠে। পুরো সেকেন্ড দুয়েক। তারপরই চারপাশের, পরিপার্শ্বটার কথা মনে পড়ে। থতিয়ে যায়। সবকিছুই একটা নিয়ম, আগে থেকেই জানা, এ সময়ে কে আসতে পারে, কোন সময় কে কে আসে। খুব একটা কিছু ব্যতিক্রম ঘটে না। এখন রাত আটটা, আজ রবিবার, এখন যতদূর সম্ভব, এসেছে সমর। মা আর দিদিমার খবর নিতে আসে এক রবিবার অন্তর এক রবিবার সশরীর এসে, আর প্রতি এক দিন অন্তর একদিন টেলিফোন করে, রাতে। সাড়ে নটা নাগাদ। সেসময়টায় ছুটি ঘুমিয়ে পড়তে থাকে, প্রায়ই চমকে জেগে ওঠে। আজ অবশ্য একটা খবর ওর দেওয়ারও থাকবে, ছেলেটা অসুস্থ, জন্মানোর পর থেকেই শুধু ভুগছে, এই জ্বর ছাড়ল তো পেট, অথচ যত্নের কোনও কমতি নেই। সে কারণে বাচ্চাটা হওয়ার পর শুভর এখানে আসাও হল না। মাস দেড়েক তো প্রায় নার্সিং হোমেই রইল। সমরই হবে। মেরুদণ্ড ঘড়ি বেয়ে একটা ক্লান্তি শিকারী টিকটিকির শ্লথ পায়ে মাথায় উঠে আসে। শুভকে সামনে দেখলে; বরং, তার একটা আরামই হয়, ইস্কুলের কথা মনে পড়ে। জয়প্রকাশের আন্দোলনের সময় হঠাৎ ছুটি হয়ে যাওয়া ইস্কুল থেকে ফেরার পথে দুজন মিলে একটা অচেনা বাগানওলা বাড়িতে ঢুকে পড়া, ছোটবেলা। এই ক্লান্তি সমরের জন্যও নয়। সেই বিকেল থেকে সে শুয়ে আছে। ঘর অন্ধকার করে। কোনও গানও চালায়নি। উঠতে ইচ্ছে করেনি। হাতপা নাড়াতেও। হাতপা শরীর জুড়ে রাশি রাশি ক্লান্তি। কেন? আজ সারাদিন সে তো কিছুই করেনি। তার হাইপোমাইরয়েডের প্রোব্লেম হচ্ছে না তো?

সমর এল, এখন তাকে যেতে হবে, দুটো কথা বলতে হবে, চারটে পাঁচটা, সমর খুব ফর্মাল, উত্তর কলকাতার বড়লোকরা যা হয়। মাস ছয়েকের বড় তার চেয়ে, তাও দিদি আপনি করে কথা বলে। 'আপনার রিসার্চের কী খবর?' অথবা এখন এনজিও আছে। 'এনজিও, মানে ওগুলোকেই তো আগে ভলান্টারি অর্গানাইজেশন বলত, কেমন লাগছে? বেশ ভালো জানেন জীবনে এই সমাজসেবামূলক কিছু একটা নিয়ে থাকাটাকা। আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়, কিন্তু আমাদের যা জীবন, জানেনই তো।' অথবা তসলিমা নাসরিন। শেষ সে কবার দেখা হয়েছে, প্রত্যেকবারই বোধহয় তসলিমা নাসরিনের কথা তুলেছে। কোনওবার লজ্জা। কোনওবার ফেমিনিজম। একবার রেগে গিয়ে শর্মিষ্ঠা বলেছিল, 'ফেমিনিজম কী করবে তসলিমা নাসরিন, একটা শিক্ষা তো লাগে। আদর করা যায়, দেখলে মনে হয় খেতে ভালবাসে, কাস্টার্ড বানিয়ে খাওয়ানো যায়। সাহসী, বীর বুঝলাম। কিন্তু থিওরি করতে হলে পড়াশুনো করতে হয়, ভাবতে হয়। আর ও বোধহয় সেটা করতেও চায় না।' সমর আহত হওয়া তো দূরের কথা, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল, আপডেট করছে বোধহয় নিজেকে, বন্ধুবান্ধব মহলে ছাড়বে। সময়ের সঙ্গে কথা বলার সময় শর্মিষ্ঠাকে নরমকোমল মুখে স্মিত হাসতে হবে, উত্তর দিতে হবে। শুধু তাই না, সেই পুরো সময়টা জুড়ে তাকে ভাবতে হবে। অন্যরা কী ভাবছে, সে কী ভাবছে বলে অন্যরা ভাবছে।

ছুটি পর্দা সরিয়ে এসে দাঁড়াল। ঘর অন্ধকার। এতক্ষণ সে অন্ধকার করে শুয়ে আছে, দুবার এসে ছুটি 'মা, ওমা, আর ঘুমিয়োনা' বলে চলে গেছে। এবার দরজার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে, মাথাটা ডানে হেলানো, মাথার ডানদিকটায় ডাইনিং স্পেসের আলো, চুলটা ফুলে ফুলে আছে, ব্যাকনাইট : এই সফট্‌নেসটা ছবিতে আনতে হলে চুলের প্রপার এক্সপোজারের চেয়ে এক বা দুঘাট বেশি আলো খাওয়াতে হত, তাতে চুলটা ওভার কিন্তু মুখে খুব সুন্দর একটা আলো থাকত। ছবিটা আরও ভালো হয় ক্যামেরাটা যার হাতে, যদি শর্মিষ্ঠা হয় তো ও যদি সাদা জামা পরে থাকে, ফেসে একটা বাড়তি আলো পাঠায়। বাচ্চাদের ছবি এভাবে

খুব ভালো আসে। আর ভেবেই বা কী হবে—ছবি তোলা তো সে ছেড়েই দিয়েছে।

ছুটির ওই একা দাঁড়িয়ে থাকা : ওর ভিতর কোনও নিঃসঙ্গতা জন্মাচ্ছে না তো : ভয়, অপরাধ বোধ : খুব খারাপ আর করুণ লেগে বসে শর্মিষ্ঠার।

'আয়, আমার কাছে আয়, কে এসেছে?'

কোনও সাড়া দেয় না ছুটি, অন্ধকারের অদৃষ্টিগম্যতায় বোকা হয়ে পড়েছে। লাইট থেকে এল, লাইটেই দাঁড়িয়ে আছে, ঘরের ভিতরটা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

'মা, কই মা?' প্রায় বিড়বিড় করে বলে ছুটি।

তাড়াতাড়ি, লাফ দিয়ে উঠে যায় শর্মিষ্ঠা। জাপটে ধরে ছুটিকে। 'মা নেই তো।' খেলার গলায় বলে শর্মিষ্ঠা। কপাল ঘষে ছুটির নাকে, কোলে তুলে। সার্কিট অন হয়ে যাওয়ার মত সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড় করে, নাক টান করে মাথা সামনে এগিয়ে নিজস্ব উচ্চারণে ছুটি বলে ওঠে 'সুদুর সমুদ্দুর—', প্রথমে বুঝেই উঠে পারেনা শর্মিষ্ঠা ছুটি কী বলছে। তারপরেই মনে পড়ে, হাসি এসে যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের, শঙ্খচিল, যতটুকু মনেআছে, প্রায়ই শোনায় ছুটিকে। দুজনের একত্র ঔৎসবিকতার একটা ভূমিই এই করতে করতে গানটায় স্থাপিত হয়ে গিয়েছে। ছুটির রিফ্লেক্সে এসে গিয়েছে : খেলার আওয়াজ।

'এই, অমনি শুরু হয়ে গেল?'

পুরো বিক্রমে খেলা শুরু করতে যাওয়ার মুহূর্তে একটা থতিয়ে, গুটিয়ে গেল ছুটি, একটা প্রসঙ্গ— তার কিছু বলার আছে। মন এবং অস্তিত্ব এক জায়গায় এনে গুছিয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টার মুখভঙ্গী ছুটির। শর্মিষ্ঠা তাকিয়ে আছে।

'মা, ওমা, মা।'

'হ্যাঁ বলো—কী বলবে—', শর্মিষ্ঠা টেনশনের থেকে বার করে এনে ছুটিকে স্বাভাবিকভাবে কথা বলায় সাহায্য করতে চায়।

দু-এক মুহূর্ত শূন্য চোখে তাকিয়ে থেকে, বোকার মত হাসে ছুটি। 'চলোনা— ওঘরে—ওই।'

'কী ঘটেছেটা কী, মেসো এসেছে?'

পাত্তাই দেয়না ছুটি মেসোর প্রসঙ্গে। মাথা নেড়ে 'না' জানায়। 'চলোনা, বলছি।' যেন পুরো জোরটা দেওয়া হয়নি, সঙ্গে দু-চারবার মাথা উপর-নিচে নেড়ে দেখায়। মেসোর কথা নয়, অন্য কিছু বলতে চাইছে, অন্য কেউ এসেছে— সেটা বোঝাতে পারছে না? দেবিকা আসেনি তো? দেবিকা ইকনমিক্সেরই মেয়ে, বছর দুয়েক বেরিয়েছে। কম্পিউটার জানে বেশ ভাল। ফরাসি ভাষাও জানে। ওর বাড়িতে ফোন করেছিল শর্মিষ্ঠা, দেবিকা সেন যোগাযোগ করে। এনজিও যদি করতেই হয় দেবিকাকেও ডাকাই যায়। দেবিকার সঙ্গে ওর বাবার সূত্রে কী এক চ্যাটার্জির পরিচয় আছে, ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সে চাকরি করে, ক্যাপার্ডে একটা ভালো লাইন আছে। দেবিকাও চাকরি খুঁজছে। দেবিকা আসেনি তো—গিয়ে দেখা যাক।

এইসময় মা আসে। 'বিবি, এ ঘরে একটু এসো তো, ডাক্তারবাবু এসেছেন দিদিমাকে দেখতে, একটু শুনে নাও।'

'ডাক্তারবাবু?'

জিগ্যেস করেই অন্য ঘরে আসে শর্মিষ্ঠা আর মা দুজনেই। শর্মিষ্ঠার কোলে ছুটি। ছুটিকে দেখে জানেন ডাক্তারবাবু।

'লেডি হয়ে গেছ তো? আবার সেজেছো।'

ডাক্তারবাবু, যার প্রসঙ্গ ও ঘরে গিয়ে কিছুতেই বলে উঠতে পারেনি ছুটি শর্মিষ্ঠার কাছে, মনোযোগ দেওয়া মাত্রই ছুটি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। দাদার কথায় ডান হাতের আঙুল, কপালে উঠে লম্বা খয়েরি টিপটাকে খোঁজে, শর্মিষ্ঠার সে টিপটা সত্যিই চূড়ান্ত লম্বা বলে মনে হয় ছুটির ছোট কপালে।

ডাক্তারবাবু দিদিমাকে দেখছেন। উনি সবসময়ই বেশ কিছুক্ষণ ধরে বুক পেট মুখ পিঠ পরীক্ষা করেন। আজ কোমর টোমরও দেখছেন। শর্মিষ্ঠার মধ্যে একটা প্রশ্ন নড়ে। আজ রবিবার, ডাক্তারবাবু স্বভাবত রবিবার রুগী দেখেন না। তাহলে দিদিমা কি আবার বেড়েছিল? সে তো কিছু জানে না? মা-দিদিমা তাকে বলেনি? কেন? শর্মিষ্ঠার খারাপ থাকাটা কি এতটাই এভিডেন্ট? দুজন বয়স্ক অসুস্থ মানুষ এবং তাদের প্রতি যথেষ্ট রেসপনসিবল না-থাকার একটা বিষণ্ণতা শর্মিষ্ঠার ভিতর। দিদিমার কি কষ্ট বেড়েছিল? কী কষ্ট? কতটা বেড়েছিল?

কোল থেকে নামানোর পরও ছুটি দূরে যায়নি : নার্ভাস, তার জামার ভাঁজ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, অল্প কোঁকড়ানো অসমান চুলে হাত দেয় শর্মিষ্ঠা, আঙুল নড়ায়।

বেসিনে গিয়ে হাত ধোবেন ডাক্তারবাবু, শর্মিষ্ঠা পাশ থেকে সাবানটা এগিয়ে দিল। ছুটিকে সাবধান করে দেয় শর্মিষ্ঠা, জলে পা-পড়ার বিষয়ে। দীর্ঘদিনের পারিবারিক চিকিৎসকের স্বাভাবিকতায় ছুটিকে উদ্দেশ্য করে বলেন ডাক্তারবাবু, আবার পার্শ্ববর্তীদেরও, 'আর কী, তোমার তিনবছর তো হয়ে গেল।'

ছুটির ডায়োরিয়ার সময়ে ডাক্তারবাবুকে জানিয়েছিল শর্মিষ্ঠা। উনি তাতে বলেন, এখনও পেডিয়াট্রির আওতায়, উনি দেখবেন না, আর একটু বয়স হোক।

মা চা করতে ঢোকে রান্নাঘরে। শর্মিষ্ঠা যেতেই পারত, ভেবেছিল যাবে, হঠাৎ মনে এল, বাবার অসুস্থতার সময় থেকেই ডাক্তারবাবু এই পরিবারের সঙ্গী, খুব ঘনিষ্ঠ সঙ্গী, মা-র সঙ্গী, মা-ই তো পরিবার এখন, অসুস্থতার পরিবার, মা আর বাবা, মা আর বাবা আর দিদিমা, মা আর দিদিমা। স্টেরসেড তো এমনই ওষুধ যা অসুস্থ মানুষের অসুখ-কনশাসনেসকেও নষ্ট করে দেয় এক ধাক্কায়। কিছু সময়ের জন্য স্নায়ুতে ও শরীর যেন সুস্থর চেয়েও সুস্থ, বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রের মত চালিয়ে বেড়ানো, একটা ছটফটানি, এই বাজার এই রান্নাঘর এই ঘরের আগোছালো তাক, দেখলেও কেউ বোঝে না, শুধু দিনে পাঁচটা করে ডেকাড্রন—ডেরিফাইলিন শরীর মস্তিষ্ক মননব্যাপী একটা অপ্রতিরোধ্য অমোঘ ইমিনেন্ট মৃত্যুর মানচিত্র এঁকে চলে। ক্ষয়, আরও ক্ষয়।

সেই সমস্ত আমৃত্যু ক্ষয়ের সামগ্রিকতায় মার নির্ভরযোগ্যতম নিকট সঙ্গীকে চা বানিয়ে দিতে যায় মা, শর্মিষ্ঠা বারণ করতে পারে না।বানাক, নিজেই বানাক। ওয়ান নেইল মোর অব লেস ইট নেভার ম্যাটারস।

ডাক্তারবাবু কথা বলছেন দিদিমার বিষয়ে। আঙুলে যখনই ম্যানিফেস্ট করল, তখনই তো আসলে খুবই সিরিয়াস। শর্মিষ্ঠা মনে মনে বলে, বিগিনিং অফ দি এন্ড। এখন আর এই বাক্যাংশগুলোও মাথায় কোনও শক তৈরি করে না। মৃত্যুটা কেমন শান্ত স্থির নৈর্ব্যক্তিক লাগে। বাবা, মা, দিদিমা। দুজনের এখনও বাকি। দিদিমারটা নিকট। কতটা নিকট? এই নৈকট্যে রয়েছে নিকট? এই নৈকট্যে রয়েছে গত একবছরেরও বেশি, যে কোনও সময়ই যে কোনও কিছু ঘটে যেতে পারে। প্রথমে ডানহাতের অনামিকা ফুলতে শুরু করল, যন্ত্রণা, শরীর এবং শরীর সংক্রান্ত বিজ্ঞান কি অদ্ভুত জটিল, প্রহেলিকাময় : বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বললেন, সীং এর ক্যান্সার থেকে এটা ঘটতে শুরু করা মানে আর তিন চার মাস, যন্ত্রনা কমাতে হোমিওপ্যাথি করে দেখতে পারেন, আমাদের আর কিছু করার নেই। তারপর সেই চলছে প্রায় দু বছর।

হোমিওপ্যাথি ওষুধ খায় দিদিমা, যন্ত্রণা কমার, কতটা কতে তাতে? কমে কি আদৌ? দিনে কবার কতবার দিদিমাকে দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে নামমন্ত্র লিখে যেতে হয়? কতবার? কতক্ষণ যাবৎ? শর্মিষ্ঠা দেখে, দেখতে থাকে, দেখতেই থাকে। আগে মনে হত সে কি অসভিচে বসে আছে? মাতৃগর্ভে শিশুর শরীরে নর্ডিক গর্বী নাজি ডাক্তারের লম্বা হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জে করে মাইক্রোপরিমাণ নাইট্রোগ্লিসারিন : শিশুর, ভ্রূণর শরীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হবে, ফেটে যাবে, মা-র শরীরে যন্ত্রণা : বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা : মানুষের শরীর কতটা যন্ত্রণা নিতে পারে? কতক্ষণ অব্দি জীবন মৃত্যুর থেকে প্রিয়তর থাকে?

আজকাল এটাও একটা অভ্যাস।

ডাক্তারবাবু বলেন, 'কোমরের ঘা-টা আসলে বেডসোর। শুয়ে থাকছেন। আর শরীরের সার্কুলেটিং মেকানিজমও তো গ্রাজুয়ালি উইক হয়ে আসছে।' ডাক্তারবাবুর চোখের দিকে তাকায় শর্মিষ্ঠা, আজন্ম দেখছে ডাক্তারবাবুকে, এখন শব্দগুলো নয় আর, শব্দের মধ্যবর্তী ফাঁক অ্যাকসেন্ট টোনালিটি গুলোই শব্দ, শর্মিষ্ঠা তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়, বোঝার চেষ্টা করে, কিছু বলতে চাইছেন কি ডাক্তারবাবু? বিশেষ কিছু? কোনও ঘোষণা?

ডাক্তারবাবু কথা বলার ফাঁকে চায়ের কাপ মুখে তোলেন। মা জিগ্যেস করে, 'চিনি ঠিক হয়েছে তো?'

১১।।

দেবব্রত একটা স্বপ্ন দেখার গল্প করত প্রায়ই। মাঝেমাঝেই দেখত স্বপ্নটা। ওর পেটে, দেবব্রতর, ডেলিভারি পেইন উঠেছে, বাচ্চা হবে, আর দেবব্রত একটা লাইব্রেরিতে : দীর্ঘ, দীর্ঘতর আধোস্পষ্ট লম্বা করিডোর, দুপাশে বইয়ের তাক, বই বই বই, লাইব্রেরি অফ ব্যাবেল : দেবব্রত খুঁজছে। খুঁজে চলেছে, খুঁজেই চলেছে—একটা রেফারেন্স—একটা সূত্র নির্দেশ যে, ছেলেদের ও বাচ্চা হয়, ভীষণভাবে হয়, অবিকল মেয়েদেরই মত, ও জানে, শুধু রেফাবেন্সটা পেলেই লোককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে।

ন্যাশনাল লাইব্রেরির মেইন বিল্ডিং-এ বইয়ের কাছে এভাবে যেতে দেয় না, অ্যানেক্স বিল্ডিং-ই এই সুবিধাটা আছে। এখানে এই সারি সারি লোহার তাকের সামনে দাঁড়িয়ে জানলার ধুলোঢাকা কাঁচের ওপাশে বাধ্যত-অস্পষ্ট আলোকিত বর্হিজগতের দিকে তাকিয়ে সেই স্বপ্নটার কথা শর্মিষ্ঠার মনে এল।

মুখের রেখায় মজা এল, একটা রিলাক্সড নিশ্বাস, বাঁ হাতে একগোছা টুকরো কাগজে অজস্র বই পিরিওডিকাল আর রিপোর্টের ডিটেইলস, ডান হাতে পেন, বাঁ বগলে কিছু মেটিরিয়াল এতক্ষণ খুঁজে যা পেয়েছে, মোট প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সামান্য, শর্মিষ্ঠা ক্রমে ব্যতিব্যস্ত তিতিবিরক্তি হয়ে পড়ছিল, স্বপ্নটার কথা মাথায় আসায় টেনশন কমে যায়। বেশিরভাগ মেটিরিয়ালই নেই। যা আছে তাও আপডেটেড নয়, তার উপর অনেকগুলোই মিসপ্রেসড, তাকের পর তাকের পর তাক, শর্মিষ্ঠার দম আটকে আসছিল। ল্যাটিন আমেরিকার স্কোয়াটার সেটলমেন্টের কাজগুলোয় তার ভীষণ দরকার, থিসিসের কাজে লাগবে, অথচ সেগুলো কিছুতেই পাচ্ছে না, সেই রাগটাও কমে যায়। বাইরে যেতে ইচ্ছে করে শর্মিষ্ঠার, বাইরে, হাওয়ায়। বাইরে এখন খোলা স্পষ্ট হাওয়া আর আলো, গাছের মাথায়, প্রায় শরতের শেষ বর্ষায় ভিজে পিচের গায়ে বেলা তিনটের চিকচিকে রোদ্দুর।

অটো ডি ফের সেই বুড়োটার নাম কী ছিল? কিয়েন? মরা বইয়ের সঙ্গে থাকতে থাকতে যে ক্রমে মরে যাচ্ছিল? পড়তে পড়তে তার ভয় করেছিল।

বেরিয়েই এল শর্মিষ্ঠা। ব্যাগ নিল। সায়নীর আসতে এখনও

দেরি আছে। ও আসবে এমফিলের ক্লাস করে।
অনেকগুলো সাবজেক্ট এখানে এসে গেল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির। ইকনমিক্সও আসবে। কাঁটাকলে আর ছাত্র সমাগম হবে না, পাশেই ছেলেদের হোস্টেলে যাবে না মেয়েরা আড্ডা দিতে প্রেম করতে দুপুরে বিকেলে, ভাবতেই পারে না শর্মিষ্ঠা। সে যেমন যেত দেবব্রতর ঘরে। তখন হোস্টেল যাওয়ার পথটা ছিল একটা ডোবার পাশ দিয়ে, কলকাতার চার পাঁচ মাস ব্যাপী বৃষ্টিতে ফুলে ফুলে উঠত আগাছা। চলাচলের পথটা ঢেকেই যেত প্রায়।
কাঁটাকলের কম্পাউন্ডের পিছনে কী এক অজানা কারণে বানিয়ে রাখা শেডের পাশে বিশাল নাগকেশরের গাছের ফুলে ঢেকে যাওয়া মাটি পেরিয়ে মেয়েরা এখনও যায় সাউথসিটি হোস্টেলে? তাদের সালওয়াড়ে এখনও চোরকাঁটা লাগে? ছুটির নির্জন দুপুরে চুমু খেতে থাকা প্রেমিক প্রেমিকাদের এখনও হঠাৎ দরজা খুলে দেখে ফেলে হোস্টেলের রান্নার ঠাকুর চক্‌দা, যে কোনও কবিতা মাত্র একবার শুনেই যে স্মৃতি থেকে বলে দিতে পারে? অত যার স্মৃতি সে নিশ্চয়ই শর্মিষ্ঠাকে এখনও মনে রেখেছে?
ন্যাশনাল লাইব্রেরির কম্পাউন্ড ঘন চকচকে জীবন্ত সবুজ, বর্ষাকালে যেমন থাকার কথা, ঝোপগুলো ফুলে ফুলে উঠছে, দেখলেই দুঃখ হয় ঃ এখানে প্রেমিক প্রেমিকাদের বসতে দেয় না। সেই লাইব্রেরিতে কোনও পড়াশুনো হতে পারে বুড়ো মৃত গবেষকদের মাংস কৃমি খোঁটা ছাড়া, যার কম্পাউন্ডে প্রেম করতে দেওয়া হয় না? নতুন তরুণেরা তরুণীরা সেখানে ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক পায় না, হাঙরের ঢেউয়ে লুটোপুটি খেতে পায় না?
সারা কলকাতাতেই প্রেম করার কোনও জায়গা নেই। কোথাও বসলেই মস্তান, আর মস্তানের চেয়েও বড মস্তান ঃ পুলিশ।
গঙ্গার পাড়ে বসে প্রেম করতে এখন কেমন লাগত? ঘাড়ে কাঁধে গ্রীবায় কানের লতিতে কেমন লাগত এখন প্রেমিক স্পর্শ, ঘোলা গঙ্গার পাশে ভিজে ভারী ঘন হাওয়া, বিকেলের রোদ্দুর চিকচিক করত তার মেরুন কালো গুর্জরির কুর্তাটার বুকে বসানো ছোট ছোট কাঁচে, ওই জামাটা ন্যাপথলিন-মৃত পড়েই আছে আলমারিতে, কোনওদিন পরাই হল না, সঙ্গে পরে ঘোরার মত কেউ এখন তার কাছে নেই। দূরে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর ক্রমে জ্বলে উঠতে থাকা হাইপারবোলা আলোকরেখার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কাঁধে আলতো মাথা রাখার মত।
দূর থেকে, প্রায় সেই বড় গেটের সামনে থেকে, হাত নাড়তে থাকা হলুদ সাদা শাড়ি পরা মেয়েটি সে সায়নী, সেটা কিছুতেই অনেকটা কাছে আসার আগে অব্দি বুঝতেই পারে না শর্মিষ্ঠা, কারণ সায়নীকে শাড়ি পরে কোনওদিন দেখেনি সে। বেশ মজার লাগে দেখতে, হঠাৎ যেন অনেকটা বড় হয়ে গেছে সায়নী, যেন বিয়ে হয়ে গেছে, অন্তত বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, ফিল্মে মেয়েরা যেমন বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়া মাত্রই প্রেমের স্কার্ট সালোয়াড় থেকে শাড়িতে চলে যায়। প্রথম প্রশ্নই করে শর্মিষ্ঠা, 'কী ব্যাপার, এত সেজে, আরও কারুর সঙ্গে দেখা হবে?'
'সাদা মানে—শাড়ি? শাড়ি তো এখন পরতেই হয়, যেদিন অফিস থাকে, বলিনি তোমায়, অনাদি চক্রবর্তী প্রথম দিনেই বলে দিয়েছিলেন। আজ তো অফিস থেকে এখানে এলাম, ইউনিভার্সিটিতে।'
'মানে?' বেশ অবাক হয় শর্মিষ্ঠা।
'আছে, আছে সব বলব তো।' চাকল করে সায়নী, মজার ভঙ্গীতে মুখ নাড়ে। শর্মিষ্ঠাকে সিরিয়াস চেয়ে থাকতে দেখে শান্ত গলায় বলে, 'প্রথম দিনেই আমায় বলল, এখানে শাড়ি ছাড়া আর কিছু পোরো না, গরীব লোক সব, বস্তির, রিঅ্যাকশন হয়, এইসব। আসলে দাদা বলল এগুলো অনাদি চক্রবর্তীর বাতিক। ওর গল্পেও নাকি খারাপ মেয়ে মাত্রই ব্লিভলেস ব্লাউজ পরে, আর খুব খারাপ হলে তারা নাভির নিচে শাড়ি পরে সিগারেটও খায়। সালওয়াড় অব্দি নামেনি এখনও কোনও গল্পে।'
নিজের ভিতর ইরিটেটেড লাগে, অপমানিতও, আবার মজাও লাগে। সায়নীর বাক্যগুলোর ভিতর সায়নীর দাদা অরুনাভদার মুখভঙ্গীটা, বলার ধরণটা মনে করতে পারে। বেশ মজার কথা বলে, অরুনাভদা বড় লেখক। দেবব্রতর সঙ্গে কয়েকবার ওদের বাড়িও গেছে। ওর ছোটবেলাটা কেটেছে অন্ধ্রপ্রদেশে, সেখানের দক্ষিণ ভারতীয় নানা ধরণ নিয়ে মজার মজার গল্প বলেছিল। 'অনাদি চক্রবর্তী তো চিত্রনাট্য লেখে, গল্প ও লেখে নাকি?'
'দাদা তো বলল লেখে। সেই গল্প পড়ে অর্ধেন্দু মিত্র ফিল্ম করল, তারপরই ফিল্মের লাইনে কেমন লেখে জানি না।'
অনাদি চক্রবর্তীকে যতটা মনে করতে পারে শর্মিষ্ঠা, খুব বেশি যে দেখেছে এমন নয়, সিরাদুলের বিয়ের দিন ফেরার পথে টেনে করে বর্ধমান থেকে ফেরার পথে অনেকক্ষণ একটানা গল্প করেছিল, সেদিনই সেই অর্জুন সেনের গাড়িবিক্রমের গল্প শুনিয়েছিল অনাদিদা, খুব সরল, সাধাসিধে, অমায়িক লোক। এতটাই সরল, এতটাই সিনিয়র যে লেখক বলে মনেই হয় না। একটু ইনফ্লুয়েনশিয়াল বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে নিজের পরিচিতির গল্প করতে ভালোবাসে, গল্প করে, সেটাও এমন বাচ্চাদের মত সে রাগ হয় না, বরং হাসি পায় একটু। খুব উপকারীও। দেবব্রতর এক বন্ধুর একটা তথ্যচিত্রের ব্যাপারে খুবই হেল্প করেছিল, যতটা হেল্প কেউ এক্সপেক্টই করেনি। বিক্রির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল ফিল্মটা। সেই লোকটাকে এরকম ভাবতে, নিজের বাতিক প্র্যাকটিস করে এনজিওর কর্মীদের উপর, খারাপ লাগে শর্মিষ্ঠার। 'তুমি মেনে নিলে কেন?'
বিষন্ন হয়ে যায় সায়নী। 'তখন এতটা বুঝিনি, আমার আর ভালো লাগছে না বিবিদি। কী করব বুঝতেও পারছি না। শুধু এটা না, আরও অনেক কিছু আছে। তোমাকে বলব বলেই তো এলাম।' চুপচাপ দুজনে হেঁটে লাইব্রেরির বাইরে রাস্তায় আসে। চিড়িয়াখানার সামনে ট্যাক্সি, বাস, ফিরিওলা, মানুষ। 'চলো, ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে যাবে?'
'চলো, কিছু খেতেও হবে।' শর্মিষ্ঠা বলে।
ইউনিভার্সিটির গেট দিয়ে ঢুকে বাঁয়ে ঘুরে ওরা ক্যান্টিনে যায়। বিল্ডিং এখনও তৈরি হচ্ছে, কমিপ্লিট হয়নি, তার মানে কাঁটাকল উঠে আসতে এখনও দেরি আছে। ভাবে শর্মিষ্ঠা।
টেবিলে বসার পরে সায়নী উঠে গেল খাবার আনতে। শর্মিষ্ঠা টাকা বার করেছে, সায়নী বলে, 'আমি দিই—এখন চাকরি করছি।' হেসে ব্যাগে টাকা ঢোকায় শর্মিষ্ঠা। সায়নী যেতে যেতে বলে, 'যদিও আর কদিন করব কে জানে?'
খাবার বলতে পাওয়া গেল চপ, সেগুলো আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আর সেঁকা পাউরুটি। আর চা।
খাবার খেতে খেতে পুরোটাই বলল সায়নী। ও প্রাকৃতে জয়েন করার দিন থেকেই দেখছে টেনশন। প্রাকৃতকে কে কন্ট্রোল করবে? 'প্রাকৃতজনের প্রেসিডেন্ট অনাদি চক্রবর্তী, না রুদ্রাংশু ব্যানার্জি।
'আচ্ছা বিবিদি এই রুদ্রাংশু বানার্জি লোকটা কে? ওর অত পাওয়ার কোথা থেকে আসে? এই আইপেক প্রোজেক্ট নাকি ওই এনে দিয়েছে, জোসেফের সঙ্গে ওর খুব বন্ধুত্ব? আমি অনাদিবাবুকে জিগ্যেস করেছিলাম, রুদ্রাংশু ব্যানার্জি এরকম করছে কেন? টাকা পয়সার জন্যে?'
'তাতে অনাদিদা কী বলল?'
'অনাদি চক্রবর্তী কিন্তু কখনওই বলেনি রুদ্রাংশু ব্যানার্জি অসৎ—আমার সেটা ভালোই লাগল। স্বভাবত রাইভালরি থাকলে লোকে তো মাডস্লিনগিং করেই।'
'না না অনাদিদা ওরকম লোক না, বরং একটু বোকা, নইলে ভাবো না শাড়ির কথা ওরকম বলে কেউ?' সায়নী একটু গোঁজ, চুপ হয়ে থাকে, সায় দেয় না কোনও। 'আর রুদ্রাংশু ব্যানার্জি লোকটাও নিজে ডিজ-অনেস্ট নয়। আমাদের ইকনমিক্সেরই লোক। এগ্রিকালচারে ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে ভালো কাজও ছিল। তারপর স্টেট প্ল্যানিং বোর্ডে জয়েন করে। তখন কংগ্রেস মিনিস্ট্রি। রিজাইন করে। নিজের জন্য গোছাতে চাইলে অনেক কিছুই করতে পারত। বরং এনজিও জগতে কোরাপ্ট পাওয়ার ফুল এবং এলিট যে লোকগুলো, এ এমপি আর, কিড, নালন্দার রাণু দাশগুপ্ত এদের সঙ্গে ওর খুবই খারাপ সম্পর্ক। উনি বোধহয় মনে মনে ভাবেন এই মনোপলি এনজিওগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করার, ছোট এনজিওগুলোকে নিয়ে। কিন্তু এই করতে গিয়ে এক ধরনের একটা পাওয়ার হ্যাংকারিং।'
'আলাউদ্দিনের সঙ্গে তো ওর খুব ভালো সম্পর্ক—সেদিন শুনলে?'
'আমি আগেই জানি। সমস্যাটাই ওটা, উনি যাদের গডফাদার, যাদের প্যাট্রনাইজ করছেন, সেই ফ্রন্টিয়ার বা প্রাকৃত এর লোকজন চুরি করলেও ওনার কিছু এসে যায় না। আর ক্ষমতা ছিল, সেরকম পাত্তা পায়নি, একটা হাংগার থাকেই।' সায়নীকে দেখে একটু অধৈর্য মনে হয় শর্মিষ্ঠার। 'তারপর বলো, তোমার প্রাকৃত- এ কী হল?'
'আমার না, আমি ছেড়ে দিচ্ছি, আমি আর আমাদের প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর প্রদ্যোৎদা, দুজনেই।'
'প্রদ্যোৎবাবুর অনেক প্ল্যান ছিল বলেছিলেন না, নন-ফর্মালের নতুন ধরনের এডুকেশন নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা? উনি এমনিতে এই নিয়ে প্রবন্ধও লিখেছেন, পড়েছি আমি, অনুষ্টুপে। আগে নকশাল রাজনীতি করতেন।' বেশ অবাক হল শর্মিষ্ঠা। 'প্রদ্যোৎবাবুও ছেড়ে দেবেন? এই সেদিনই শুনলাম জোসেফ নাকি বাঁশরী সান্যালকে বলেছে, প্রাকৃত হ্যাজ গট অ্যান একসেলেন্ট স্টাফ। আমার শুনে ভালোই লাগল। তুমি আছো।'
'জোসেফ আসার দিন আমাদের বেশ একটা মজা হয়েছিল। অনাদি চক্রবর্তী থেকে শুরু করে জিবি মেম্বাররা, সেক্রেটারি যে আমাদের রতিকান্ত, সবাই তো খুব তেল দিচ্ছে জোসেফকে। অনাদিবাবু বলায় একটা চামড়ার ব্যাগ উপহার দেওয়া হল জোসেফকে। সেই ব্যাগে করে কাগজপত্র সব। প্রদ্যোৎদা আপত্তি করেছিল। অনাদিবাবু ইনসিস্ট করল। এটাই নাকি রেওয়াজ, সরকারি অফিসারদের কাশ্মীরী শাল অব্দি দেওয়া হয়। তারপর জোসেফ তো অ্যাকাউন্ট চেক করছে, করতে করতে জিগ্যেস করল এই একশ চুরাশি টাকা-এটা কী? ব্যাগটার কথা শুনতেই চটে লাল। একশ চুরাশি টাকা দিল, বলল, আইএলও পেজ মি ওয়েল এনাফ। তোমাদের অ্যাকাউন্টে থাকবে আই এল্ল ওর জোসেফকে ব্যাগ দেওয়ার খরচ, হোয়াট ডু ইউ থিংক অফ মি?'
সায়নীর চোখে হিরোওয়ারশিপ। একটু ঠাণ্ডা গলায় শর্মিষ্ঠা বলল, 'এই লোকটা এসেছে আই এ এস ক্যাডার থেকে। কেরলের রেভিনিউ মিনিস্টার ওর শালা। লোকগুলো সত্যিই যে কেমন হয় কে জানে? আফটার অল আমলা, আই এ এস।' সায়নীর চোখের দিকে তাকিয়ে শর্মিষ্ঠা বুঝতে পারে সায়নী তার আনসার্টেনটি বুঝতে পারছে না। আফটার অল, তাদের দুজনের ভিতর একটা তফাৎ আছে, বিরাট তফাৎ, রাজনীতি করা এবং না-করার তফাৎ।
প্রাকৃত সম্পর্কে সায়নী বলে চলে। টেনশন শুধু রুদ্রাংশু ব্যানার্জির সঙ্গে না। রতিকান্তর কোনও পার্সোনালিটি নেই,

একটু কোরাপ্টও, কোনও ঠিক কথাই বলতে পারে না, আজেবাজে বকে। এতদিন অনাদি চক্রবর্তীই সব ছিল। এখন জিবির আর এক মেম্বার, একজন ব্যাঙ্কের অফিসার, সমর অধিকারী নিজের ইনফ্লুয়েন্স বাড়াতে চাইছে। আইপেক প্রোগ্রামের পোস্ট গুলোর ভিতর একটা পোস্ট হল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, সেই পোস্টে সমর অধিকারী নিজের লোক ঢুকিয়েছে। সেই লোকটা সায়নীকে বলেছে অনাদি চক্রবর্তীর টেলিফোন বিল আর বাড়িভাড়ার টাকা দেয় প্রাকৃত। সত্যি কিনা জানে না, তবে সমর অধিকারী একদিন টেলিফোন নিয়ে সবার সামনেই অনাদি চক্রবর্তীকে খুব অপমান করেছে। অনাদি চক্রবর্তী ম্যাও ম্যাও করেছে। আইপেক প্রোগ্রামে একটা গাড়ি কেনার স্যাংশন এবং হাফ টাকা পঁচাত্তর হাজার পেয়েছিল প্রাকৃত। সেই টাকা সময় অধিকারী আর রতিকান্ত মিলে কাকে নাকি অ্যাডভান্স করেছে না কী ছাই করেছে, সে আর ফেরত পাওয়া যাবে কিনা তাও কেউ জানে না। গাড়ি আর কেনা হয়নি। আই এল ওর কাছে প্রাকৃত এস্টিমেট দিয়েছিল পাঁচহাজার বাচ্চার চাইল্ড লেবার এলিমিনেট করব। মানে একশো বাচ্চার স্কুল পঞ্চাশটা। তার গোটা সতেরো স্কুল হয়েছে, কোনও স্কুলে ছাত্র তিরিশ পঁয়ত্রিশের বেশি না। অথচ জোসেফের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছে যে একচল্লিশটা স্কুল হয়ে গেছে এবং তাতে অ্যাভারেজে আটানব্বইটা করে ছাত্র। এতে আই এল ও বলেছে তোমাদের বেশিভাগ কাজই তো হয়ে গেছে, তাই টাকা অত আর কেন দেব? এখন টিচারদের স্টাফদের মাইনে বন্ধ, আর মাইনে বন্ধ হওয়ারও আগে থেকেই ইস্কুলে স্লেট পেন্সিল বই দেওয়া অব্দি বন্ধ—টাকা নেই। প্রদ্যোৎদা বলেছে প্রাকৃত এর এই ওয়ার্দলেসনেসের দায়িত্ব নেবে না, ছেড়ে দেবে।

'তুমি জানো না বিবিদি, প্রাকৃত প্রায় বিয়ে বাড়ির মত। সবাই সবার আত্মীয়। অনাদি চক্রবর্তীর পিসির ছেলে, রতিকান্তর মাসির মেয়ে, তার কাকা, তার জামাই—সবাই মিলে সুখে করে খাচ্ছে। গ্রান্ট আসে, আর নিজেদেরই আর কোনও আত্মীয় চাকরি পায়। আমরা পেয়েছিলাম কেন? রুদ্রাংশু ব্যানার্জির সঙ্গে ঝামেলা, তাই এমন কাউকে দরকার যাকে দিয়ে কাজ হবে।'

'তবু সায়নী, প্রাকৃতই কলকাতার একমাত্র এনজিও যারা পোস্ট অনুযায়ী যে টাকা পায় ঠিক সেই টাকাই স্টাফকে দেয়। বোধহয় আর কোনও এনজিওই দেয় না।'

'সেটা ঠিকই, কিন্তু তুমি যে অনাদি চক্রবর্তীকে অনেস্ট বলছ—সে এগুলো সহ্য করে কেন?'

'কিছু করার নেই সায়নী, অনাদিদার সেরকম পার্সোনালিটির অভাব। এক ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু এখন বুড়ো হয়ে গেছে, ফিল্মের কাজও কমে আসছে, কিছু একটা নিয়ে তো থাকতে হবে।'

'তুমি দেখো না, শর্মিষ্ঠাদি, যা বলেছিলে, নিজেরা যদি একটা এনজিও করা যায়। আমি আর প্রদ্যোৎদা দুজনেই আসব। ওটা ছেড়ে দেব, কিন্তু কিছু একটা করে দেখাতে হবে অনাদি চক্রবর্তীকে।'

'তুমি কিড-এ যাও না, তোমার মত স্মার্ট মেয়েকে ওরা লুফে নেবে।'

'হয় নিজে কিছু করব, নয়ত আর এনজিও না। আর কিড মানে তো সুরত্না। শি লুকস লাইক এ চিপ ফিল্মস্টার। আর ওরা কি করেছে জানো? আমাদের শিয়ালদার টিচার তাপসী বলছিল, শিয়ালদা ফ্লাইওভারের গায়ে ইস্টার্ন রেলওয়ে ওদের নিজের খরচে একটা স্কুল বানিয়ে দিয়েছে কিডকে। ওই স্কুলটা হওয়ার কথা ছিল প্রাকৃত-এর। কিন্তু আগের দিন গিয়ে সুরত্না আস্ত আস্ত ক্যাডবেরি দিয়ে এসেছে কমিউনিটিতে। টাকা দিয়েছে— কিড-এর অনেক টাকা। পরের দিন ইউনিসেফ আর রেইলওয়ের পিআরও দেখতে এসে দেখে কিড-এর বিরাট মব।'

সায়নীর গলায় উত্তেজনা, হেসে ফেলে শর্মিষ্ঠা। 'এটা এনজিওদের রেগুলার ফেনোমেনা, এত ডিস্টার্বড হচ্ছ কেন?'

'এরকমভাবে কাজ করতে চাই না, একটা ভালো কিছু করো, শর্মিষ্ঠাদি।'

'চলো উঠি এবার, হাঁটি একটু, আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না।'

জেলখানার সামনের প্রায়-ফাঁকা রিফমেটিরি স্ট্রিট দিয়ে হাঁটে ওরা। নানারকম পরিকল্পনা করে, কাকে কাকে নেওয়া যায় নিজেদের এনজিওতে। কী ধরনের কাজ করবে ওরা, কী ভাবে গ্রান্ট জোগাড় করবে নিজেদের এনজিওর জন্যে। দুজনের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়েও কথা বলে, যতটা বলা যায়। দুজন মোটামুটি কাছাকাছি বয়সের, কাছাকাছি সমস্যার, কাছাকাছি সমান অবস্থানের দুটি নারীতে মিলে যতটা কথা বলা যায়।

সেই মুহূর্তে ওদের ভালো লাগছিল। নতুন কিছু একটা গড়ে তোলার স্বপ্ন, উত্তেজনা।

'তুমি তো জানো, বিবিদি, আমার ইচ্ছে পরে অন্য কাজ করার। এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো থাকলে সেটাতেও একটা সুবিধা হবে—তাইনা।'

'জার্নালিস্টদের বায়োডেটায় ভ্যালু ক্যারি করবে কিনা? জানি না। সাংবাদিক এমনিতে তো যাদের দেখি সামনে, তাদের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। সবাই অবশ্য একরকম না। তবে ভালো কিছু না হোক, এনজিওটাতো খারাপ কিছু হবে না। আর এই মুহূর্তেই তুমি যে কিছু পেয়ে গেছো তাও তো না।'

'তা ঠিক। আমাদের এক প্রফেসর, ডি কে এস, আমার জন্য চেষ্টা করছেন। টেলিগ্রাফের একজনের কাছে নিয়ে যাবেন বলেছেন।'

'তোমার দাদাকে একবার বলোনা?'

'দাদা তো বলে দিল্লি চলে যেতে। ভালো করে কাজ শিখতে পারবি। দাদা মধ্যে প্রীতম নন্দীর সঙ্গে দেখা করতেও বলেছিল, দিল্লি গিয়ে। অন্তত চিঠি দিতে। দাদার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক। কিন্তু ভালো লাগে না আমার। নিজে কিছু করব। এমনিতেই সব জায়গায় অরুণাভ মিত্রর বোন।'

হাসে শর্মিষ্ঠা। 'এবার সায়নী মিত্র হবে?'

'হতে আর পারছি কই?' কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা মোড়ক বার করে সায়নী। 'এই নাও'।

'কী?'

'চুইংগাম।' নিজেও একটা নেয়। অবশিষ্ট মোড়কটা শর্মিষ্ঠাকে দেয়। 'ছুটিকে দিও।' ব্যাগের বোতাম আটকাতে আটকাতে বলে, 'অনাদি চক্রবর্তী মধ্যে আমায় স্টেটসম্যানের তিমির জানার কাছে পাঠিয়েছিল। আমি যেতে চাইনি। একদিন জাস্ট কথায় কথায় বলেছিলাম এনজিও এক্সপিরিয়েন্সের খারাপ দিকগুলো নিয়ে একটা লেখা লেখার কথা ভাবছি। তারপর থেকে রোজ খোঁচায়। গেলে না, তুমি গেলে না, তিমির-এর সঙ্গে আমার কালও ফোনে কথা হল। ও আমার খুব বন্ধু। প্রাকৃত সম্পর্কেও ও ইন্টারেস্টেড। তোমার লেখাটা সম্পর্কেও।'

'গেলে?'

'হ্যাঁ গেলাম। সে তো চিনতেই পারে না। অনাদি চক্রবর্তী কে? প্রাকৃত শুনেও চিনতে পারে না। যাইহোক নিজেই নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করে লেখাটা দিয়ে এলাম। সে তো ছাপা হল না। তিনমাস হয়ে গেছে। তবে লেখাটা বোধহয় খারাপ ছিল না। জানো? খুব কংক্রিট কতকগুলো জায়গা ছিল—হয়ত পড়েই দেখেনি। দাদার রেফারেন্স গেলে এটা হত না। অ্যাটলিস্ট পড়ে দেখত।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সায়নী। 'আচ্ছা সব জায়গাই এই একইরকম, না?'

'আসলে ভালো মন্দ— পুরোটা মিলিয়েই তো চলছে, তাইনা? এই দেখোনা, এই এনজিওতেই, দুর্গা কার্লেকরদের একটা এনজিও আছে, বয়েজ হোম বা এরকম কিছু নাম, যতদূর জানি একটু অন্যরকম। কথাবার্তা খুব স্পষ্ট— এই ছেলেরা এগুলো বানাচ্ছে, আমরা এগুলো বিক্রি করছি। একশোর বেশি ছেলে নেয় না একসঙ্গে।'

বয়েজ হোমের কথা মনে পড়ে শর্মিষ্ঠা মজা পায়, মুখে একটা হাসি আসে। 'দুর্গা কার্লেকরের একটা বিড়াল আছে— এই মোটা ল্যাজ। বিড়ালটার সঙ্গে কথা বলে, আপনমনেই। বোধহয় ওনার ছেলেমেয়ে নেই। বেশ বয়স্ক মহিলা, দিদিমণি গোছের। জোসেফকে একবার যা বকে দিয়েছিল না? দুর্গা কার্লেকারের বাড়িতেই মিটিং ছিল এনজিও ফোরামের। শোনো খোকা, আমার অনেক বয়স হয়েছে, আমায় শিখিওনা তো— অনেকটা এইরকম। বেশ মজার লোক।'

'ওখানে গেলে হয় না, বিবিদি?'

'তুমি আগে ঠিক করোতো—তুমি কী করবে। গিয়ে দেখতেই পারো। কিন্তু ওরা তোমাকে নেবেই বা কেন? ওদের স্টাফও খুব কম। চার-পাঁচজন বোধহয়। এরকম উল্টোপাল্টা ভেবোনা তো। যেটা ভাবছ, সেটা বরং ঠিক করে ভাবো।'

আবার নিজেদের এনজিওর প্রসঙ্গে আসে ওরা। ইন্ট্রোডাকটরি মিটিংটায় কাকে কাকে ডাকা যায়। সায়নী ওর এক বন্ধুর কথা বলে, সুদীপ, সাইকোলজির ভালো ছাত্র ছিল সায়েন্স কলেজে। ব্যাঙ্গালোর থেকে পিএইচডি করে এসেছে। এখন এখানে ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট-এর চাকরি করছে রফি আমেদ কিদোয়াই রোডের একটা সাইকিয়াট্রি সেন্টারে। কাজটা ওর ভালো লাগছে না। সব ডুয়িং বলে মনে হচ্ছে। অন্যরকম কিছু একটা করতে চাইছে। একজন ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট ঠিক কী অর্থে কাজে লাগতে পারে বোঝে না শর্মিষ্ঠা। অবশ্য ড্রাগ অ্যাডিক্ট রিহ্যাবিলিটেশন বা ওই টাইপের কোনও এনজিওতে কাউন্সেলিং-এর দরকার পড়তে পারে। কিন্তু সেরকম কোনও এনজিওর কথা তো সে ভাবছে না। যাকগে, আসুক না, দেখাই যাক, এনজিওটা আগে তৈরি তো হোক। শর্মিষ্ঠা দেবিকা আর নমিতাদের কথা বলে। নমিতাদি ফুলটাইম লেকচারার, তাই পেশা হিসাবে আসবে না, তবে এই কাজের প্রতি একটা উৎসাহ আছে। অরূপের কথা বলে শর্মিষ্ঠা। অরূপকে সায়নী আগে থেকেই চিনত, দেখেছে একবার, রেডিওতে জীবনানন্দ নিয়ে কী একটা করেবে, তার সাক্ষাৎকার নিতে অরুণাভদার কাছে গেছিল। শর্মিষ্ঠা অরিজিতের কথা বলে। পল-সায়েন্সের খুব ভালো ছাত্র। অল থ্রু ফার্স্ট। তারপর প্রায় সিংগল হ্যান্ডেডলি পিএইচডিটা করেছে, নামকাওয়াস্তে একটা গাইড ছিল, সে ভালো করে জানতই না অরিজিত কী বিষয়ে কাজ করছে। অরিজিতকে গাইড করার যোগ্যতাও ছিল না, জেনুইন পড়াশুনো করা ছেলে, 'ও এখন সেলফ এমপ্লয়েড, একটা অদ্ভুত কাজ করে, আমি ভালো করে বুঝিওনি, অ্যাড কন্দালটেন্সি। একটু নিজের কথা বেশি বলতে ভালোবাসে কিন্তু লাইন করতে পারে খুব ভালো। ও আমাদের সঙ্গে এলে বেশ ভালো হয় না?'

এইরকম নানা সম্ভাব্য জনের সম্পর্কে ওরা কথা বলে, কাদের ডাকা যায়, কিন্তু একবারও দেবব্রতর সম্পর্কে কোনও কথা ওঠে না। এমনকী 'দেবুদা এখানে থাকলে ভাল হত, না?'—এ টাইপের কিছুও নয়, অথচ সায়নি দেবব্রতকে বেশ পছন্দই করে, জানে শর্মিষ্ঠা। তার মানে সরাসরি তেমন কিছু যদি নাও জানে, তারা দুজন, সে আর দেবব্রত দম্পতি হিশেবে যে খুব ভালো সেই এটা সায়নীর

জানা আছে। অরুণাভদা তার, শর্মিষ্ঠার সম্পর্কে কী ভাবে? কিছু বলে কি কখনও বাড়িতে, খেতে বসে? অরুণাভদা জানল কী করে? দেবব্রত কি ওকে কোনও চিঠি দিয়েছে? চিঠিতে কী লিখেছে? নাকি কিছুই জানা নেই, নিতান্তই কিছু আন্দাজ?

'আচ্ছা শর্মিষ্ঠা দি, মানব—,কী বলব, মানবদাই বলি—মাস্টারমশাইদের দাদা বলা যায়? তোমরা দেখি বেশ বলো! মানবদার বাড়িতে যে মিটিং করবে বললে, ওনার সঙ্গে কথা বলেছ?'

'হ্যাঁ , নিশ্চয়ই', মাথার ভিতর কাজ করতে থাকা বিষণ্ণ ক্লান্তির বোধ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে আরাম পায় শর্মিষ্ঠা, 'আমাদের এনজিওর প্রথম কাজ তো, মানবদাই এনে দেবে, মানবদার সঙ্গে কথা হয়েছে।'

'কীভাবে?' সায়নীর গলায় আগ্রহ থাকে।

'আমি যা ভাবছি', এই অব্দি বলে শর্মিষ্ঠা একটু থতিয়ে যায়, গণতন্ত্র-আচরণের রাজনীতিগত পুরোনো অভ্যাস, 'এখন দেখা যাক মিটিং-এ কী ঠিক হয়, আমি যা ভাবছি, ওখানেই বলব, প্রথমে একটা সোশিওলজিকাল সার্ভে গ্রুপ গোছের এনজিও করা যাক।' শর্মিষ্ঠার একটা অস্বস্তি হয় : সায়নী কীভাবে নিচ্ছে? সায়নীর মনে হচ্ছে না তো যে শর্মিষ্ঠা একান্ত নিজের মত, নিজের ফিল্ডে, নিজের একটা এনজিও করতে চাইছে। এরকম ভাবতে গিয়ে সায়নী তার আইডেন্টিফিকেশন হারিয়ে ফেলছে না তো? সায়নীর মুখে সেরকম কোনও চিহ্নই খুঁজে পায় না শর্মিষ্ঠা শেষ বিকেল প্রায় সন্ধ্যার এই পড়ন্ত আলোয়। হাঁটতে হাঁটতে তারা প্রায় গোপালনগর মোড় অব্দি চলে এসেছে। মোড় অব্দি গেলে ওখান থেকে সায়নী অব্দি চলে এসেছে। মোড় অব্দি গেলে ওখান থেকে সায়নী মিনি-বাস ধরবে, উত্তরদিকের। সেও ধরবে, উল্টোদিকের, সতেরোর বি।

'ওই যে মার্কেট সার্ভে, মার্কে রিসার্চ গ্রুপ হয় না, মার্গ যেমন, সেইরকম। বস্তিগুলো সম্পর্কে ফার্স্ট হ্যান্ড ইনফর্মেশন সার্ভ করবে, গভর্নমেন্ট, ইউনিভার্সিটি, কোনও বডি, যে চাইবে তাকে। উল্টোদিকে সরকারি বা বেসরকারি যেসব সুযোগ সুবিধা রয়েছে, গরিব লোকের পাওয়ার কথা, কিন্তু জানতেই পারে না তার পাবে কী, সেগুলো অব্দি বস্তির লোকদের পৌঁছে দেওয়া। ধরো হাসপাতালের ফ্রি বেড, কিংবা একজন জন্মান্ধ, তার গভর্নমেন্ট লোন, এগুলো অব্দি এরা পৌঁছতেই পারে না। বস্তির একটা লোকের পক্ষে সম্ভব হসপিটাল, সুপার, রাইটার্স অব্দি যাওয়া, ক্লার্কদের অফিসারদের ঘুষ দিয়ে পারসু করে চাপ সৃষ্টি করে বার করে আনা? সেটা ওদের হয়ে করে দেওয়া, র‍্যাপোর্ট তৈরি করা, তারপর ইনফর্মেশন কালেক্ট করা। বাইরের একটা লোকের কাছে যে কথা বলবে না, আমাদের কাছে বলবে।' কথা বলতে বলতে তার কথা বলার গতি বেড়ে গেছিল, উদ্দীপ্ত বোধ করে শর্মিষ্ঠা, আরও কিছু বলতে ইচ্ছে করে তার।

'অ্যাটলিস্ট শুনে তো প্ল্যানটা আমার বেশ ভালোই লাগছে। কিন্তু মানবদা এতে কী করবে?'

'মানবদা ইউনিভার্সিটির টিচার। ইউনিভার্সিটির টিচাররা প্রোজেক্ট গ্রান্ট পায়। সেরকম একটা প্রোজেক্ট নিল, সোশিওলজি ঘেঁষা কোনও বিষয়। ধরো পলিটিকাল ইকনমির, পেরিফেরিকে নিয়ে কোনও টপিক। সেন্টার পেরিফেরি রিলেশন। ধরো এই যে মডার্নাইজেশন, ওপনিং আপ, এই এন্ডেভারগুলো পেরিফেরি কী চোখে দেখছে—তার সোশাল ভ্যালুজ, সোশাল রিলেশনস, ক্লাস-কম্পোজিশন কীভাবে বদলাচ্ছে, কতটা বদলাচ্ছে। এরকম কোনও প্রোজেক্ট নিল মানবদা। তারপর তার ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন উইথ দি সাব-অলটার্ন, সার্ভের পার্টটা আমাদের দিয়ে করালেন। আমরা টাকা পেলাম। আর টাকার চেয়েও বেশি, আমাদের কনসার্নের বায়োডেটায় এসে গেল যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির জন্য এই কাজ আমরা করেছি।'

'এরকম প্রোজেক্ট কি ওরা ইচ্ছে করলেই পেতে পারে, ইউনিভার্সিটির টিচাররা?'

'মানবদার স্কলার হিশেবে একটা ক্রেডিবিলিটি আছে, ইন্টারন্যাশনালি রেপুটেড কাজ আছে পলিটিকাল ইকনমির। আর সাহেবরা নাকি এখন জানতে চাইছে থার্ডওয়ার্ল্ডের বস্তি, মার্জিনের কী করছে, কী ভাবছে। তাদের ডিসকোর্স। পোস্টমডার্নিজম আসার পর পুরো পিকচারটাই খুব বদলে গেছে।'

শর্মিষ্ঠা কথা বলে। বলেই চলে। কথাগুলো তার ভিতর থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসে। এনজিওর এই প্ল্যান, এই বিষয়গুলো এতটা গুছিয়ে সে নিজেই কখনও ভাবেনি, কোথা থেকে আসছে কথাগুলো? নিজের কথা থেকেই আরও আরও উদ্দীপনা পেতে থাকে সে নিজেই। আরদ্ধটা যে এতটা নিকটবর্তী, এত সহজে সম্ভব, তা সে নিজেই বোঝেনি।

সেদিন রাতে, বাসে করে ফিরে আসার সময়, চারপাশের সমস্ত কিছুর প্রতি কোনও বিরক্তি জন্মাছিল না শর্মিষ্ঠার, সে তার চারপাশকে ভুলে যেতে পারছিল। বাসের ভিড়ের ধাক্কাধাক্কির ভিতরও সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা আলোকিত চরিতার্থতার ভিতর ঘোরাফেরা করছিল শর্মিষ্ঠা।

১২ ॥

কলকাতায় ভীষণ দুষ্প্রাপ্য অনেকটা খোলা সবুজ জমি, বড় বড় গাছ, উথলে ওঠা গাছ আগাছা ঝোপঝাড়, মালি একজন আছে নিশ্চয়ই, এত বড় একটা হাউসিং-এ থাকারই কথা, অনেকটা জমি, একটা প্রমাণ সাইজের ফুটবল মাঠের চেয়েও বড়, তিনতলায় মানবদার ফ্ল্যাটের বাইরের ঘরের জানলায় বাঁয়ে ঘুরে বসলেই পুরো খোলা সবুজটা চোখে পড়ে, বড় বড় গাছের মাথা, কলকাতা বলেই মনে হয়না : মানবদাকে ভারি হিংসে হয় তখন। আর সামান্য একটু, তিরিশচল্লিশ গজ গেলেই যে পিচবাধানো রাস্তা, আর সেই রাস্তা যে চল্লিশ সেকেন্ড দূরবর্তী মোড় পেরিয়েই পথচারীকে পৌঁছে দেবে বাগমারি বস্তিতে, সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। যে বস্তির বাচ্চাদের ক্রীড়াকালীন গরপার্লামেন্টারি শব্দচয়ণ থেকে, যুবকদের ঐ পিচের রাস্তা ব্যাপী উত্তর-সন্ধ্যা শরীরি-অশরীরি লাভমেকিং থেকে, ল্যাম্পপোস্টের ল্যাম্পগুলো অনুপস্থিতির চিরকালীনতায়, এককথায় সন্নিকটবর্তী বস্তির পেরিফেরি বাস্তবতার থেকে, বস্তির সামনে জড় হওয়া জ্ঞানের রেডিয়েশনমান জীবানু থেকে কোনওক্রমে বাঁচিয়ে বর্তিয়ে রেখে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলাই যে মানবদাদের হাউজিং-এর নাগরিকদের সবচেয়ে বড় সমস্যা, ওই জানলায় বসে সেটা সম্পূর্ণ ভুলে থাকা যায় : চোখ থাকে আকাশে, উঁচু গাছের আকাশ ছোঁয়া পাড়ায়, চিলে, পাখিতে, মেখে : মানবদার পক্ষে থিয়োরি করা সহজ হয়ে ওঠে।

রাস্তা থেকে হাউজিং-এ ঢুকতে ঢুকতে, গেট থেকেই, মানবদার তিনতলার জানলায় একটা মাথার আভাস চোখে আসে, ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না, ওখানটায় কেউ বসে আছে মানে শর্মিষ্ঠা ধরেই নেয় অরূপ, এতটা আগে আর কে আসবে, মানবদার সঙ্গে কথা বলছে। জানলার পাশে ওই জায়গাটা দখল হয়ে গেছে এটা ভাবতে একটু রাগ হল শর্মিষ্ঠারা সে বোধহয় কাঁকুড়গাছিরও আগে ফুলবাগান থেকেই, বাসে বসেই ভাবতে শুরু করে জায়গাটার কথা, চেয়ারটার কথা, কুশনটা তুলে বিছানায় রেখে চেয়ারটায় সে বসেছে, কথাবার্তা হচ্ছে, চা, সিগারেট, নড়াচড়া, তার মধ্যেই এই একবার চোখ তুলে শর্মিষ্ঠা তাকাল আকাশের দিকে, তাকানো মাত্রই মনেপড়ে গেছিল আকাশ সীমাহীন : ব্রহ্মাণ্ড, গ্রহ, উপগ্রহ, জীবনের সৃষ্টি, জন্ম থেকে মৃত্যু কত ক্ষুদ্র, খণ্ড সময়ের জন্য সে বেঁচে আছে, তাকে আর গ্লানিময় করে তোলা কেন নানা পীড়নে?

দরজার সামনে দাঁড়ায় শর্মিষ্ঠা। চোখ হাইটে স্বাভাবিক উচ্চতায় একটা পিপহোল, আর একটা পিপহোল হাঁটুর কাছাকাছি, যেন পোষা কুকুরের দেখার জন্য, আসলে দরজাটা কখনও উল্টে বসানো হয়েছে, কেন-সেটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রোজই একবার ভাবে জিগ্যেস করবে, কোনওদিনই দরজা খুলে আর খেয়াল থাকে না।

বৌদি দরজা খোলে। হাসে অল্প। আগেই জানত যে তারা আসছে, হাসিতে সেটা উপস্থিত থাকে। চটি খোলার জায়গাটা পাওয়া যায় কেবল দরজা বন্ধ করার পরই, দরজাটা হাত দিয়ে বন্ধ করে দিতে দিতে বাঁ পায়ের চটির গোড়ালি ডান পায়ের আঙুলে আটকে আঁট চটিটা খোলে শর্মিষ্ঠা। চটি খুলতে খুলতেই মেয়ে-গলা শুনেছিল, বাইরের ঘরের খোলা দরজা দিগে মুখ বাড়ায় এবং সায়নীকে দেখে একটু অবাক হয়।

'তুমি এত আগে?'

খুব সহজভাবেই সায়নী ভুরু একটু তুলে চোখ বড় করে, মাথা সামান্য ঝাঁকায়—কেমন দিলাম?— স্পেটকাট চুল নাড়িয়ে। শর্মিষ্ঠা হাসেও, যেমন হাসার কথা। কিন্তু নিজের ভিতরই একটু ক্লান্ত হয়ে পড়া। অরূপ থাকলেও কি হত? কেন? অরূপ ছেলে বলে? কিন্তু কেন? সেই কবে, দূর অতীতে ম্যাক্রো সেকেন্ড পেপারের ক্লাসে, এমএসসির ফার্স্ট ইয়ারে, মানবদা তার জেলে থাকাকালীন পুলিশি আপ্যায়নে, মিনিমাম একটা স্যাডিস্ট পারভার্ট না হলে বোধহয় স্টেটের মরালিটি রক্ষার দায়িত্ব পাওয়াই যায় না, রুনু গুহ ঠাকুরতা না হলে, একটু কুঁকড়ে বেঁকে ছোট হয়ে যাওয়া পা নিয়ে লেংচে লেংচে চৌকো চৌকো ছবি আঁকছে, মডেল, কালোস্কির ম্যাক্রো মডেল, চকে আঁকা ছবিগুলো সিমেন্টের কালো বোর্ডে—সেগুলো শর্মিষ্ঠা দেখছেই না, তাকিয়ে আছে কিছুটা নুয়ে ঝুঁকে যাওয়া একটু রুগ্ন পীড়িত মানবদার না কাটা দাড়ির ভাঙাচোরা জীর্ণ মুখে, কালো মণি খোদাই সাদা তীব্র চোখে, একটা উষ্ণতা শরীরে অনুভব করছে ওই শরীরটায় সান্নিধ্যের, যত্ন করতে হওয়ার কল্পনার ভিতর, সেই দূর অতীতের সেই আবেগের ওঠানামাগুলো কি সে এখনও বহন করে? নাকি আগে একটু সময় পাওয়া গেলে মানবদার সঙ্গে কিছু কথা বলে নিতে পারত, নিজের কথা, তার জীবনের বা দাম্পত্যের বা পড়াশুনোর কথা, কলকাতায় তো সেই খুব কম সংখ্যক মানুষগুলোর একজন মানবদা, যার ভিতর দেবব্রত অনেকটাই রিপ্রেজেন্টেড হয়, মানবদা দেবব্রতকে সত্যিই ভালবাসত, সেই কথাগুলো হল না, সেই সময়টুকু যাপন করা গেল না—এই কষ্ট।

মানবদা তাকে দেখামাত্রই, প্রথমেই প্রশ্ন করে, 'আমার অনুবাদের কী হল?' সেই মুহূর্তেই নিজের ভিতর একটা শৈত্য অনুভব করে শর্মিষ্ঠা, শেষ অক্টোবরে কোনও হঠাৎ বৃষ্টির হু হু হাওয়ায় গরমজামাহীন অপ্রস্তুত শরীরের শৈত্য। মানবদাকে অনেকদিন থেকে চেনে সে। মানবদার প্রসঙ্গকে, প্রসঙ্গ বদলানোকে।

শেষ দিন শর্মিষ্ঠা এখানে একা এসেছিল। সেদিন পুরো কথাবার্তাটাই হয় এনজিও নিয়ে, একবারও পত্রিকা নিয়ে কথা হয়নি, বা পত্রিকার জন্য তার যে অনুবাদ করার কথা তা নিয়ে। রিথিংকিং মার্ক্সিজম বা হ্যারিয়েট ফ্রাড বা সেই

সূত্রে ইউরোপ বা ফ্রান্সের, আমেরিকার ভাবনা চিন্তা এসবের কথা উঠেছিল, কীভাবে শর্মিষ্ঠার পড়াশুনো করা উচিত, শর্মিষ্ঠাদের এখন কী কী বিষয় ভাবার কথা এগুলো সবই উঠেছিল নিতান্তই সেই সম্ভাব্য সোশিও ইকনমিক সার্ভের সাপেক্ষে। আজকে হঠাৎ শুরুতেই এই কথা—মানবদা এনজিওর প্ল্যান থেকে সরে যেতে চাইছে না তো?

'হ্যাঁ, হবে, কিন্তু আজ তো অনুবাদ না, আমরা আজ কথা বলব নিজেদের কাজ নিয়ে।'

মানবদা তাকায় সায়নীর দিকে, শর্মিষ্ঠাও তাকায়। সায়নী তার দিকে সোজা তাকিয়ে আছে। সায়নীর সঙ্গে মানবদার ইতিমধ্যেই এই নিয়ে কোনও কথা হয়েছে। কী কথা? মানবদা কি সায়নীকে নিরুৎসাহ করছিল? কেন?

'শোনো, অন্যরাও এসে যাবে, তার আগে আমি কয়েকটা কথা বলে নি।' খাটের উপর নিজের সামনে পেতে রাখা স্টিল ব্যান্ড হাতঘড়িটা বিছানা থেকে এখন মানবদার হাতে, ডানপাটা চিরস্থায়ী ক্ষতযন্ত্র দু-চারবার নড়ে, বাঁ পায়ে বিছানার উপর চাপ সৃষ্টি করে মানবদা সামান্য এগিয়ে সামান্য সামনে ঝুঁকে আসে, সেই প্রায় পদ্মাসন, বাঁ কনুই পার্শ্ববর্তী টেবিলে, ঝোঁকানো মাথার দৃষ্টি নিচের দিকে, হয়ত হাতের ঘড়িতে : মানবদা তাকে কিছু বলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এমন কিছু যা বলার জন্যে প্রস্তুত হতে হয়।

'শোনো', ত্বরিৎ একটা ক্ষণিকের অ্যাঙ্গুলার মুভমেন্ট, মানবদার চোখ জানলা ঘুরে আসে, এখন দেওয়ালের হালকা নীলে মেঝেতে ছাত্ররা বা অন্য কেউ বসে মাথার তেলে ময়লায় কালচে বাদামি ছোপের দিকে দৃষ্টি, 'আমাকে এর মধ্যে রেখো না, আমি এখনও প্রিপেয়ার্ড নই জানো— ওইরকম কোনও কাজে আমি নিজেই হয়ত ঢুকব— কিন্তু এখন না, আমার নিজের কাজ, বাইরের পত্রিকা বা অ্যাছলজিগুলোর জন্য এখন আমার এমনিতেই বেশ স্ট্রেন পড়ছে, আর—।' মানবদা এতক্ষণে শর্মিষ্ঠার দিকে তাকায়, অস্বস্তিগ্রস্থ কিন্তু ডিটারমিন্ড মুখ, 'আর আমি তাড়াতাড়ি ক্ষয় পেতে যেতে চাই না— একে আমাদের ট্রপিকাল কান্ট্রি।'

শর্মিষ্ঠা তাকিয়েছিল।

'তোমাদের সেসন, আমার উপরও তো চাপ পড়বে, অনেকটা পড়াশুনো করতে হবে, ভাবতে হবে। আর মেইনস্ট্রিম রিসার্চের মধ্যে আনগ্রাউন্ডেড ডিসকোর্সকে ঢুকিয়ে আনার পক্ষে এখানের ইউনিভার্সিটিগুলো বোধহয় এখনও প্রিপেয়ার্ড নয়। সময় বদলাচ্ছে, সুস্মিতা ঐশ্বর্য আসছে, পোশাক উন্মুক্ত হচ্ছে, শরীর গেজ-এর আওতায় চলে আসছে, ত্রিনয়নের আওতায়— 'প্যানঅপটিকনে'র বাংলা 'ত্রিনয়ন' দেবব্রতই বানিয়েছিল না?— সময় বদলাচ্ছে। আর কটা দিন যেতে দাও। মানুষকে এখন শরীরে মনে প্রস্তুত অবস্থায় বাঁচতে হবে, কমোডিটির নশ্বরতার ভিতর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দিন শেষ, নাইনটিনথ সেঞ্চুরি ব্রাহ্ম নৈয়ায়িকতার। জেলখানার ঘরে আলো লাগানো হচ্ছে, বস্তির মানুষদের ডিসকোর্সের উপরও আলো ফেলতে হবে, ত্রিনয়নের আওতার বাইরে কেউ বাঁচতে পারবে না। কিন্তু একটু সবুর করো। আমি এখনও প্রিপেয়ার্ড নই।'

মানবদার এই কথার পরই শর্মিষ্ঠা বুঝতে পারছিল তাদের মিটিং থেকে কী হবে, মানতে চায়নি, কথা চালিয়ে গেল, পারসু করল মানবদাকে আরও অনেকক্ষণ। কথা বলা কালীনই সে বুঝতে পারছে— এই বলে চলাটা অর্থহীন, তাও, না-বলে সে পারছে না, বলতেই হচ্ছে তাকে, নিজেই নিজেকে শুনিয়ে চলা : সে চেষ্টা করছে, লড়ছে।

মানবদার সঙ্গে এই পুরো কথোপকথনটা একটা খোলা, একটা নো কিল ডুয়েল, শুনে আর অল্পস্বল্প অংশগ্রহণ করে এন্টারটেইন্ড হওয়ার জন্যে— সায়নী মাঝেমধ্যে হাসে, নিঃশব্দে, কখনও সামান্য শব্দ করে, মাথা নাড়ে, ভ্রু নড়ছিল, চোখ গোল হচ্ছিল বা স্বাভাবিক, শর্মিষ্ঠার ভিতর একটা টেনশন বাড়তেই থাকে, সে টেনশন কখনও কাউকে বলে ওঠে যায় না।

সবাই আসতে লাগল একে একে। অরূপই বরং পরে এল। অরিজিত আসায় মানবদা অবাক হল, একটু খুশি হল, অবাকও হল, আগে থেকেই চিনত। শর্মিষ্ঠা যে চিনত সেটা জানত না। মানবদা এরকম সময়ে পা টেনে টেনে উঠে গেল, 'আসছি', শর্মিষ্ঠা বুঝতে পারে মানবদা এখন অনেক দেরি করে আসবে, অনেক। বৌদি চা দিয়ে গেল। সঙ্গে ধোকলা। আসার কথা জানত, আগেই এনে রেখেছিল। নমিতাদির জন্যে চা করতে দেরি করা হল, কিন্তু এল না, কোথাও আটকে গেছে।

সুদীপ এই সমাগমে সায়নী ছাড়া কাউকেই চেনে না, আরও আসার মুহূর্ত থেকেই অরিজিতের মত উচ্চারণপ্রিয় কেউ সামনে, একটু থিতিয়ে থাকে। হয়ত আরও, মোটামুটি আকর্ষণীয় এবং নতুন নারী সায়নী সামনে থাকাতেই অরিজিত নিজেকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে চাইছিল। অরুণাভ মিত্রর বোন হিসেবে সায়নীকে জানতে পারলেই অরিজিতের ব্যবহার বদলে যেত, জানে শর্মিষ্ঠা। কী বদলাত, ঠিক জানে না, কিন্তু বদল একটা হতই।

দেবিকা সায়নীর তুলনায় কম আকর্ষণীয়, কিন্তু সেও নারী, তাই অরিজিতের মনোযোগ পাচ্ছিল, আবার অপেক্ষাকৃত কম পাচ্ছিল এটাও স্পষ্ট থাকে।

শর্মিষ্ঠার প্রশ্নেই মুখ খোলে সুদীপ। ওদের লাইনে এই কথাটা নাকি চলেই সে একটু ক্র্যাক না থাকলে ওই লাইনে কেউ আসে না। 'কী জানি, সেইজন্যেই হয়ত এসেছিলাম।' এই বলে শুরু করে সুদীপ। বাক্যটা ও এখানে বলবে বলে আগে থাকতেই ভেবে রেখেছিল, বলার ধরণ শুনেই বোঝা যায়, তাও কথাটা শর্মিষ্ঠার ভালো লেগে যায়। কাজ করতে করতে সাইকিয়াট্রিস্টদের একটা গোলমাল নিজেদের ভিতরেই এসে যায়, এই কথাটা শর্মিষ্ঠা অবশ্য আগেই শুনেছে।

সুদীপ ওর সমস্যার কথা বলে। নিমহ্যানস থেকে চলে আসার সময়ে কী কী সব করবে বলে ভেবেছিল। এখানে এসে ভালো কাজ তো দূরের কথা, সঠিক একটা পেশার জায়গাও জুটিয়ে উঠতে পারল না। সেখানে আছে সেটা টাকার অর্থ খুব খারাপ নয়, কিন্তু যার কনসার্ন, তিনি নিজে মেডিসিন, নিউরোলজি থেকে এসেছেন, তার মা খুশি, সেটা ঠিক হোক বা ভুল, সেইমত চলতে হয়। তিনি না চাইলে যে কোনওদিন চাকরি চলে যেতে পারে। আর উনি যা জানেন সেটাই শেষ কথা, ক্লিনিকাল সাইকলজি যে পৃথিবীব্যাপী রোজ বদলাচ্ছে, সেসব বুঝতেই চায় না। ভাবনাচিন্তার জায়গাটা বেশ কম। ক্ষমতা চূড়ান্ত বলে মাঝেমধ্যেই এমন সব ব্যবহার করে যেগুলো চূড়ান্ত অপমানজনক। এখানে কাজ করতে ওর ভালো লাগছে না। এবার নিজের মত কিছু একটা করতে চায়। কিন্তু ওর 'পয়েন্ট অফ ভিউ কখনওই শুধু সোশাল কমিটমেন্ট নয়, আসলে আমার কিছু, পারিবারিকই, লায়াবেলিটি আছে। বাবা রিটায়ার করেছে। আমাকে টাকার কথাটা ভাবতেই হবে।'

অরিজিতকে আগেও দেখেছে শর্মিষ্ঠা, এক-একদিন ওর এক-একটা শব্দ ভালো লেগে যায়। আজকের সেই শব্দটা 'ছক'। 'একটা ছক করতে হবে'। 'ছক' শব্দটা বারবার, বারংবার ব্যবহার করে চলে অরিজিত, নানা বাক্যে।

'ছক' : কীভাবে কে কোথায় বধ হবার নিদারুণ আকাঙ্ক্ষায় মাখোমাখো হয়ে অপেক্ষা করছে, শুধু। তাকে বধ করে তার চামড়াটা ছাড়িয়ে ফেলার অপেক্ষায়। 'দেখো ভাই, সারপ্লাস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে বাঁচা, আমি শুধু এই কথাটা জানি যে সব কিছুরই একটা ছক থাকে। ছকটা খুঁজে বার করো, তারপর সঠিক জায়গায় সঠিক এফর্ট দাও। তেল মারো। কোনও ধুতিপরা ফ্যাসিস্ট বলো, কোনও জিনসপরা এমবিএ, যে কাউকে আমি তেল দিতে পারি। আমার তেল দিতে কোনও খারাপ লাগে না। আমি শুয়োরের বাচ্চা তোর থেকে সবদিক দিয়ে সুপিরিয়র, এটা যখন জানিই, তোর হাতে ক্ষমতা আছে, আমার নেই, তাই তোর পা চাটতেও আমার কোনও আপত্তি নেই। আমার ছক আমায় বার করে আনতে হবে, আমাকেই, কোনও শালা আমায় করে দেবে না, শুধু একটা ছক। ছকটা জানতে হবে। সব লাইনের ছক আলাদা আলাদা। কম্পিউটার বিক্রি, মেয়ে বিক্রি, আইডিয়া বিক্রি বা আইডিওলজি, সব কিছুরই একটা ছক আছে, ছক জানা আছে এমন লোকও আছে, শুধু তার বা তাদের কাছে পৌঁছতে হবে।'

কথাগুলো স্মার্ট, অরিজিতের নিজস্ব ভঙ্গীতে এক ধরনের একটা অর্থও বহন করে, কিন্তু মোটের উপর ঘুলিয়ে যাচ্ছিল তারা ঠিক কেন এখানে বসেছে, ঠিক কী করতে চায় তারা, কথা বলা ছাড়া। ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হচ্ছিল শর্মিষ্ঠা, কিন্তু অরিজিতকে সে নিজেই ডেকেছে, আর সবাইকে মিলিয়ে যখন কিছু একটা ঘটছে তখন সবাই তার, শর্মিষ্ঠার পছন্দমত আচরণই করবে বা কথা বলবে এমনটা আশা করার কোনও মানে নেই। কী বলত, কীভাবে থামাত শর্মিষ্ঠা? থামালে তো চলবে না, নিজেদের এনজিও করতে হলে অনেককেই প্রয়োজন পড়বে, এরা না হোক অন্য কেউ। ততক্ষণে শর্মিষ্ঠার নিজের ভিতরে এলোমেলো হয়ে যেতে শুরু করেছে তার পরিকল্পনা। সে সব কথা সে বলতে চেয়েছিল, বলবে বলে ঠিক করে রেখেছিল, সেগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

অরিজিতের 'ছক' থেকে সঙ্গতভাবেই ফান্ডের, ফিনান্সের কথা উঠল। দেবিকা তার পরিচিত কোনও এক নিয়োগীদার কথা তুলল, নিয়োগীদার গল্প। এর কথা দেবিকা শর্মিষ্ঠাকেও আগেও বলেছে।

দেবিকা বলতে শুরু করে সেই নিয়োগীদা, যে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সে খুব বড় কোনও চাকরি করে, নিয়োগীদার বাবাও বিরাট একটা কী ছিল, সেই নিয়োগীদা কীভাবে ক্যাপার্ড এর মেম্বার হিসাবে বাঁশদ্রোণীর অগ্রগতি নামে একটা এনজিও-কে প্রচুর হেল্প করে বোর হয়েছিল।

'ক্যাপার্ড বস্তুটা কী?' অরিজিত জিগ্যেস করে।

'সমস্ত এনজিওগুলোর কাজকর্মের ইভ্যালুয়েশন, ফান্ডিং, বোধহয় সরকার-এনজিও- কো-অর্ডিনেশন। এইসব।' সায়নী উত্তর দেয়। উত্তর দিতে ওর ভালো লাগে, অরিজিতকে, মনোযোগে এখনও সিডিউসড হয় সায়নী, বয়স কম ওর, ভাবে শর্মিষ্ঠা। অবশ্য সে নিজেও কি হয় না? মনোযোগটা কে দিচ্ছে তার উপর নির্ভর করে।

'নিয়োগীদা বলল, একটা এনজিও, ছেলেগুলোও পরিচিত, কাজ করতে চাইছে, একটা ভলো গ্রান্টের ব্যবস্থা করে দেয়, ভালো মনেই। ঠিক কত জানি না, বেশ বড়। তারপর, নিয়োগীদা বলছে, প্রথমে এনজিও-র প্রেসিডেন্ট যে, অজয় না কী নাম, সে জমি কিনল, তখন কিছু বললাম না। তারপর জমিতে বাড়ি তুলল, তখনও কিছু বললাম না। সেই বাড়িতে শাশুড়িকে এনে রাখল তখনও কিছু বললাম না। তারপর যখন নিজেও থাকতে শুরু করল, তখন আর না-বলে পারলাম না।'

'তখনই বা বলল কেন?' বহুক্ষণ বাদে তার সরু ধারালো গলায় বলে ওঠে অরূপ। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে, মুখে মৃদু শ্লেষের হাসি, 'আগে বলল না, তখন বলল কেন, ও

নিশ্চয়ই নিজেও খেয়েছে, তারপর হিশেব দেখানোর কোনও একটা ঝামেলায় পড়েছে, আর বলছে : আর সহ্য করতে পারলাম না।' অরূপের ভিতর বিরক্তির তীব্রতা শর্মিষ্ঠাকে অবাক করে। শুধু এই নিয়োগীদা- এপিসোড নয় ও নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরেই বিরক্ত হচ্ছে। কেন, অরিজিত? সম্মুখবর্তী অরিজিত ওর চেয়ে জেল্লাদার বলে? আর চারপাশের লোককে হোস্টাইল করে তোলার মত কী একটা অরিজিতের ভিতর আছেও খুব।

দেবিকা একটু আহত হয়। কারুর চেনা কোনও লোকই কখনও চোর হয় না। 'নিয়োগীদাকে দেখে তো ওরকম মনে হয় না, তবে কী জানি?' দেবিকা চুপ করে যায়, একটা অকারণ গ্রাজ বহন করে নিয়ে।

সেদিন পুরো আলোচনাটাই চলে এইরকম। কিছু স্মার্ট কপ্পা, কিছু গল্প, কিছু আঘাত প্রত্যাঘাত। এনজিও-র বিষয়ে কোনও কথাই প্রায় এগোয় না। আর শর্মিষ্ঠার আদত পরিকল্পনাটা আগেই, মানবদার কথাতেই চোট খেয়ে গেছিল। তাও ও নানা কথা পাড়ল। অরিজিত কনভিন্সড হতে পারে ভেবে এনজিও-কন্সাল্টেন্সি গোছের কিছু একটার কথাও পাড়ল শর্মিষ্ঠা। যে এনজিও অন্যান্য এনজিওদের রিপোর্ট লিখে দেওয়া, সার্ভে বানিয়ে দেওয়া, এইসব কাজ করবে। এগুলো নিয়ে এএমপিআর-এর মাথাব্যাথাটা ওর মনে ছিল। কদিন আগে সেদিন ডঃ রায়কে গিয়ে ও বলল যে ওর পিএইচডি থিসিসটা লেখার চাপটা ভীষণ বেড়েছে, ও আর কাজটা করতে পারছে না, ডঃ রায় তার খারাপলাগার কথা বলতে গিয়ে রিপোর্টের কথাটা বলেও ফেলেছিলেন। কোন রিপোর্ট আইএলও, ইউনিসেফ বা গভর্নমেন্টের কাছে কনভিন্সিং হবে এটা এই এনজিওদের কাছে বেশ বড় একটা দুশ্চিন্তা।

কোনও কিছুই সেদিন দানা বাঁধল না। দানা বাঁধার দিকে একটু এগোল না। বরং আরও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। এভাবে কিছু হবে না, এভাবে হয় না, শর্মিষ্ঠা বুঝতে পারছিল। কিন্তু কীভাবে, কীভাবে হয়, শর্মিষ্ঠা বুঝতে পারে না।

ভিতরের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে কাঁকুড়গাছি মোড়ের দিকে আসতে আসতে, পাশাপাশি সামনে পিছনে মুখোমুখি আট-দশটা রোল চাওমিনের স্টলের সান্ধ্য ক্রিয়াকলাপের একত্র ঘ্রাণে চারপাশটা ম-ম করছে, সায়নী শর্মিষ্ঠাকে বলল, 'তোমার গডফাদার এভাবে ডোবাল?'

'অ্যাঁ, হ্যাঁ—গডফাদার। হ্যাঁ গডফাদাররা তো ডুবিয়েই থাকে। গডরা আর ফাদাররা দুজনেরাই। জন্ম দিয়ে ছেড়ে দেয়।' বাক্যটা বলেই শর্মিষ্ঠার মনে হল, এটা কি অন্য কারো মত করে, দেবব্রতর মত করে, ও বলল? মেয়েরা কি আদৌ এভাবে কথা বলে? তাদের কি এভাবে কথা বলার কথা? কীভাবে তাদের কথা বলার কথা? সেটা কি ঠিক করে দেবে? গডরা আর ফাদাররা, দুই পুংলিঙ্গ? আর সে শর্মিষ্ঠা বা সায়নী বা অন্য নারীরাও তো শুধুই ফাদার খুঁজে চলে, ফাদার বা গড। সায়নী মাঝেমাঝেই অরবিন্দ স্বামীর কথা বলে। 'বোম্বের অরবিন্দ স্বামী, রোজার নয়, দলপতিরও নয়। মুখের প্রতিটা এক্সপ্রেশন—কী ডিপেন্ডেবল, কী কেয়ারিং।' সায়নী আসলে ফাদার খুঁজছে। সে, শর্মিষ্ঠা, আসলে ফাদার খুঁজছে। তাদের আদৌ ফাদার আছে কি, কোনও ফাদার?

১৩ ॥ শর্মিষ্ঠার ডায়রি থেকে :

'আবার, আরও একবার আমি অপারগ, অকৃতকার্য হলাম, আনসাকসেসফুল।

উপরের এই বাক্যটা দিয়ে শুরু করব, বারবার ভাবছিলাম, দেবব্রতকে একটা চিঠি লিখব। লিখে কী হবে? আর

আসলে কি সত্যিই আমার চিঠিটা লিখতে ইচ্ছে করছে, নাকি এটা একটা প্রথা— স্পাউসের কাছে হতাশা মোচন করা, আশ্রয় নেওয়া? সেক্সে যেমন। দম্পতি কী? যারা পরস্পরের কছ থেকে সবচেয়ে ভালো অরগাজম পেতে পারে। বাংলা শব্দটাও তো রাগমোচন। কুকুরদের যেমন একটি ঋতুতে, মানুষের তেমনি সপ্তাহে তিন কি দুই কি সাতবার শরীরের মধ্যাঞ্চলে রাগ সঞ্চিত হবে। অনুরাগ। তারপর মোচন করো। পরস্পর পরস্পরের বুকে আশ্রয় নাও। নারীটি পুরুষটির পেট্রোরালসে। এবং পুরুষটি নারীটির ম্যামারি গ্ল্যান্ডে।

না করেই বা কী করব? জোন বেজের টামবলউইড বলে সেই গানটা, তার মধ্যে একটা লাইন ছিল হাউলিং জাস্ট টু ইজ দি পেইন। আমি কি হাউল করব? কোথায়? কেতন মেহতার হিরো হীরালালে নাসিরুদ্দিন তার নারীকে একটা বিরাট বৃক্ষের কাছে নিয়ে গেছিল। চিৎকার করো, আরাম পাও। ক্যাথারসিস?

কোন ধরনের মনোরোগীরা যেন হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে?

করে তারা কী পায়—আরাম?

আমার খুব আরাম পাওয়া দরকার। খুব শান্ত, স্নিগ্ধ, মনোরম আরাম।

অথচ আমায় আবার অর্জুন সেনের কাছে যেতে হবে। প্রার্থীর পল্লব ধারণ করে গিয়ে দাঁড়াতে হবে যামিনী রায়িত ড্রয়িংরুমের বেঁটে বেঁটে পেলব চেয়ারে আসীন বেঁটে মানুষটার সামনে। বেঁটে লোকদের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে, অর্থাৎ সূর্যাস্ত ক্রমে নিকটবর্তী লাইনটা কোথায় পড়েছিলাম? 'অর্থাৎ' শব্দটা না থাকলেই বোধহয় বেশি ভালো হত। শব্দটা একটা নাটককে নষ্ট করে দেয়। এএমপিআর না ছেড়ে দিলেই কি ভালো করতাম? বোধহয়। সপ্তাহে ন-দশ ঘন্টা। হাজার টাকা। টিউশানির একটা ব্যাচের মত। তবু তো অন্য একটা জগৎ। এই ঘরটার বাইরে, দুই কামরার এই ফ্ল্যাটের বাইরে। আইএসএলএম আর এনওয়ার্থ আর ক্যান্সার আর স্টেরয়েড আর ডিপ্রেশন থেকে অন্যরকম কিছু।

কিন্তু আমি কত চেষ্টা করলাম। কিছুতেই আর পারলাম না। অজিত রায়কে আর ওর ওই হাফউইট বাচ্চাকে দেখলেই, ওখানের ওই কুৎসিৎ রেষারেষির গন্ধ নাকে এলেই গা গুলিয়ে উঠছিল। কোথায় নেই কুৎসিৎ? কিন্তু সে তো যুক্তির কথা, র‍্যাশনালিটির কথা। আমার আর ভালো লাগে না। র‍্যাশনালিটির কথা শুনলেই আমার বমি পায়। আমার চার পাশে সেগুলো ঘটছে তার কোনটা র‍্যাশনাল? আমার কলেজে পড়াতে পাওয়ার কথা ছিল না? আমি পড়াশুনো করেছিলাম সেই কথা ভেবে। অন্য কোনও চাকরির কথা ভাবিনি। কিন্তু কিছুতেই আমি সেই চাকরি পাব না, যদিনা আমার যোগাযোগ থাকে। অন্তত গত সাড়ে সাত বছর ধরে পাইনি। এটা র‍্যাশনালিটি? সাড়ে সাত বছর—কথাগুলো লিখতে লিখতে আমার কেমন ভয় হল, ভীষণ ভয় করছে, ভয় করছে আমার। আরও সাড়ে সাত বছর এভাবে কেটে যাবে? আরও সাড়ে সাত বছর? তখন আমি চল্লিশোর্ধ, যেমন মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে প্রেসক্রাইব করেছে বালজাক। করেছে আইজাক বশেভিকা সিঙ্গার। দুজন সফল পুরুষ লেখক। কারণ চল্লিশোর্ধ মেয়েরা খুব প্রেমের ভিখিরি হয়। প্রেমের ভিখিরি সেই নারীরা কী করে? তারা কি চিৎকার করে, আর্তনাদ করে, ভয় পায়? নাকি তারা পাগল হয়ে ল্যাংঠো হয়ে যায়, কারণ সৌন্দর্যের সজ্জার প্রসাধনের আর কোনও দরকার নেই তার, তারপর সমস্ত ধুলো কাদা থুথু আর রক্ত আর কফ মাখা শরীরের সামনে ছেঁড়া টুকরো লম্বাটে কাগজের একটা পুঁটলি, সমস্ত বিদ্যাচর্চা, আর হাতে নিয়ে হাঁটতে থাকে এপিসি রোড দিয়ে, ফ্লাইওভার থেকে ফ্লাইওভার, বাসস্টপ থেকে বাসস্টপ, উত্তর থেকে দক্ষিণ, দক্ষিণ থেকে উত্তর, হাঁটতেই থাকে?

দেবব্রত আর আমার সম্পর্ক। আমি দেবব্রতকে ভালোবাসিনি? ওর পাগলামো, ওর এক্সট্রোভার্টনেস, ওর ব্যবহারবিধির প্রতি আমার বাড়ির সমস্ত তাচ্ছিল্য এবং বিরক্তির পরও আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম। ওকে বিয়ে করেছিলাম। ওদের বাড়িতে গিয়ে থেকে ছিলাম। ওর মাকে মা, বা ওর বাবাকে বাবা বলে ডাকতে আমার ভালো লাগত না, ন্যাকান্যাকা লাগত। কিছু বলেই ডাকতাম না। দেবব্রতর সরল ভালোমানুষ এল আই সি কর্মী দাদা আমাকে ডেকে অনুযোগ করেছিল, 'তুমি নাকি মাকে মা বলে ডাকো না?' তারপর আমি ডেকেছিলাম। হয়ত আমি নিজেই ডাকতাম, আর কদিন বাদে, কিন্তু মেয়েদের কোনও কিছুর জন্যই কেউ অপেক্ষা করে না, সেই মুহূর্তেই তাদের সামাজিক হয়ে উঠতে হয়।

ওদের একান্নবর্তী পরিবারে গেলেই শাড়ি ব্লাউজে,

ব্রাউজও স্লিভলেস না হওয়াই ভালো, বাড়ির বউ হয়ে ওঠা, আর আমাদের বাড়িতে থাকার দিনগুলোতে দেবব্রতর সেক্সি হয়ে ওঠার জন্যে এক্সোটিক, আরও এক্সোটিক পোশাক, আমার অপমান হত না?
তাও আমি ভালোবাসতে চেয়েছিলাম। দেবব্রতর বৌ হয়ে উঠতেও চেয়েছিলাম, শর্মিষ্ঠা না হয়ে, কিন্তু দেবব্রত কোনওদিন ঠিক করে উঠতে পারল না ও আমার কাছে ঠিক কী চায়? মা না কলগার্ল, দি গার্ল ওয়েটিং অ্যাট ইয়োর বেক অ্যান্ড কল। মা হতেও আমার আপত্তি ছিল না। কলগার্ল হতেও। কারণ কোনও কিছু হওয়ারই তো কোনও মানে নেই। সবই তো রোলপ্লেয়িং। যখন আমি মা হওয়ার বাস্তবতায় চলে যেতে চাইতাম, ছুটি এবং দেবব্রত উভয়েরই মা, তখন দেবব্রত অনুতাপ করত সেই উদ্বেলতার কথা ভেবে, মডার্ন আলোকিত উদ্বেলতা, যেখানে শ্রেণীসচেতনতা আছে ফেমিনিজম আছে ইনহিবিশন ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা আছে। আবার যখন মনোহারিনী হতাম তখন দেবব্রত কেয়ার খুঁজত। আমার চাকরি না করে পুরুলিয়ায় গৃহবধূ থাকাটা ও চাইত না, ওর প্রগতিশীল ইগোতে আটকাত, নিজের পরিবারের ভবিষ্যত সংক্রান্ত যে ছবি ওর মাথায় ও এঁকে রেখেছিল, সেই স্বপ্নে আটকাত। ও এমন মেডিয়েভাল পুরুষ হতে চায়নি যে তার বউকে চাকরি না করে, নিজের কাজ না করে হাউজমেইড থাকতে বলে। আবার নারী যত্নের, নারী মনোযোগের অভাবটাও ওকে পীড়িত করত। ওর নিজের বাড়ির সেই লাইফ ও খুঁজত, যেখানে পরিবেশটাই এমন যে পুরুষদের গায়ে শ্যাওলা গজিয়ে যায়, যেখানে ও খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আমার কাছে জল খেতে চাইত এবং আমি আমার ওয়েট করে থাকা সিরিয়াল দেখা ছেড়ে জল দিয়ে আসতাম, এবং পরিবেশটাই এমন যে, বিরক্ত হতাম না। অন্য কিছুই ওখানে অস্বাভাবিক হত। নিজের জীবনের না-পারাগুলো দেবব্রতর সামনে একটা দেওয়াল, সেই দেওয়ালে গোঁত্তা খাচ্ছিল, আর চারপাশের সমস্ত কিছুকে সেই না-পারার কারণ করে তুলছিল। ছুটির জন্মানোটা ও চায়নি। নিজেদের ব্যক্তিকতা ভেঙ্গে যাবে। সেক্স, অবসর, মনোযোগ সব কিছুতেই একটা ডিস্টার্ব্যান্সত। আমি কী করতাম? দেবব্রত তার হতাশার ফ্রাস্ট্রেশনের মুহূর্তগুলোয় যখন হিংস্র হয়ে উঠত, যখন আমার মনে হত জন্মানো থেকে শুরু করে আমার জীবনের সমস্তটাই মিনিং লেস, তখন নিজের একটা বাচ্চাকে অপ্রতিরোধ্য ভাবে চাওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। তারপরও ছুটির জন্মানোটা ছিল অনেকটাই অ্যাক্সিডেন্টাল। কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার করতে দেবব্রতরই ভালো লাগত না, আমি থাকা এবং না-থাকার পার্থক্য খুব একটা বুঝতেই পারি না। আর পিল খেতে দেবব্রতও বারণ করেছিল, মোটা হয়ে যাই এটা চায়নি।
তারপর যখন আমার কড়াইয়ে তেল গরম হওয়ার, যে কোনও তেল গরম হওয়ার গন্ধে বমি আসতে লাগল, নিপলে একটা আনপ্রেডিক্টেবল পেইন, তখন দেবব্রত আমায় বলল এম টি পি করাতে। অনেক আগে, এমএসসিতে থাকাকালীন হোস্টেলের রীতা প্রেগন্যান্ট হয়ে গেছিল, ওকে নিয়ে গেছিলাম ক্যামাক স্ট্রিটের মারি স্টোপসে, দেখেছিলাম যে একজন পুরুষ অভিভাবকের সই লাগেই, সাক্ষী হিশেবে সই করতে হয়, তখনই আমি ঠিক করেছিলাম কোনও দিন অ্যাবর্শন করাব না। যেমন বারে গিয়ে কোনও দিন আমি মদ খাব না, যেখানে আমার একা যাওয়ার অধিকার নেই। শুধু এটাই নয়, আমি এমটিপি করাতে চাইওনি।
আমি একটা বাচ্চা চাইছিলাম। আমার নিজের বাচ্চা। যার সঙ্গে থাকাকালীন আমার নিজেকে মনে হবে না সামওয়ান নোবডি নিডস। আমি চাইছিলাম। তখন তো ইতিমধ্যেই আমার রিসার্চের অর্থহীনতা আমি টের পেতে শুরু করেছি। অর্জুন সেন আমার কাছে টেরর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর দেবব্রত শুধু একজন বড় লেখক হয়ে উঠতে চাওয়ার এবং না-পারার অ্যাম্বিশন এবং ফ্রাস্ট্রেশনে। আমার নিজের বাড়ির সঙ্গেও আমার সম্পর্ক টেনস। মার সঙ্গে তো কোনওদিনই ওয়র্ম ছিল না। বাবাও দেবব্রতকে কোনওদিনই মেনে উঠতে পারেনি, মনে করত আমি দেবব্রতর দ্বারা ইর‍্যাশনালি ইনফ্লুয়েন্সড। আমার রাজনীতিও তার আগেই ফুরিয়ে এসেছে। আমার নিজের বলতে তখন কিছু ছিল না, কিচ্ছু না।
ফিল লাইক এ লোনসাম টাম্বলউইড/ রোলিং অ্যাক্রস অ্যান ওপন প্লেইন/ ফিল লাইক সামথিং নোবডি নিডস/ ফিল মাই লাইফ ড্রিফটিং অ্যাওয়ে/ ফিল লাইক এ ব্রোকন ওয়াগন হুইল/ হোয়েন আই ক্যান্ট জাম্প এ স্লো মুভিং ট্রেইন/ থিংক আই নো হাউ কাউড ইট ফিলস/ হাউলিং জাস্ট টু ইজ দি পেইন।
তারপর, ছুটি হওয়ার পর থেকেই, যখনই ছুটি সংক্রান্ত কোনও কারণে আমার বা আমাদের কাজের কোনও ক্ষতি হয়েছে, ব্যাঘাত ঘটেছে আমাদের কোনও প্রাইভেসিতে, দেবব্রত বলেছে, আমি তো আগেই বলেছিলাম, এমটিপি করিয়ে নাও, এরকম যে ঘটবে আমি আগেই জানতাম। দুজনেরই কাজ করার ইচ্ছে থাকলে দে ক্যান্ট অ্যাফর্ড এ বেবি।
ডিড আই ডিজার্ভ ইট?
আমি জানি না, আমি কিচ্ছু জানি না। কেন এরকম হয় যে কোনও জায়গাতেই আমি শান্তি পাই না, আমি শুধুই, নিয়তই অপারগ হয়ে উঠি। আমি রাজনীতি করে উঠতে পারি না। পারিবারিক হয়ে থাকতে পারি না। আমার দাম্পত্য নষ্ট হয়ে যায়। আমার কলেজের পোস্টিং হয়ে ওঠে না। আমি যা লিখতে চাই, লেখার ভাষা জানি না। এমনকী এনজিও করাটাও আমার দ্বারা হয়ে ওঠে না। আমি তো ফোটোগ্রাফার হয়ে উঠতেও পারলাম না। কেন এরকম হয়? রাজা অয়দিপাউস নাটকে ছিল, 'কেন এক একজন মানুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধু অপারগ থাকে? কেন তার জন্যে প্রতি প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে শুধুই প্রত্যাখ্যান উৎসারিত হয়? কেন?
কেন মানবদা সেদিন ওরকম করল? রাতে বাসে ফেরার পথে, ফাঁকা বাস, হলদেটে আলো, আমার বমি আসছিল। ভাবলাম যাই, তখুনি, জিগ্যেস করি, কেন এরকম করলেন মানবদা? আপনার নয় শরীরের মনের স্নায়ুর একটা ক্ষতি হতই। এতগুলো, আমাদের এতগুলো ছেলেমেয়ের পেশার, কাজ করার একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত। কেন করলেন এরকম? আমাদের মধ্যে অরূপ ছিল। আপনি তো বলেন, মাঝে মাঝেই বলেন, অরূপের একটা হিল্লে হয়ে যাওয়া দরকার, যাতে লিখে যেতে পারে। তাহলে? তাহলে কেন এরকম করলেন? আপনার কোনও দায়িত্ব নেই? কারুর প্রতি দায়িত্ব নেই? কেন?
আপনি হ্যারিয়েট ফ্রাড পড়তে বলেছিলেন। আমি তো পড়ছিলাম। রাতে ঘুম এসে যেত বহুক্ষণ ধরে আমাকে না পেয়ে নালিশরত ছুটিকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে। তারপর দিদিমাকে কস্তুরঙ্গ আর প্যাসিফ্লোরা, যন্ত্রণাহীন ঘুম, ঘুম থেকে আরও ঘুম, ঘুমতে ঘুমতে ক্রমে মৃত্যুর দিকে। ওষুধ দিয়ে এসে আমি পড়তে বসি। ঘুমে চোখ ভারী হয়ে আসে। চোখে জল দিয়ে আসি। পড়তে বসি আবার। পড়তে পড়তেই মনে হয় সার্ভের র-ডেটা গুলো পড়ে আছে, করা হয়ে উঠছে না, কোনও কাজই সারা হচ্ছে না, কিছুই করা হয়ে উঠছে না আমার, কিছু না। বুকের কাছে দমবন্ধ উদ্বিগ্ন ফুসফুসটা এসে আটকে যায়। আমার কান্না পায়। কেন আমি মন বসাতে পারছি না, আমায় তো পড়তেই হবে, আমি কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি? আমার কর্ম ক্ষমতা কি চলে যাচ্ছে? কিছুই তো করা হয়ে উঠল না আমার। কিছু না। আবার মন বসাই। ওই পড়তে পড়তেই মাথায় এলো একটা লেখা। ফ্রাডের লেখা ফিমেল বডি অ্যাজ এ সাইট অফ ক্লাস কন্ট্রাডিকশন। ভাবলাম আমি তো আমার বডিকে জানি, এই ফিমেল বডিটা, আমি ভাবতে পারি, পারব না একটা লেখা লিখতে, বস্তির যে মানুষদের আমি দেখেছি, তাদের পলিটিক্স অব সেক্স নিয়ে। আসলে আমার কথা, একান্ত আমার নিজের সম্পর্কে কিছু কথা, সেইখানটায় আমি পৌঁছতে চাই। আমার ফিমেল বডিকে ঘিরে আমার চারপাশের সেক্স পলিটিক্স। আমার নিজের, একান্ত নিজের সেই লেখায় পৌঁছনোর একটা স্টেপ এই লেখাটা। আমি লিখব, আমি ভাবলাম, আমার নিজের লেখা। সেই লেখা আমি খুঁজছি। আমি খুঁজছি। ভালো করে খুঁজতে পারছি না। তবু খুঁজছি। আমার সেই খোঁজায় আপনি তো সাহায্য করতেই পারতেন মানবদা। করলেন না। আসলে কেউ কাউকে সাহায্য করে না।
দেবব্রত। দেবব্রতর তো বোঝার কথা ছিল আমায় কথা। আর কেউ না হোক, অন্তত দেবব্রত। কেন বুঝলে না তুমি দেবব্রত, আমাকে, আমি যা বলতে চেয়েছিলাম, আমার যন্ত্রণাগুলোকে। কেন বুঝলে না তুমি?
কেউ কিছু বোঝে না।
কেউ কিছু বোঝে না। তাহলে কেন আমি লেখার কথা ভাবি? কী হবে লিখে? কারুর কাছেই তো পৌঁছনো যায় না, কাউকে কিছু বোঝানো যায় না। সুইং কিডস বলে একটা সিনেমা দেখালো সেদিন। পিটার, যে নাজিদের ঘৃণা করে, নাজি হতে চায়নি, কিছুতেই চায়নি, কিন্তু নাজি হতে হল তাকে। ফুলের মত বাচ্চা মেয়ের সামনে দিয়ে আসতে হল তার বাবার পোড়া শরীরের অবশেষ। শেষ অব্দি পিটার পারল না নাজি থাকতে। রক্তাক্ত পিটারকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পিটার হাত তুলে বলছে, হেইল হিটলার নয়, সুইং হেইল। সুইং কিড সে, নাচত, নাজি হতে চায়নি। পিটারের ভাইও, বাচ্চা, হাত তুলে বলছে সুইং হেইল। আমি দেখতে দেখতে কেঁদে ফেললাম। কিন্তু কী হল? কী হয়? কত ফিল্ম বানানো হয়েছে। কত। অজস্র। তারপরও জার্মানিতে নিও নাজি হয়। মলন শহরে জীবন্ত তিন তুর্কী রমনীকে জ্যান্ত গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। কেন হয় এরকম দেব আপন লন, কেন এমন হয়? কিছুই তো শেষ অব্দি করে উঠতে পারি না। কিছুই না। তবু করার কথা ভাবি কেন? কেন এনজিও করার কথা ভাবি? কেন লেখার কথা ভাবি? কেন ফোটো তোলার কথা ভাবি? আমি কি গাইডিং লাইন খুঁজছি? ফোটোগ্রাফ তোলার ব্যাকরণে যেমন শেখায়, ছবির ভিতর কিছু গাইডিং লাইন, যা ফোটোর ফ্রেমের কাছ থেকে চোখকে ধরে নিয়ে পৌঁছে দেবে ফোটোগ্রাফের মূল দৃশ্য বিন্দুতে। আমি কি নিজের ছবি নিজের কাছেই স্পষ্ট করে তুলতে চাইছি? এক একটা গাইডিং লাইন খুঁজছি, যা দিয়ে নিজেকে চিনে নিতে পারি, অন্যের সামনে চেনাতে পারি? কী হবে চিনে? আমি যে লিখব, কে পড়বে? পড়েই বা কী হবে? কী লিখব আমি? নতুন কী? যা দিয়ে এত লিখেও যা বোঝানো যায়নি তাকে বোঝানো যাবে? কাকে বোঝার আমি? আমার পৃথিবীতে আর কে আছে আমি ছাড়া? কাউকে কিছু বোঝানোর নেই। কোনও কিছু বোঝানোর নেই।

□ অলঙ্করণ : সন্দীপ দাশ